আগুনের রঙ লাল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

১

মনোহরপুরের গা ঘেঁষে যে পিচঢাকা পথ, তার দু'ধারে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির বিকালে মনসাপুজোর মেলা বসেছিল। পুকুরপাড়ে মনসার থান বিশাল বটের তলায়। বহুকালের পুরোনো বট। তার জটিল শেকড়-বাকড়ের ভেতর বাস করে দুধে খরিস সাপ। এটাই জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিক মুনির জননী সেই ভয়ঙ্করি দেবীর থাকার প্রমাণ। সকাল-সকাল বর্ষা আসছে। এবেলা-ওবেলা দু'চার ছিটে করে বৃষ্টি ছড়াচ্ছে। ক্ষেতে বীজ ধানের চারা মাথা তুলেছে। এ সময় সাপেরা জোড় বাঁধে, পাখিরা ডিম পাড়ে। পৃথিবীর বুক কোমল হয়ে ওঠে। চাষী পুরুষ চাষা রমণীরা কোমর বাঁধে পৃথিবীকে কিছু দেবে বলে। ঘরে জোয়ান ছেলে থাকলে তার দিকে সারাক্ষণ চোখ! হম্বিতম্বি। কারণ, সময় এসে গেছে। আকাশে-বাতাসে তারই লক্ষ্মণ।

গউরকে তারা বাবা কেদার বলেছিল, যাচ্ছিস যা। রাত করিস না। টর্চ বাতিটা সঙ্গে নে! মনসাপুজোর মেলায় গান-বাজনার আসর বসবে। লোভ করিস না। আর শোন গউর, তোর মায়ের জন্য দুটো মনসার ধাগা আনিস। ভুলিস নে যেন।

ধাগা মানে সুতো। বটতলার থানে মন্ত্রপূত কালো সুতো সার সার ঝুলিয়ে বসে থাকেন নরহরি পাণ্ডা মশাই। ওই সুতোর গুণের শেষ নেই। গউরের মায়ের কোমরে বাত। কুঁজো হয়ে হাঁটে। বীরভূমের বেলে গিয়ে পবিত্র পুকুরে নেমেছিল। শ্যাওলা আর কয়েকরকম তেল-পড়া এনেছিল। সারেনি।

কেদার তার জোয়ান ছেলেকে আরও কিছু কাজের ভার দিয়েছিল। মনোহরপুরের সাটুবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেন খবর দেয়, নদীর গায়ে কাদা জমিতে বেগুন ক্ষেত করার সময় এসে গেল। খামোকা আগাছার ঝাড় গজিয়ে রয়েছে। সোনাফলা মাটিটা ফেলে রাখা উচিত হচ্ছে?

আর গউর যেন অবশ্য করে যায় মোমিন পাইকারের বাড়ি। বাঁয়ের হেলে গরুটার গতিক ভালো নয়। পাইকার কি হরিণমারার দিকে আসবে আজকালের মধ্যে?

গউর খাপ্পা হয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। আর কিছু থাকে তো বলো, বছরে এই একটা দিন একটা বেলা একটুখানি আমোদ ফুর্তি করতে যাবো, তাও তোমার কাজের শেষ নেই।'

কেদারের বরাবর এই এক ধুয়ো। 'চাষাকলে জন্মেছ বাবা, আমোদ ফুর্তি করবে কোত্থেকে?' আসলে তার কথাটা হ'ল, মাটির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। মাটির দিকে সারাক্ষণ দৃষ্টি রাখো। মাটিতে হাঁটো, মাটিতে ঘুমোও। হাতে পায়ে সারা শরীরে মাটি মাখো। মাটিকে ফুলে-ফলে, লতা-পাতায়-উদ্ভিদে সাজাও। তুমি চিরকালের এক জন্ম-রূপকার এই পৃথিবীর। মাটিই তোমার নিয়তি।

বিকালের আকাশে এদিকে-ওদিকে কিছু মেঘ ছিল। পুবের হাওয়া বইছিল উথালপাথাল বেগে। কিন্তু বৃষ্টিটা এলো না। এলে মেলার মজা পণ্ড হতো। আশপাশের গাঁয়ের নানা বয়সের মানুষজন এসে জুটছিল। ভিজে জবুথবু হয়ে যেত। গাছপালার কাছে আশ্রয় যদি বা মিলত, বাজ পড়ার ভয়ে সারাক্ষণ বুক কাঁপত। সেবার আঁদুলিয়ার পটল,

পীরপুকুরের হারুন, কেশেডাঙ্গার রঞ্জন স্যাকরার একসঙ্গে মরণ হ'ল অর্জুন গাছের তলায়।

বৃষ্টি না আসাতে মনসাপুজোর মেলা দারুণ জমেছিল। বটতলায় চাষিরা পাঁঠাবলির বাজনা বাজাচ্ছিল উদ্দাম নাচের সঙ্গে। ধোঁয়ায় ধূসর করে ফেলেছিল। গোয়ালারা সারা বটতলা ঘুঁটের আগুনে দুধের সরা চাপিয়ে ঘন ক্ষীর তৈরি করছিল। মায়ের পুজোর ভোগ সেগুলো। দম আটকানো ধোঁয়া আর ঘুঁটে পোড়ার গন্ধের মধ্যে মায়ের জন্য ধাগা কিনতে গিয়ে গউর কার সঙ্গে জোর ধাক্কা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন শালারে?'

অমনি কেউ তার গেঞ্জির কলার খামচে হ্যাঁচকা টান মারল। ফর ফর করে ছিঁড়ে গেল গেঞ্জিটা। এই সুন্দর লাল গেঞ্জিটা সে শহর থেকে কিনে এনেছিল ক'দিন আগে। মেলায় আসবে বলে কতদিন থেকে তৈরি হচ্ছিল গউর। গেঞ্জিটা তার একটা নমুনা। গউর প্রচণ্ড রাগে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

গউরের চোখ দুটো নিস্পলক হয়ে গেল। তার শরীর আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কেয়াতলার ছোটবাবু। পরনে ঘিয়ে রঙের প্যান্ট, পায়ে গাম বুট, মাথায় নীলচে টুপি, গায়ে ছাই রঙের বুশ শার্ট এবং পিঠে খাপে ভরা বন্দুক।

গউর বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ক্ষ্যামা দেবেন মশাই, ভুল হয়েছে।'

গউরের ছেলেবেলা কেটেছে গরু চরিয়ে কেয়াতলার বিস্তীর্ণ বিলাঞ্চলে কাশকুশ ফাঁড়িঘাসের বনে। তখন থেকেই সে ছোটবাবুকে দেখেছে সেখানে। ছোটবাবুর বন্দুকের গুলিতে জলচরা পাখিরা মারা গিয়েছে। গউর পাখিগুলো কুড়িয়ে দিয়েছে ছোটবাবুকে। তার বদলে একটা পাখি পেয়েছে সে। সিগারেটও পেয়েছে চাইলে। গউরের চোখের সামনে কেয়াতলার বিল ভরাট হয়ে উঠল। বাঁধ বাঁধা হ'ল। আবাদ হ'ল জলা মাটি। বাঁধের ধারে মাটি ফেলে একতলা দালান হ'ল ছোটবাবুর। সেখানে কতবার গেছে। ভাগে চাষ করার জমি পেয়েছে। ছোটবাবু বড় দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। তাকে সারা এলাকার মানুষ বড় ভয় পায়। ছোটবাবু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। 'গেঞ্জিটা ছিঁড়ে গেল এক টানেই। কী গেঞ্জি কিনেছিলি রে? এ্যাঁ!'

ছোটবাবু সিগারেট দিয়ে বললেন, 'আয়। মাথা ঠান্ডা কর। এদিকে ফাঁকায় আয় যা ধোঁয়া এখানে!'

গউর আড়ষ্টভাবে ছোটবাবুকে অনুসরণ করল। মেলার পেছনে সেই বাজপড়া অর্জুন গাছের তলায় ওর ভটভটিয়া গাড়িটা রয়েছে। গউর বিব্রতভাবে ফের বলল, 'চিনতে পারিনি আজ্ঞে। মাফ দেবেন ছোটবাবু।' 'কাল যাস। একটা গেঞ্জি কিনে দেবো। দ্যাখ গউর্যা, আমার এই স্বভাব। কেয়াতলার মাঠে একটাও সাপ দেখতে পাবিনে আজকাল। সব শেষ করে দিয়েছি। কেন জানিস? ফোঁস করে ওঠে বলে। খবরদার খামোকা ফোঁস করবিনে। নে সিগারেট খা।'

গউরের সিগারেট নিতে ইচ্ছে করছিল না। মনের ভেতরে ক্ষোভ না হয় ধোঁয়ার চোটে দেখতে পায়নি, শালা বলে ফেলেছে। তাই বলে এমন করে গেঞ্জি ছিঁড়ে দেবে? কত লোকের চোখের সামনে এই অপমান!

সে একটু ঝুঁকে সিগারেটটা দু'হাত পেতে নিল—অবিকল তার বাবার ভঙ্গিতে। কেদাব এমনি করে বাবুমশাইদের কাছে বিড়ি-সিগারেট নেয়। ছোটবাবু লাইটার জ্বেলে দিলেন।

সিগারেটে টান দিয়েই গউরের ক্ষোভটা হঠাৎ সরে গেল। না—লোকে যতটা খারাপ ভাবে ছোটবাবুকে, এতটা খারাপ তিনি মোটেও নন। গউর একটু হাসল আপন মনে।

ছোটবাবু বললেন, 'এবার মনে হচ্ছে তত বেশি পাঁঠা পড়ল না। কতগুলো পড়ল বল তো গউর্যা?'

গউর গোনেনি। উঁকি মেরে সরে এসেছে। তবু ছোটবাবুর মন রাখতে বলল, 'তা দু'কুড়ি হবে মশাই।'

'তোর মাথা খারাপ?' সে লাজুক দৃষ্টিতে মুখ নামাল। ছোটবাবু বললেন, 'তোর হাতে ওটা কী রে মোড়কে?'

'আজ্ঞে, পুজোর ধাগা। মায়ের জন্য।'

'কী হয়েছে তোর মায়ের?'

'বাতটাত হবে। কুঁজো হয়ে হাঁটে মা। খুব কষ্টে আছে মশাই।' গউর তার মায়ের কষ্টের বিবরণ দিতে থাকল।

ছোটবাবু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আনমনা ভঙ্গি। গউর সেটা টের পেয়ে চুপ করল। ছোটবাবু কাকে ডাকলেন, 'ফজল! এ্যাই ব্যাটা ফজলা। শোন শোন এদিকে।' তারপর গউরের দিকে ঘুরে বললেন, 'কাল যাসখন। গেঞ্জি নিয়ে আসিস। এনে রাখব। বিকালে যাস ববং।'

ছোটবাবু ভিড়ের দিকে চলে গেলে অর্জুনতলায় দাঁড়িয়ে গউর ব্যাপারটা ভাবতে লাগল। গেঞ্জি না হয় দেবেন ছোটবাবু, কিন্তু এমন গেঞ্জিটা নিজের পছন্দে কেনা—এমন করে ছিঁড়ে গেল। আবার সেই ক্ষোভটা জেগে উঠল তার মনে। সে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল। স্যান্ডেলের তলায় পিষে নেভাল। তারপর মেলার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে গেঞ্জিটা খুলে ফেলল গা থেকে। কোমরে বাঁধল।

মেলায় অত আনন্দ হইচই। তার মধ্যে খালি গায়ে ঘুরতে হবে ভেবে গউর মনমরা হয়ে গেল। ধুতির খুঁটে কয়েকটা টাকা আর খুচরো পয়সা বাঁধা আছে। কিছু কেনাকাটা করবে ভেবেছিল। এখন আর কিছু কিনতেই ইচ্ছে করছে না তার। চারপাশে খুশিখুশি মুখে লোকেরা ঘুরছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা একহাতে পাঁপড় ভাজা, অন্যহাতে তালপাতার বাঁশি নিয়ে হাঁটছে। মেয়েরা সেজেগুজে চোখে ছটা নিয়ে ঘুরছে। কথায় কথায় খিলখিল করে হেসে উঠছে। ওদিকে মনসাতলায় ঢাক বাজছে। গউরের কাছ থেকে এসব শব্দ, ছটা, হাসি, বাঁশির সুর, মানুষজন, যুবতীরা ক্রমশ যেন অনেক দূরে সরে যেতে থাকল। মনে হ'ল, তার চেয়ে অপমানিত আর দুঃখী মানুষ এ পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

না হয় ঝোঁকের মুখে বলেই ফেলেছিল, 'কোন শালারে', তাই বলে এত সুন্দর সাধের গেঞ্জিটা ছিঁড়ে দেবে তার?

চোখে জল নিয়ে গউর মেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। খালি গা, পায়ে স্যান্ডেল। কোমরে লাল ছেঁড়া গেঞ্জিটা জড়ানো—মাথায় ঝাঁকড়-মাকড় চুল; হরিণমারা গাঁয়ের কেদারের এই জোয়ান ছেলের সঙ্গে মেলায় আসার সেই সময়কার সেই তেজি যুবকের কোনও মিল নেই। মাথা নিচু করে হাঁটছিল গউর।

বেলা পড়ে এসেছিল। মনোহরপুর মাঠের আলপথে খুব আস্তে হাঁটছিল সে। আসার সময় সে সারা পথ দু'ধারের চষা ক্ষেতে বনচড়ুই, বগাড়ি আর পায়রার ঝাঁককে উত্যক্ত করতে করতে এসেছিল। এখন দু'ধারে শেষ বেলায় ধূসর আলোয় পাখিগুলো শেষবারের

মতো শস্যকণা খুঁটছে। গউর তাদের দিকে তাকাচ্ছিল না। কচি আখের ক্ষেতে যে সারসটা বসেছিল, সেও গউরকে গ্রাহ্য করছিল না। মাঠের শেষে কালো দীঘি। দীঘির পাড়ে ভাঙা মন্দির আর বকুল গাছ। সেখানে এসে তার জল তেষ্টা পেয়েছিল।

ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে—জলের দিকে ঘুরে কাকে তাড়া দিচ্ছিল। বকুলতায় গিয়ে গউর থমকে দাঁড়ায়। তাদেরই পাড়ার পঞ্চাননের বউ দুর্গা দাঁড়িয়ে আছে—আঁচলে বাঁধা সন্দেশের ঠোঙা, অন্যহাতে পাঁপড় ভাজা। এক হাঁটু জলে নেমে জল খাচ্ছে কম, ছিটোচ্ছে বেশি এবং খিলখিল করে হেসে উঠছে তার বোন চপলা। চপলার স্বামী চপলাকে নেয়নি বলে দিদির কাছে থাকে। গউর একটু বিব্রত বোধ করে। গেঞ্জিটা এমন করে কোমরে জড়ানো কেন জিজ্ঞেস করলে সে সমস্যায় পড়ে যাবে।

দুর্গা হঠাৎ ঘুরে গউরকে দেখতে পায়। বলে, 'ও গউর। মেলায় যাচ্ছো, নাকি এলে?'

গউর গলার ভেতরে বলে, 'এলাম'। তারপর থমথমে মুখে পাশ দিয়ে ঘাটে নেমে পড়ে। চপলা আড়চোখে তাকে দেখে নেয়। গউর একটু বেশি ঝুঁকে জল খেতে থাকে। চপলা উঠে যায় ঘাটের মাথায়।

গউরের দিকে দুই বোন তাকিয়ে থাকে। গউর ছিল চঞ্চল, তেজি, হাসিখুশি ভাবের ছেলে। সেই গউরের হাবভাব তাদের অবাক করে। সে জল খেয়ে উঠে এলে দুর্গা মুখ টিপে হেসে বলে, 'কী গউর, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ নাকি?'

গউর মাথাটা সামান্য দোলায়। তারপর পাশ কাটিয়ে হনহন করে চলে যায়। দুই বোন অবাক হয়ে তার চলে যাওয়া দেখে। তারা টের পেয়েছিল, গউরের কী যেন হয়েছে।

পরে দুর্গা থানার বড়বাবু মাধু দারোগাকে বলেছিল, 'তারপর থেকে গউরকে আর দেখেনি। আমার ব্যাটার দিব্যি হুজুর। শেষ দেখা আর দেখিনি।'

গউরের বাবা কেদার মুখ নিচু করে বলেছিল, 'গউর মনোহরপুরের মনসাপুজোর মেলায় গেল। গোটাকতক কাজের ভার দিয়েছিলাম। তাই রাত্তির হচ্ছে দেখে বড় একটা ভাবিনি। গান-বাজনার আসরও বসতে পারে। শেষ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল। গউরের মাকে ওঠালাম—গউর কী ফিরেছে? না, গউর ফেরেনি।' কেদার চোখে জল নিয়ে ফোঁসফোঁস করে নাক ঝেড়ে ফের বলেছিল, 'হুজুর, আমার ছেলে ছোটবাবুকে খুন করেনি। আমার গউর বড় ভালো ছেলে হুজুর। আজ তিনদিন তার দেখা নাই। আমাদের মুখে অন্ন ওঠে না। আর হুজুর, গউরকে ছোটবাবু খুব ভালবাসতেন। গউরও ওনাকে ভয়ভক্তি করত। আমার মন বলছে, যে ছোটবাবুকে খুন করেছে, সে গউরকেও খুন করে বিলের তলায় পুঁতে রেখেছে। নইলে গউর লুকিয়ে বাড়ি আসত। অন্তত মায়ের ছেলে মাকেও দেখতে আসত।

মাধু দারোগা কালো কুচকুচে বিশাল মানুষ। কোমরে চামড়ার খাপে পিস্তল। হাতে বেতের ছোট্ট লাঠি। হরিণমারার লোকেরা তাকে দেখলে ভয়ে মরা হয়ে যায়। মাধু দারোগা বলেছিল, 'তোর ছেলে ফেরারি আসামি, কেদার। বাড়ি এলে তক্ষুণি সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যাবি। খুনি আসামিকে মারধরের হুকুম নেই। ওকে বুঝিয়ে বলবি। কেমন?' কেদার শ্বাস ফেলে বলেছিল, 'বলব হুজুর।'..

২

এ নদীর নাম দ্বারকা। বৈশাখ মাসে হাঁটু জলও থাকে না। শেষ জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টিতে অল্প একটু জল এসেছিল তার বুকে। এখন আষাঢ় এসে গেছে। বহু দূরে পাহাড়ে নাকি এখন দলে দলে মেঘেরা নেমে এসেছে শালবনে। তারা শালপাতা খায়। গাঁয়ের রাখাল আর কাঠকুড়োনি মেয়েরা সেসব কথা বলাবলি করে। শালপাতা খেয়ে মেঘেরা পাহাড় ধুয়ে দিতে থাকে। ওরা বলে, এই জল সেই জল। পাহাড় ধোয়া গেরুয়া রঙের গাঢ় ঘোলাটে জল। নদী এখন গায়ে-হলুদের কনে বউ। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেয়াতলার বিলের শেষ দিকটায় দ্বারকার বাঁকে বাঁধ। বাঁধের দু'ধারে ঘন জামবন। আষাঢ়ের বৃষ্টিতে জাম পেকে কালো হয়েছে! পঞ্চানন মাঠচরা মানুষ। জমিজমা নেই। এর ওর ভুঁই ক্ষেতে খেটে বেড়ায়। খাটুনি না থাকলে চলে আসে বিলের দিকে। মাছ ধরে। হিজল জিরালা জামের জঙ্গলে ঢুকে শুকনো কাঠ ভেঙে নিয়ে যায়। কখনও কখনও তার বউ দুর্গাও সঙ্গে আসে। ছেলেটাকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে তারা এদিকে-ওদিকে ঘোরে।

এখন জামের মৌসুম। কয়েকদিনেই গাছগুলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তলায় অজস্র ভাঙা ডাল পড়ে আছে। মাটি থকথক করছে গলা পচা জামের ঘন বেগুনি রঙের রসে। পোকামাকড় ভনভন করছে। সবচেয়ে উঁচু গাছটার ডগায় এখনও কিছু কালো নিটোল জামের থোকা ঝুলছে। পঞ্চানন দেখে গিয়েছিল আগের দিন।

পঞ্চানন আজ গাঁয়ে মাঠে কার ক্ষেতে তিল উপড়াচ্ছে। মজুরিটা ভালোই জুটবে। দুর্গার মনে তাই সুখশান্তি। দীঘির পাড়ে খেজুরগাছের জঙ্গলে খেজুর পাতা কেটে বেড়াচ্ছে। তালাই বুনে বেচে আসবে হাটে। তার বোন চপলা বলেছিল, 'তাহলে আমি যাই দিদি। জামাইদাদা কাল বলছিল না জামের কথা? আঁকশিটা নিয়ে আমি যাই।'

যুবতী মাঠকুড়োনি একাদোকা সচরাচর মাঠ বিলে যায় না। দুর্গা বলেছিল, 'একা যাবি কী করে? কাউকে ডেকে নিয়ে যা। আলোপুরী নয়তো সরলাকে ডাক।'

'হু! সঙ্গে নিয়ে যাই আর ভাগ দিই মুখপুড়ীদের.' চপলা বলেছিল। একা যাবো একা পাবো।

দুর্গা বলেছিল, 'তোর বড় বাড় বেড়েছে না? এ তো তোদের সানকিভাঙা কাশুলি নয়—কেয়াতলার বিল। জন না, মনিষ্যি না—খাঁ খাঁ জায়গা। মাথা ভাঙলে লোক পাবি নে। মনে নেই ওমাসে কেমন বাঁচা বেঁচেছিলি।' চপলা বলেছিল, 'বেশ। তাই ডাকছি কাউকে।'

কিন্তু সে ডাকেনি। দ্বারকার ধারে জামবনটার খবর তার জানা। দেখেও এসেছে কী অবস্থা হয়েছে গাছগুলোর। রাক্ষস-রাক্ষুসীদের পাল গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ছে। তাদের জ্বালায় কিছু কোথাও ফলে থাকার জো নেই। টনক নড়বেই।

আকাশে টুকরো টাকরা মেঘ আছে। হাওয়া বইছে বিস্তীর্ণ মাঠে। মাঠের শেষে বিলাঞ্চল। বহুদূরে ছোটবাবুর আবাদি এলাকা বাঁধের মাথায় হলুদ রঙের দালান। আশপাশে কিছু নতুন বস্তি। চপলার কাঁখে একটা ঝুড়ি, হাতে আঁকশি। জামবনে ঢুকে সে সবচেয়ে উঁচু গাছটা খুঁজতে থাকল। তলার ভিজে গলাপচা জাম থকথক করছে। কাঁচা-আধপাকা জামগুলো খামোকা নষ্ট। জাম পাড়তে এমনি করে ডাল ভেঙে ফেলে লোকে। চপলার রাগ হচ্ছিল।

কিন্তু কোথায় সে উঁচু গাছ? সব গাছই সমান লাগে। মুখ তুলতে ঘাড়ে ব্যথা। একটু

পরে সে সবচেয়ে মোটা একটা গুঁড়ি দেখতে পেল। এগিয়ে গেল সেখানে। গিয়েই সে চমকে উঠল। থমকে দাঁড়াল। চোখ হ'ল নিষ্পলক। গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে গউর। একটা ঝাঁকড়া ডাল ভেঙে সামনে রেখেছে। ডালটা মোটা মোটা পাকা জামে ভরা। ছিঁড়ছে আর মুখে ভরছে। আঁটি ফেলছে ছুঁড়ে। তার মুখের ভেতরটা বাসি রক্তের মতো কালচে বেগুনি দেখাচ্ছে। শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শুনেই সে ঘুরল এদিকে। তারপর তাকিয়ে রইল।

চপলার চমকটা কাটলে একটু হাসল। তারপর এগিয়ে গেল গউরের কাছে। গউর মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'জাম পাড়তে এসেছ? সঙ্গে আর কে আছে?'

চপলার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল অবশ্য। বড়লোককে খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গউর—এটা কম কথা নয়। গউর খুনি। খুনির মুখোমুখি পড়েই গেছে যখন, তখন আর ভেবে লাভটা কী? মুখে হাসি ফুটিয়ে মাথা দোলাল সে। 'আবার কে আসবে? আমি একা এসেছি।'

গউর সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তার মুখটা দেখে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। তারপর বলল, 'গাঁয়ে ফিরে কাউকে বলো না, আমাকে দেখেছ।'

চপলার সাহস বাড়ছিল। সে চোখ নামিয়ে বলল, 'যদি বলি, তুমি আমাকে খুন করবে তো?'

'হুঁ উ।'

'পারবে?'

গউর তাকাল ওর দিকে। 'না পারার কী আছে?' বলে পাশে মাটিতে ডগা বিঁধিয়ে রাখা প্রকাণ্ড হেমোটা তুলে ফের কোপ বসাল মাটিতে। তেমনি করে রেখে দিল। 'এই হেসো দিয়ে শালাকে কেটেছি। আমার হাত খুলে গেছে।'

চপলা, নাকছাবি খুঁটতে খুঁটতে আস্তে বলল, 'কেন খুন করেছ ছোটবাবুকে?'

গউর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'বিনিদোষে কেউ কারুর গলায় কোপ মারে? তেমন কাজ করেছিল বৈকি।'

'আহা, কী করেছিল বলো না বাপু?'

'সে তুমি শুনে কী করবে?'

চপলা একটু তফাতে, ভিজে মাটিতে বসে পড়ল। 'হু। তা এমন করে পালিয়ে কতদিন বাঁচবে ভাবছ? পরশু দারোগাবাবু আবার এসেছিল।'

'এসেছিল?'

'আসবে না?' চপলা একটু জোর গলায় বলল। বড়লোককে খুন করেছ। পিথিমীকে টলিয়ে দিয়েছ। হুলস্থূল চলছে।

গউর হাসল। 'সত্যি বলছ?'

'রাত্তিরে গিয়ে শুনে এসো না, তোমার বাবার কাছে। দারোগাবাবু শাসিয়ে গেল কাল। ধরা না দিলে তোমাদের বুড়োবুড়িকে ধরে নিয়ে যাবে। ঘরবাড়ি কোরোক করবে।'

'কোরোক (ক্রোক)?'

'হ্যাঁ। তাই বললে।'

'দারোগাবাবু বললে?'

চপলা চুপ করে রইল। গউর জামের ছোপ লাগা হাত আর মুখ, জাম পাতা ছিঁড়ে মুছতে থাকল।

একটু পরে চপলা বলল, 'দারোগাবাবু পাড়ার লোককেও শাসাল। বললে, ওকে ধরে না দিলে সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। জামাইদাদা বলছিল, গর্মেন্টের খুব রাগ হয়েছে। গর্মেন্ট কে তা জিজ্ঞেস করলাম তো জামাইদাদা রেগে গেল। জানো তুমি গর্মেন্ট লোকটা কে? ছোটবাবুর কেউ হয় নাকি গো?'

গউর মাথা নিচু করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আগুন তাহলে আমিও লাগাব। ছোটবাবুর খামার পোড়াব। ওর জমির ফসল কেটে দেব। এই হেসো দিয়ে।'

'বোকামি করো না বাপু! তুমি পারবে ওদের সঙ্গে?'

'যতটুকুন পারি।'

চপলা একটা শুকনো ডাল মট করে ভেঙে মাটিতে দাগ কাটতে থাকল।

'এত রাগ ক্যানে তোমার বলো তো?'

গউর আস্তে বলে, 'রাগ একদিনের না। আর সেসব কথা শুনে কী করবে বলো? জাম পাড়তে এসেছ, এই ডালের গুলো ছাড়িয়ে নাও। ঝুড়ি না ভরলে বলো তো গাছে উঠে আরও ডাল ভেঙে দেব।'... একটু চুপ করে থেকে সে ফের বলল, 'গাঁয়ে গিয়ে যদি বলে দাও গউর এখন বিলের জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তাহলে.. ।'

তাকে থামতে দেখে চপলা একটু হেসে বলল, 'তাই তোমার মনে হয় বুঝি?'

'কী জানি। তোমার সঙ্গে তো আমার ভাব নেই।' গউর হাসতে লাগল। চপলা রাঙা মুখে চোখ নামাল।

গউর হাসির মধ্যে ফের বলল, 'তাছাড়া তুমি পরের বউ। আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার? এ্যাদ্দিন পথেঘাটে দেখা হয়েছে। কখনও পঞ্চাদার বাড়ি গেছি, তোমাকে দেখেছি। তোমার চোখে চোখ পড়লে হেসেছ। কেন হেসেছ তুমিই জানো। আর কোনও পুরুষ হলে কবে ভাব করে বসত। করত না?'

চপলা কাঠিটা ওর গায়ে ছুঁড়ে মারল। 'থামো! ভারি ভাবের পুরুষ তুমি?' 'নই? ক্যানে বলো তো চপলা?' বলেই গউর মুখ তুলে দূরে কী দেখতে থাকল।

চপলা বলল, 'কী'?

'একটা লোক।' চপলা দেখে নিয়ে বলল, 'তোরাপ—মুসলমান পাড়ার। ওকে চিনি। নদীর ধারে কুমড়ো ক্ষেতে যাচ্ছে। এদিকে আসবে না।'

দু'জনে দেখতে থাকল। তোরাপ অনেকটা দূরে নদীতে নামলে গউর বলল, 'তুমি এরই মধ্যে সবাইকে চিনে ফেলেছ দেখছি গাঁসুদ্ধ। তোমার মতো মেয়ে হরিণমারায় একটাও নেই।'

চপলা বলল, 'চিনতে হয়েছে। কপালের দোষে. দিদির কাঁধে এসে চেপেছি। মাঠ-ঘাট কুড়িয়ে খাচ্ছি। কেমন লোক, কে কোথায় কী কাজে ঘুরছে—দেখতে দেখতে ঝট করে জানা হয়ে যায়। তবে সে কথা থাক। এ্যাদ্দিন তুমি খাচ্ছ কী, শুচ্ছ কোথায় বলো তো শুনি?'

গউর বলল, 'মেলার দিন দীঘির ঘাটে তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে রাতে অনেকক্ষণ মাঠে বসে ছিলাম। তারপর বাড়ি গেলাম। পা টিপে টিপে দাওয়ায় উঠে হেসোখানা নিলাম। বাবার কালঘুম। জানতে পারল না। হেসো নিয়ে বেরোলাম কেয়াতলার ঝিলের দিকে। ছোটবাবুর বাড়ির কাছে যেতে সাহস হ'ল না। দুটো বিলিতি কুকুর ছাড়া থাকে। সারারাত একটা হিজ্জল গাছের ডালে শুয়ে থাকলাম। ছোটবেলা থেকে

এ অভ্যাস আছে। সকালে ছোটবাবু জমি দেখতে বেরুল। আমিও ওঁৎ পাতলাম। ঘুরতে ঘুরতে ছোটবাবু এসেছে হিজলতলায়, আমিও ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম সামনা সামনি। বললাম, 'কী রে শালো—আমাকে লাল গেঞ্জি দিবি বলেছিলি?'

'গেঞ্জি! লাল গেঞ্জি!'

'সে অন্য কথা'। গউর বলতে থাকল। 'ছোটবাবুর চেঁচানি শুনেছিল কেতো বাগদি। সে দৌড়ে আসতে আসতে ছোটবাবু খাবি খাচ্ছে। আর আমি বিল ভেঙে দৌড়াচ্ছি। কখনও তো মানুষ খুন করিনি!' গউর হাসতে লাগল।

'মানুষ খুন কি ভালো কথা? কেন এ কাজ করলে তুমি?'

'বেশ করেছি।' বলে গউর উঠে দাঁড়াল। হেসোটা হেঁট হয়ে হাতে নিল। চপলার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। সে ভয়ে ওকে দেখতে দেখতে বলল, 'কিন্তু তুমি কোথায় খাচ্ছ? খিদে পায় না? রাত কাটাবার না হয় জায়গা আছে। খাওয়া?'

গউর দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাঠে আর বিলে আছে—তারা ছোটবাবুর মরণে খুব খুশি জানো তো? অনেক লোকের জমি গায়ের জোরে দখল করেছিল। তারা আমাকে খেতে দেয়। ওই দেখছ মড়িরামের কুঁড়ে। মড়িরাম কাল আমাকে ভাত দিয়েছিল। নদীর ধারে ওর বেগুনগাছে খুব বেগুন ধরেছে। সেই বেগুন পোড়া আর খাল-ডোবায় ধরা শোল মাছের ঝোল। পেটভরে খাইয়েছে বুড়ো।'

'এখন যাচ্ছো কোথায়?'

'তুমি দেখে ফেললে। আর বিল বাদাড়ে থাকা চলে না।'

গউর হাসল।

'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না।'

চপলা চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমি জানো, ছোটবাবু সাপের দংশনে মরুক বলে আমি মানসা করতে গিয়েছিলাম মনসার থানে?'

গউর অবাক হয়ে গেল। 'মানসা করেছিলে? ক্যানে?'

চপলা মুখ নামিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'একদিন সে আমার হাত ধরেছিল এই জঙ্গলে। দিদি আর জামাইবাবু ওই খালে মাছ ধরছিল। আমি গাছতলায় দিদির ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ কোত্থেকে এসে আমার সঙ্গে ভাব করতে লাগল। তারপর... চপলা নাক ঝেড়ে বলল, 'ভগবান বাঁচালেন। আমাকে টানাটানি করলে দিদির ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে লাগল। তখন চলে গেল মুখপোড়া পাপিষ্ঠ।'

'বলোনি পঞ্চাদাকে?'

'দিদিকে লুকিয়ে বলেছিলাম। দিদি কাঁদল। কেঁদে বলল, 'আমাদের ছোটলোকের কপালই তো এই রে। মাঠেঘাটে বিলবাদাড়ে চরে খেয়ে বেড়াই পেটের জ্বালায়। কু-লোকে বাঘের মতো ওঁৎ পাতে। তবে ছোটবাবু বড়লোক, জমি জিরেতওলা লোক। উল্টে এমন বিপদে ফেলবে যে মাঠঘাটে আর যাওয়াই যাবে না। তার চেয়ে চেপে থাক। ভগবানের বিচের একদিন হবে।' চপলা চেঁচিয়ে উঠল ফের। 'হ'ল। সাজা পেল কারুর না কারুর হাতে।'

গউর বসে পড়ল ফের। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ। তাই বলছিলাম না? আমার রাগ অনেক দিনের। ছোটবেলা থেকেই। তবু মুখে হেসে হুকুম তামিল করতাম। দেখে ভয়ও পেতাম। হঠাৎ কেমন করে এতকাল বাদে ভয়টা কেটে গেল।'

চপলা মুখ নামিয়ে বলল, 'তুমি যদি বলো, ওবেলা তোমার জন্য লুকিয়ে দুটি ভাত নিয়ে আসব। দিদি মনে মনে খুব খুশি হয়েছে, জানো তো?'

সে কথায় কান না দিয়ে গউর বলল, 'গত সনে ভালো ধান হয়নি। ছোটবাবুর আড়াই বিঘেতে ভাগে চাষ দিয়েছিলাম। ধান উঠল শালার খামারে। ভাগের সময় বলে, আগে এক বস্তা ধান আলাদা রাখো। বাবা বলল, কিসের? শালা বলল, পুজোর। বেশ—তাই রাখা হ'ল। তারপর বলে, আধ বস্তা আলাদা রাখো। কিসের? না স্কুলের। এমনি করে অর্ধেক ধান সরিয়ে বাকি অর্ধেক ভাগ হ'ল। তাও ছোটবাবুর দু'ভাগ, আমাদের এক ভাগ। পথে আসতে আসতে বাবা কেঁদে ফেলল। আমি ভুলিনি!'

একটা বাতাস এলো নদী পেরিয়ে। বাতাসটা জামবনের ভেতর হুলস্থুল বাধিয়ে বিলের দিকে চলে গেল। তারপর গউর বলল, 'আমি যাই। আর শোনো, এই জিনিসটা মাকে দিও। বলো, আমার জন্য ভাবে না যেন।' মোড়কটা নিয়ে চপলা বলল, 'কী?'

'মনসার থানের ধাগা।'

'তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'বিলে আর থাকব না। দেখি কোথায় যাই।'

'একটু বসো না বাপু।'

গউর কয়েকটা জাম ছিঁড়ল ভাঙা ডালটা থেকে। চপলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'খেয়ে দেখ। দারুণ স্বাদ। উঁচু ডালে ছিল বলে কারুর ভোগে লাগেনি। আহা, খেয়েই দেখ না।'

চপলা জাম খেতে থাকল। তারপর জিভ বের করে দেখে বলল, 'যেন পানের রস।'

'তোমার ঠোঁট দু'খানা রাঙা হয়ে গেল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে চপলা!'

চপলা লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'যা, আমি পরের বউ। ওকথা কেন?...

৩

দুঃখহরণের জিপগাড়ি গাঁয়ে ঢুকতে দেখে হইচই পড়ে গিয়েছিল। হরিণমারায় জিপগাড়ি ঢোকে ভোটের বছর। ঢোকার রাস্তাটা মোটেই যুৎসই নয়। পিচ রাস্তা থেকে এবড়োখেবড়ো সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তায় জিপগাড়িটা যখন ধুলো উড়িয়ে টলতে টলতে আসছিল, তখন দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা অতিথি বরণ করার ভঙ্গিতে গাঁয়ের মুখে এসে জড়ো হয়েছিল। পিটপিট করে তারা চিৎকার করছিল, 'ভোটের বাবু! ভোটের বাবু!' গাড়ি সামনে এলে তাদের কোলাহল থেমে গিয়েছিল। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখছিল তারা। বয়স্করা এগিয়ে এসে চমকে উঠেছিল। ছোটবাবুর ভাই বড়বাবু এসে পড়েছেন। জিপগাড়ির ভেতর জনাকতক জোয়ানবাবু বসে আছেন। বড়বাবুর পাশে আফজল। কেয়াতলার দুর্ধর্ষ একটা লোক। ছোটবাবু প্রাণরঞ্জনের ডান হাত বলতে যা বোঝায়, সে আফজল। তার পরনে নীলচে লুঙ্গি। গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি। মাথার চুলগুলো বেজায় ছোট করে ছাঁটা। তাকে দাড়ি রাখতে দেখেনি কোনোদিন কেউ। কিন্তু তার ভয় জানানো গোঁফ আছে। লালচে কুতকুতে একজোড়া চোখ আছে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা সহজ নয়।

মাথাহরিণমারা তত কিছু বড় গ্রাম নয়। ঘর পাঁচিশেক হিন্দু আর ঘর দশেক মুসলমানের বাস। চাষা-ভূষা নিরক্ষর মানুষ—ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই বেশি। এখন আষাঢ় মাস, মনের ভেতর সবার সাজো সাজো রব—মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষণ গুনছে। মাঠে যেন উৎসবের সময় হয়ে এলো। অথচ আকাশ ক'দিন থেকে সেই উৎসবের প্রস্তুতি হঠাৎ গুটিয়ে ফেলেছে। মেঘের পর্দা গেছে সরে। পুবের হাওয়া বইছে ঝড়ের বেগে। কেউ কেউ বলছে, এ কি তাহলে আকালের হাওয়া?

দু'পাড়ার মধ্যখানে ঠাকরুনতলা। বট-পাকুড়ের গাছ। ভাঙাচোরা মন্দির। বিশাল উঠান ন্যাড়া হয়ে আছে খেলাধুলার চোটে। বিকালে ছেলেরা 'মালামো' লড়ে। হা-ডু-ডু খেলে। ছোটরা নিমডাল ভেঙে মুখে ঢাক বাজিয়ে পুজো খেলে। মুসলমান পাড়ার ছেলেমেয়েরাও এসে খেলায় যোগ দেয়। এই ঠাকরুনতলায় ভোটের বাবুরা এসে 'বক্তিমে' করে যান। মোড়লরা গাঁয়ের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে জোটে। বিচার সভা বসায়। এখানেই এসে থামল বড়বাবুর জিপগাড়ি। বড়বাবু আর তার সঙ্গীরা জিপ থেকে নামলে ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে একপাশে দাঁড় করাল। বড়বাবুর পরনে উজ্জ্বল সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি, আঙুলে লাল নীল পাথর বসানো সোনারুপোর আঙটি। পায়ে পাম্পস্। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'কইরে, তোদের মোড়লকে ডাক।' পরনে ময়লা লুঙ্গি, রোগাটে চেহারা, চিবুকে দাড়ি—একটা লোক কাস্তে দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল। বড়বাবু তাকে বললেন, 'তুই আবদুল না?'

'জী বড়বাবু। সালাম।' আবদুল সেলাম জানাল সবিনয়ে।

'তোদের মাথা কে?'

'জী, জাফর মোল্লা।'

'তাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

আবদুল তখনি হনহন করে চলে গেল পাড়ার দিকে। জাফর মোল্লাকে বাড়িতে পারে কিনা সে জানে না। কিন্তু বড়বাবুর হুকুম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকরুনতলায় হরিণমারার প্রায় তিনভাগ লোক এসে ভিড় করল। মেয়েরাও এলো। বড়বাবু বললেন, 'কেদার আছে এখানে? কেদার?'

কেদার আসেনি। হরি মোড়ল সবিনয়ে বলল, 'কেদারের শরীর ভালো না বড়বাবু। বিছানায় শুয়ে আছে ক'দিন থেকে। পরিমল বদ্যি তার চিকিচ্ছে করছে।'

'মিথ্যা বলছ মোড়ল।' আফজল চোখ পাকিয়ে বলল, 'কাল ক্যাদরা শালাকে দেখেছি কেয়াতলা থানায় বড়বাবুর সামনে বসেছিল।'

হরি মোড়ল চুপ করে গেল। দুঃখহরণ সিগারেট জুতোর তলায় ঘষটে নিভিয়ে বললেন, 'মোড়ল, একটা কথা বলতে এসেছি তোমাদের গাঁয়ে। মোল্লা, তুমিও শোনো। সাতদিন সময় দিচ্ছি, কেদারের ছেলেকে যেখান থেকে পারো হাজির করো। তাকে আমার কাছে পৌঁছে দাও। তা যদি না করো, তাহলে পরিণাম খুব খারাপ হবে। কেদারের ছেলের দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে। বুঝেছ সব?' মোড়ল আর মোল্লা মাথা দোলাল। বুঝেছে।

দুঃখহরণ দুঃখিত স্বরে বললেন, 'ছোটকু—তোমাদের ছোটবাবু, সারাজীবন তোমাদের জন্য কি-না করেছে। বিল এলাকায় ডুবো জমিতে ফসল পেতে একমুঠো। ছোটকু কত তদবির করে সরকারকে ধরে টেস্ট রিলিফের গম যোগাড় করেছে। তাই এমন একটা

মজবুত বাঁধ হয়েছে। জমিগুলোতে সোনা ফলছে। ছোটকু তোমাদের আপদে-বিপদে সাহায্য করেছে। অভাবের সময় গম টাকা পয়সা দিয়ে উপকার করেছে। সত্যি না মিথ্যে বলছি?'

মোড়ল আর মোল্লা গাঁয়ের পক্ষ থেকে ফের মাথা দোলাল। সত্যি। গর্জন করে উঠলেন দুঃখহরণ, 'আর সেই ছোটকুকে তোমাদের গাঁয়ের এক পুঁচকে ছোঁড়া মেরে ফেলল। নেমকহারাম। লজ্জা করে না তোদের, এমন শুয়োরের বাচ্চা জন্ম দিয়েছিস, তোরা বেইমান।'

দুঃখহরণের চোখে আগুন জ্বলতে থাকল। আবার সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে কিছুটা সংযত করে ফের বললেন, 'শুধু হরিণমারা কেন, আশপাশে প্রত্যেকটি গাঁয়ের লোকের জমি কেয়াতলার নাবাল এলাকায় রয়েছে। ছোটকু, পৈতৃক বাড়ির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এতসব চাষাভূষোর জন্য তেপান্তরের মাঠে গিয়ে বসত বেঁধেছিল। আগের বছরে আশ্বিনে বাঁধ ভাঙল। কত গ্রাম ডুবে গেল। হরিণমারায় পর্যন্ত জল ঢুকেছিল। ছোটকুর চেহারা দেখে সেদিন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পাগলের মতো ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। রিলিফের নৌকা নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে কাপড়-চোপড়-খাদ্য বিলি করে বেড়াচ্ছে। আমার নিজের ভাই—তবু আমার ইচ্ছা করছিল, ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করি।' দুঃখহরণ চোখে জল নিয়ে ধরা গলায় বললেন, 'আর সেই দেবতুল্য লোকটাকে তোরা মেরে ফেললি?'

ঠাকরুনতলা চুপ। বটগাছের ডালে পাখিরা বটফল খাচ্ছে। এঁটো বটফল ঝরে পড়ছে—তারই শব্দ দমকা পুবের হাওয়ায়। মন্দিরের উঁচু বারান্দায় দুটো ছাগল ঢুঁ খেলছে। পাশে আপন মনে ঘুটিঙ নিয়ে লোফালুফি করছে একটা বাচ্চা মেয়ে। মাঝে মাঝে আনমনে সে সবার দিকে তাকাচ্ছে। এক কোঁচড় কচুশাক তুলে এনেছিল ডোবার পাড় থেকে এক যুবতী মেয়ে—সে চপলা। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে দূরে।

দুঃখহরণ রুমালে নাক চোখ মুছে থুথু ফেলে ফের গর্জালেন। 'কী করেনি ছোটকু তোদের ভালোর জন্য? নিজের ঘরের কথা বলতে নেই—তবু বলছি, তেপান্তরে গিয়ে থাকতে পারবে না বলেছিল বলে স্ত্রীকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল ছোটকু। কে পারে? বল তোরা শুনেছিস কখনও এমন কথা? জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ ত্যাগ করে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে এমন করে—গাঁয়ে গাঁয়ে লোকের সুখ-দুঃখের খবর নিয়ে বেড়িয়েছে এভাবে, এমন লোকের কথা কখনও শুনেছিস তোরা শুয়োরের বাচ্চারা?'

মোড়ল শ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, 'বড় ভালো মানুষ ছিলেন ছোটবাবু।'

দুঃখহরণ ভেঙচি কেটে বললেন, 'বড় ভালো মানুষ ছিলেন! বুড়ো হনুমান কোথাকার। এ তোদেরই ষড়যন্ত্র, আমি বুঝি না? মনোহরণপুরের সাটু হারামজাদার কথায় কেদারের ছেলেকে দিয়ে খুন করিয়েছিস তোরা।'

মোড়ল মোল্লা এক গলায় বলল, 'ভুল বড়বাবু, ভুল কথা।'

বড়বাবু শাসালেন, 'সাতদিন সময় রইল। সাত দিনের মধ্যে রাস্কেলটাকে ধরে আমার বাড়ি হাজির করবি। নইলে দেখবি কী হয়।'

বলে আফজলের দিকে ঘুরলেন। 'আফজল! এই শালাদের বুঝিয়ে দে কথাটা।'

আফজল গোঁফে অভ্যাসমতো তা দিয়ে বলল, 'বড়বাবুর মনে শান্তি নেই, বুঝলে তো বাবা সকল ভাই সকল? ছোটভাই। তার রক্ত দেখলে কি মানুষের মাথার ঠিক থাকে?

কাজেই যা বললেন সেই মতো করো। আমি বেশি কথার মানুষ না। বুঝে কাজ করো। ব্যস!'

মোল্লা সাহস করে বললেন, 'বাবা আফজল! তুমি মরদ বটে। তবে কথা কি, আমরা কোথায় পাব কেদারের ছেলেকে? বরঞ্চ থানার বাবুমশাইরা দারোগা পুলিশরা তো চেষ্টা করছেন।'

দুঃখহরণ জিপে গিয়ে বসেছেন। আফজল ঠোঁট বাঁকা করে বলল, 'পুলিশ! কেয়াতলার বড়বাবু যা বললেন, তাই আইন। পুলিশ টুলিশ নিয়ে মাথা ঘামিও না চাচা।'

বলে সেও জিপে গিয়ে বড়বাবুর পাশে বসল। সঙ্গের তিন জোয়ান বাবুও পেছন দিয়ে উঠে বসল। জিপটা ঠাকরুনতলাকে কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। চপলার পাশ দিয়ে জিপটা গেলে চপলা বলল, 'সঙ!'

তারপর একটা কোলাহল উঠল সভায়। সবাই কিছু বলতে চায়। দু'পাড়ার দুই মাথা বারবার চুপ করতে বলেও গণ্ডগোল থামাতে পারছিল না। কেদারের ভাইপো গনেশ প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বলল, 'চ-ও-প।'

সে গউরের চেয়ে স্বাস্থ্যবান। গউর একটু তামাটে রঙের ছেলে। গণেশ কালো। সে বর্ষার সব গাঁয়ের মালামোর আসরে মালামো বা কুস্তি লড়ে। বাহুতে চাঁদির তাগা আছে। তার চিৎকারে সবাই চুপ করলে সে বলল, 'কেয়াতলার বাবুদের জোর আছে বটে। ওনারাই যেন দেশটার রাজা। তবে ছোটবাবুর গুনের কথা বলছিল—এতগুলো মাথার লোক থাকতে কেউ বলতে পারলে না, ছোটবাবু উপকারের বদলে কতজনকে পথে বসিয়ে গেছে, হু, নাবাল মাটিতে ফসল ফলেছে ছোটবাবুর জোরে। বুকে হাত দিয়ে বলো দিকিনি, সে-ফসলের কতটুকু তোমাদের ঘরে আসে, কতটা যায় ছোটবাবুর ঘরে?'

হরি মোড়লের ছেলে কানু সায় দিয়ে বলল, 'ওনারই পেরায় সব জমি। আরও যত জমি—সেও ওনার মতো বাবুমশাইদের। আমাদের কটুকুন? সায় পেয়ে গনেশ বলল, 'টেসরিলিপের (টেস্ট রিলিফ) কথা বলছে? টেসরিলিপের কত মণ গম মেরে ছোটবাবু লাল হয়েছে, সে হিসাব যদি করি? আর বলছে বানের বছরকার কথা! আমরা জানি না বানের রিলিপের কত টাকা মেরেছিল ছোটবাবুরা? যত বাবু রিলিপ করেছে, সবাই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আমরা শালা মুরুক্ষু লোক। আমরা পেয়েছি লবডঙ্কাটি!'

হরি মোড়ল দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'তা এতক্ষণ কি বলতে মুখে ইয়ে পড়েছিল? এখন তো খুব পালোয়ানি দেখাচ্ছিস!'

গনেশ বলল, 'তোমরা মাথার লোক থাকতে আমরা মুখ খুলব ক্যানে মোড়ল জ্যাঠা?'

মুসলমান পাড়ার আকুল আরেক জোয়ান। সে বলল, 'আফজলকে দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। আফজল কি বাঘ? বলতে পারলে না—দেশে আইন আছে?'

জাফর মোল্লা এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল। সে উঠে দাঁড়াল এতক্ষণে। স্থিতপ্রাজ্ঞ বলে গ্রামে এই বুড়োর প্রতি শ্রদ্ধা আছে সবার। সে বলল, 'সাত দিন সময় দিয়ে গেল বড়বাবু। শাসিয়ে গেল। এখন কথাটা হ'ল, থানা পুলিশ করেও লাভ নেই। শুনলে না সেদিন মাধু দারোগামশাই ঠিক একই কথা বলে গেল? ওনারা ভেতরে ভেতরে এক। কাজেই বলি বাবা সকল, মন দিয়ে শোনো। মোড়ল তুমিও শুনো। কেদারের ছেলে যদি আদালতে ধরা দেয়, তবেই সব দিক রক্ষে হয়।'

হরি মোড়ল সায় দিল। 'খুব খাঁটি কথা। কিন্তু গউর্যাকে পাচ্ছি কোথা? পেলে তো বুঝিয়ে বলব।'

মোল্লা বলল, 'তোমরা জানো, মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে একটু আধটু জ্ঞানগম্যি আছে। তাই বলি, যেভাবে হোক গউরকে খুঁজে বের করো। আমার জিম্মায় এনে দাও। আমি ওকে সঙ্গে করে একেবারে মনিবাবু মোক্তাদের বাড়িতে তুলব। সেখান থেকে আদালতে হাজির করে দেব। তাহলে আর গউরের মারধর খাবার ভয় নেই, জেল হাজতে থাকবে। মামলায় যা হবার হবে সে গউরের কপাল। কী বলো?'

সভা চুপচাপ। পরামর্শ মনে ধরেছে। ঠাকরুনতলায় আবার পাকা বটফল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ পেছনের দিক থেকে কে বলে উঠল, 'মামলায় গউরের যদি ফাঁসি হয়?'

সবাই ঘুরে দেখে অবাক হয়ে গেল। পঞ্চাননের শালী কোঁচড়ে কচুশাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা ইতিমধ্যে এ গাঁয়ে মুখরা আর তেজি বলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পঞ্চানন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। চপলা মুখ টিপে হেসে ফের বলল, 'মামলায় গউরের যদি ফাঁসি হয় তাহলে কেউ আটকাতে পারবে তোমরা?'

'এ্যাই চপলি। বেহায়া মেয়ে মানুষ কোথাকার।' পঞ্চানন তেড়ে গেল তার বউ দুর্গা এখানে থাকলে বোনের চুল ধরে কিল মারতে মারতে নিয়ে যেত।

চপলা বলল, 'আমার বাপু সোজা কথা। গউরের সঙ্গে সেদিন বিলে জামতলায় দেখা হয়েছিল। বললে, ধরা দেব না।'

পঞ্চানন কী বলতে যাচ্ছিল, হরি মোড়ল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখা হয়েছিল গউরের সঙ্গে?'

'হুঁউ।'

'এখন সে কোথা আছে?'

চপলা বাঁকা হাসল। 'তা জানি না। বললে, বিলে আর থাকবে না। অনেক দূরে চলে যাবে।'

'অ'। হরি মোড়ল চিন্তিতভাবে বলল। 'তাহলে গউর্যা এ্যাদ্দিন বিলেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল।'

চপলা হনহন করে চলে গেল। একটু পরে পঞ্চানন তাকে বকবে বলে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। জোয়ানরা চোখ টেপাটেপি করছিল। এই মেয়েটার সঙ্গে তাহলে কি করে—কবে গউরের ভাব হয়েছিল কেউ টের পায়নি? গনেশ গউরের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, 'মরুক গউর্যা'।

ঘনশ্যামের হাতে একটা জালের খেই। এতক্ষণ জাল বুনছিল চুপচাপ। দ্বারকায় বর্ষার ঢল নামলে সে মাছ ধরবে। মনে সেই স্বপ্ন। এতক্ষণে বলল, 'মোল্লাকে একটা কথা বলি। আদালতে গউরকে হাজির হওয়ার কথা বলছ। তাতে না হয় গউর বাঁচল। কিন্তু আমরা?'

মোল্লা তাকাল। সভা আবার চুপ। একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক সবাইকে শিহরিত করল।

ঘনশ্যাম বলল, 'বড়বাবু গউরকে চায়। গউর তার হাতছাড়া হয়ে আদালতে গেলে কী হবে ভেবেছ? আগুন জ্বেলে দিয়ে যাবে গাঁয়ে। বরঞ্চ তাই বলি, গাঁ বাঁচানোর কথা ভাবো মোল্লা। মোড়ল, তুমিও ভাবো। গউর আমাদের গাঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বোকা ছেলেটা রাক্ষসের প্রাণ ভোমরায় হাত দিয়ে বসে আছে।' ঘনশ্যাম দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলতে থাকল, 'সাতশো রাক্ষস এবারে জেগে উঠেছে ভাইসকল! সাবধান!'

সারা হরিণমারা আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল শুনতে শুনতে। এদিক থেকে তো তারা ব্যাপারটা ভাবেনি।

৪

আকাশের হাওয়া মাঝরাতে ঘুরে গেল। শেষ রাত থেকে বৃষ্টি। সকাল হতে না হতে কাড়ানা মাঠঘাট জলে থৈ থৈ। দুপুরে আকাশ একটু ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনই ঝিরঝিরিয়ে বর্ষা এলেই হ'ল। কোনও ভরসা নেই। জলভরা মাঠে ব্যাঙ-ব্যাঙানীদের ডাকে কান পাতা দায়। ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বক উড়ে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে। প্রকৃতিতে কী এক আলোড়ন চলেছে...সেখানে যারা আছে, তারা সবাই চঞ্চল। গ্রাম থেকে মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে। মাঠে কালো-কালো ছায়ার মতো মানুষ ঘোরে ধূসর আকাশের নিচে।

বদরু মাঠে গিয়েছিল। বীজধানের ক্ষেত থেকে জল বের করে কাদা মেখে ফিরল। হাতে কোদাল, মাথায় মাথালি। উঠানে দাঁড়িয়ে দাওয়ার দিকে তাকিয়ে সে প্রথমে অবাক, পরে অস্বস্তিতে নড়ে ওঠে, 'মিতে, তুমি!' বলে কোদালটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে লাফ দিয়ে দাওয়ায় ওঠে। সামনে হাঁটু দুমড়ে বসে ফের বলে, 'কী ভাবা যে ভাবছি তোমার জন্য, উরেব্বাস। ইদিকে দেখি তুমি আমার বাড়িতেই হাজির।' সে হাসতে থাকে।

গউর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। পাছার নিচে তালপাতার চাটাই। বদরুর মা তার কোঁচড়ে চিঁড়ে-গুড় দিয়েছে। গউর চিবুচ্ছে। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। লালচে হয়ে আছে। উস্কোখুস্কো চুল। চিঁড়েটা মুড়মুড় করে চিবুচ্ছে।

তাই দেখে বদরু আরও খুশি হয়। এই গউর কেয়াতলার বিলের জলে গামছায় বেঁধে চাল ভেজাতে দিত। ফুলে ঢোল হতো চালগুলো। রঙটা সাদা হয়ে উঠত। সে কী আশ্চর্য স্বাদ তখন! গউর বলত, 'খাও মিতে। জাত খেলে যায় না, বললে যায়।' রাখালি জীবনের সেই দিনগুলো রয়ে গেছে কেয়াতলার কুশকাশের বনে, হিজল-জাম-জিয়ালার ছায়ায়, দ্বারকা নদীর বুকের বালিতে। সেখান হিন্দু-মুসলমান ছিল না। সবাই গেরস্থের রাখাল। একসঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে গেরস্থের দেওয়া 'জলখাবার'। খেয়ে খালের নীলচে জল পান করে তেষ্টা মিটিয়েছে। নদী-খাল-বিলের জলও হিন্দু-মুসলমান হয়ে ওঠেনি।

গউর হাসে। ঢোক গিলে বলে, 'সোঁদরপুর গেলাম মামার বাড়ি। মামা বললে, তুই পালা বাবা! তোকে এখানে পেলে বিপদ হবে। মামা জায়গা দিতে পারল না। তা পরে গেলাম দিদির বাড়ি কাপাসী। দিদি তো ভয়ে কাঠ। কোঠাঘরের ওপর ঘুমটি ছাদে লুকিয়ে থাকতে বলল। ধুস শালা! কতক্ষণ আঁধারে অমন করে পড়ে থাকব? আমি মাঠচরা মানুষ। বিলে মাঠে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। লোক দেখলেই আড়ালে চলে যেতাম। কখনও শেয়ালের গর্তে, কখনও জল ছুঁচোর গর্তে। কখনও গাছের ডালে। কিন্তু হঠাৎ এই বৃষ্টি!'

বদরু বলল, 'বুঝলাম অবস্থাটা। ভালই করেছ মিতে।'

গউর একটু হাসে. 'এখন তুমি তাড়িয়ে দিলে আবার এক জায়গায় যাবো।'

বদরুর মা দাওয়ার কোনায় উনুনে ভাত রাঁধছিল। বদরুর বউ মাথায় ঘোমটা টেনে গোয়ালঘরের ছোট্ট দাওয়ায় গরুর জন্য খড় কাটছিল বঁটিতে। বদরুর মা বলে, 'ব্যাটা

আমার এমন একটা কাজ করেছে শুনে অবধি ব্যাটাকে দোয়া করছি মনে মনে। ওই হারামি ছোটবাবুর জন্যই না বদরুর বাপ মাথা খারাপ হয়ে কবরে গিয়ে শান্তি পেলে! আমার কি কম রাগ—কম দুঃখ মোনে পোষা আছে ব্যাটা?'

বদরুর বাবার সাত বিঘে জমি ছিল কেয়াতলার নাবাল মাঠে। জমিদারের ঘরে ইস্তফা দিয়েছিল জমিগুলো। বন্যায় ফসল হয় না। খাজনা দেবে কেমন করে? বাঁধ হলে সেই জমি সরকার থেকে ফিরিয়ে দেয়ার আইন হয়েছিল। ছোটবাবু প্রাণরঞ্জন এককল্পে সাতবিঘে জমিটা গ্রাস করে নিয়েছিলেন আইনের ফাঁকে। সেই জমির শোকে বদরুর বাবা পাগল হয়ে গিয়েছিল। আধ ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াত। বিড়বিড় করে কীসব বলত। বদরুর মা উনুনে চাল দিতে দিতে সেসব করুণ কাহিনি শোনায়।

পেতলের বদনা আলগোছে মুখের ওপরে তুলে গউর ঢকঢক করে জল ঢেলে খায়। তারপর বলে, 'বিড়ি দাও মিতে।' বদরু কোঁচড় থেকে বিড়ির কৌটো বের করে উনুন থেকে একটুকরো অঙ্গার আনে দু-হাতে লোফালুফি করতে করতে।

নিজেও একটা বিড়ি ধরায় বদরু। তারপর ঝমঝমিয়ে ফের বৃষ্টি নামে। চিকনপুর গাঁয়ের শেষ দিকটায় এ বাড়ি। চারপাশে ঘন গাছপালা। তার ওধারে দ্বারকা। বাড়ির তিনদিকে মাটির পাঁচিল। খড়ের চাল ঝাঁপানো আছে পাঁচিলে।

দুই মিতে চুপচাপ কিছুক্ষণ বিড়ি টানে। তারপর বদরু বলে, 'মা আমার বাঘিনী। মায়ের জোরে জোর মিতে! নিশ্চিন্তে থাকো। সেই কবে একবার এসেছিলে, আর আজ এলে। তবে কথা কী, কেউ দেখে ফেললেই চৌকিদারকে খবর দেবে। সেই যা ভাবনা। আসার সময় কেউ দেখেছিল নাকি?'

গউর আস্তে বলে, 'দেখে থাকবে। তবে চিকনপুরে আমাকে কেউ চেনে না।'

বদরুর মা চাপা গলায় বলে, 'কুটুম সেজে থাকো, বাছা। বদরুর মামু আমার ভাইয়ের ব্যাটা সেজে থাক। ধুমগঞ্জে আমার বাপের বাড়ি। আমি ডাঙা দেশের বেটি, বাপ! এই ডুবোদেশে বিয়ে হয়েছিল আমার।'

গউর একটু হাসে। 'তোমার সেই ভাইপোর নামটা বললে না?'

'কাদের আলি।'

'কাদের আলি?' নামটা আওড়াতে থাকে গউর।

'হ্যাঁ বাছা, ওই নাম। তোমার মতন সোমত্ত জোয়ান। ওই রকম গড়ন। ওই যে তুমি হাসছ; ঠিক ওই রকম হাসি।'

বদরু খিকখিক করে হাসে। 'আমার আবার মুখ ফস্কে মিতে না বেরিয়ে যায়। কাদেরকে আমি কাদু বলে ডাকি। তুমি এখন হলে কাদু।'

বদরুর মা বলে, 'শুধু একটুন কষ্ট হবে বাপ, খাওয়া দাওয়ার। হাত পুড়িয়ে খেতে হবে। পেতলের সরা দেব। লকড়ি রাখা ঘরটার ওখানে উনোন করে নাও।'

গউর বলে, 'দরকার কী মাসি? তোমাদের দুমুঠো দিও খাব।'

'সে কী কথা?'

'মাসি, জাত খেলে যায় না, বললে পরে যায়।'

বদরু খুশি হয়ে বলে, 'গউর্যা বরাবর এরকম মা, ওর একই কথা। একদিন ছোটবেলায় খুব বৃষ্টির সময় আমরা দুই মিতে ডাইনির খালের ধারে হেজলতলার বনে কী করেছিলাম শুধোও ওকে।'

গউর স্মৃতির দিকে তাকিয়ে বলে, ওঃ। সে বিষ্টিতে চাল ভেজাতে দিয়েছিলাম খালে। জলের তোড়ে ভেসে গেল। খুঁজে পেলাম না। তখন মিতের কোঁচড়ে হাতভরে মুড়ি খেলাম। মিতে তো হকচকিয়ে গিয়েছিল।'

বদরুর মা উনোন থেকে ভাত নামিয়ে ফ্যান গালতে থাকে। তারপর হঠাৎ ঘুরে কৌতুকে ডাকে, 'বাপ কাদের আলি?'

গউরও হাসে। 'বলো মাসি।'

'ওই তো। হ'ল না যে বাপ। বলো-ফুফু। বাপের বহিনকে বলে ফুফু।'

'ফুফু! হুঁ ফুফু।'... গউর খিকখিক করে হাসে। বলে, 'ফুফু ফুফু...ফুফু।'...

৫

রাত জেগে ঘনশ্যাম তার জাল শেষ করেছে। গাবের রস মাখিয়ে পোক্ত করেছে। সে বরাবর একটু একলা স্বভাবের মানুষ। বউ ছেলেপুলে নেই। বার দুই বিয়ে করেছিল। বউ টেকেনি। রোগে ভুগে মারা পড়ে। সে ধরেই নিয়েছে, কারুর কারুর এ সংসারে বউ সয় না। সে এখন বুড়ো বয়সে মাথায় লম্বা চুল রেখেছে। গলায় পরেছে তুলসী কাঠের মালা। বোশেখে—ধর্মের মাসে খোল বাজিয়ে সারারাত কেত্তন গায়। দিনের বেলা সে আরও পাঁচটা ক্ষেতমজুরের মতো এ-গাঁ ও-গাঁ গেরস্থ বাড়ি কাজ টুঁড়ে বেড়ায়। না পেলে মাছ ধরে পুকুর ডোবায় খালেবিলে—যেখানে সুযোগ পায়। কখনও জলে নেমে কাদা হাতড়ে ধরে। কখনও বাঁশের তৈরি 'পলুই' দিয়ে, কখনও বঁড়শিতে—আবার কখনও জাল ফেলেও। ঘনশ্যাম তার নতুন জালের 'সাইত' করতে এসেছিল। কাড়ানের পর নদীর আদ্ধেকটা জলে ভরেছে। তোড়ে বইছে ঘোলাটে হলুদ জল। সে জলে বড় নদী আর দুরের বিল থেকে উজিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসে। ঘনশ্যাম নদীর ধারে জলের অবস্থা দেখছিল। মাছের আভাস সে টের পায়। জলের হালচাল বোঝে সে. [illegible] হয়ে কতদূর হাঁটল। একখানে বাঁকের মুখে একটু ইতস্তত করে জাল ফেলল। নতুন জাল। প্রথম খেপেই যদি অন্তত একটা ক্ষুদে মাছও ওঠে, জালটার ভবিষ্যৎ পোক্ত হয়ে যায়। জালটা জল থেকে টেনে তুলতে তুলতে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে চোখ রাখল। কিন্তু ক্রমশ পুঞ্জ-পুঞ্জ নিরাশায় তার মনটা ভারি হয়ে গেল। কোনও স্পন্দন প্রতিধ্বনিতে হচ্ছিল না তার হাতে। জলটাও পৃথক কোনও শব্দ করছিল না। শুধু নদীর যৌবনের শব্দ ছলছল কলকল ধারাবাহিক। জালটা টেনে তুলতে তুলতে ঘনশ্যাম টের পেল সে ভীষণ বুড়ো হয়ে গেছে। প্রথম খেলটাই বৃথা। ভেজা জালটার দিকে সে দুঃখিত চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বাঁশবনটার দিকে এগোল। তার বগলে একটা ছোট্ট মাছ রাখা 'খালুই' ঝুলছিল। তার ভেতর ন্যাকড়ায় বাঁধা চকমকি ঠুকে শোলায় আগুন ধরাল। তারপর বিড়ি টানতে থাকল। হরিণমারা গ্রাম থেকে প্রায় দু'ক্রোশ দূরে সে চলে এসেছে। বিস্তীর্ণ বিল আর মাঠের শেষে গ্রামটা দিগন্তে ধ্যাবড়া কালীর পোঁচের মতো নজর হচ্ছে। আর কতূদর সে নদীর ভাটিতে এগিয়ে গেলে মাছের দেখা পাবে? ঘনশ্যাম ক্লান্তভাবে নিজের গ্রামটা দেখে নিয়ে নদীর দিকে তাকাল। সারাজীবন দেখা এ নদীকে তার বড় নিষ্ঠুর মনে হ'ল।

কতক্ষণ পর সে বিড়িটা নিভিয়ে কানে গুঁজল। লম্বা সন্ন্যাসী চুলকে ফের চুড়ো করে বাঁধল। তারপর ভেজা ভারি হয়ে ওঠা জালটাকে একহাতে ঝুলিয়ে নদীর ভাটির দিকে হাঁটতে থাকল। কিছুদূর গেলে আরেক ছোট নদী ট্যাংরামারি এর সঙ্গে মিশেছে। সেখানে একবার অনেক মাছ ধরেছিল সে।

সামনে নদীর ধারে বটগাছ। সেখানে গিয়েই চমকে উঠল ঘনশ্যাম। পঞ্চাননের শালী চুপ করে বসে আছে। ঘনশ্যামকে দেখে সেও চমকে উঠেছিল। তারপর হাসল, 'ঘনাকাকা নাকি গো? মাছ পেলে?'

ঘনশ্যাম সন্দিগ্ধ দৃষ্টে বলল, 'তুমি এখানে কী মনে করে গো মেয়ে?'

'নদী পেরুবো, তাই।'

এই আঘাটায় নদী পেরুবে ক্যানে গো? 'এখানে পেরুবে কেমন করে? খুব তোড় বইছে দেখছ না?' ঘনশ্যাম নদীর দিকে হাত বাড়াল। 'তাছাড়া এখানটায় দহ আছে জানো না? খুব খারাপ জায়গা।'

চপলা ভুরু কুঁচকে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘনশ্যাম বলল, 'তা নদী পেরিয়ে যাবে কোথা শুনি?'

'মাসির বাড়ি।'

'সে কোথা?'

'চেকনপুর।'

'তা চেকনপুরের ঘাটে যাও।' ঘনশ্যাম উদ্বিগ্ন মুখে বলল। 'এই খাঁ খাঁ জায়গায় একলা মেয়ে বসে আছ—এটা ভালো কথা নয় বাপু। চেকনপুরের ঘাটে তালের ডোঙা পাবে।'

'তা যাচ্ছি।' চপলা বাচ্চা মেয়ের মতো বটফল কুড়িয়ে লোফালুফি করতে থাকল।

ঘনশ্যাম পঞ্চাননের এই শালীটির হাবভাব আগেও লক্ষ্য করেছে। কেমন যেন পাগলাটে বুদ্ধির মেয়ে মনে হয়েছে তার। বড্ড খামখেয়ালি। আবার তেজিও বটে। সেদিন ঠাকরুনতলায় গাঁসুদ্ধ লোকের সামনে কেমন করে গউরের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলল ও!

ঘনশ্যাম বলল, 'হ্যাঁ গো মেয়ে, তা এমন করে আপথে বেপথে মাসির বাড়ি যাচ্ছ যে হঠাৎ? উঁহু—কোনও গণ্ডগোল আছে, বাছা! খুলে বল দিকিনি আসল কথাটা!'

চপলা খেলতে খেলতে নির্বিকার মুখে বলল, 'আমার কপাল ঘনাকাকা। যে দুয়োরে যাই, সেই দূচ্ছাই করে তাড়িয়ে দেয়!'

'তাই বলো!' ঘনশ্যাম বসে পড়ল বটের ছায়ায়। 'দিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

'তা হয়েছে।'

ঘনশ্যাম একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার বে হয়েছিল কোথা যেন? গোবিনপুর কাউখালিতে।'

'তা সোয়ামীর সঙ্গে বুঝি মিটমাট হ'ল না?'

চপলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকাল। 'অত কথা কিসের বাপু? ওসব কথা তুলো না। মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

ঘনশ্যাম হাসতে লাগল অপ্রস্তুত হয়ে। ব্যথার জায়গায় ছোঁয়া লেগেছে মেয়ের। সে হাসি থামিয়ে আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে নিয়ে বলল, 'বেলা অনেক হয়ে গেছে। উঠি এবারে। কৈ সঙ্গে যাবে তো এস গো মেয়ে। আমি যাব ট্যাংরামারির মুখ অবধি। দেখি যদি জালের সাইত হয়।'

চপলা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটু হাসল। 'ও ঘনাকাকা, একবার এই দহে জালখানা ফেল না দেখি। আমি তোমার জাল ছুঁয়ে দিচ্ছি। আমি খুব পয়মন্ত গো। দেখই না ফেলে।'

চপলা জালটা সত্যিই ছুঁয়ে দিল। ঘনশ্যাম হাসতে হাসতে জলের ধারে গেল। তারপর জালটা সামনে পেছনে দোলাতে দোলাতে জলের দিকে ছুঁড়ল। পেখম তুলে জালটা ছড়িয়ে পড়ল জলের ভেতর। এখানে স্রোত নেই। জালের ঘেইটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল ঘনশ্যাম।

চপলা দম আটকানো গলায় বলল, 'এবারে তোল দিকিনি।'

খানিকটা গুটিয়ে আনতেই জালটা জানিয়ে দিল মাছ পড়েছে। আশা-নিবাশায় চঞ্চল ঘনশ্যাম সাবধানে উঠোতে লাগল। একটু পরে জালসুদ্ধ লাফিয়ে উঠল। চপলা খিলখিল করে হাসতে লাগল বালিকার মতো। কিলো দুই ওজনের কালবাউস মাছটা তুলে ঘনশ্যাম হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'তোর জয় মা। তোরই জয়। তুই দেবতার মেয়ে রে। সতী লক্ষ্মী তুই।'

চপলা বলল, 'উঁহু, আমি অলক্ষী-অপেয়ে। তা ঘনাকাকা, মাছটা খাবে না বেচবে বলো দিকিনি?'

ঘনশ্যাম ক্লান্তভাবে বসল বটতলায় গিয়ে। চকমকি ঠুকে আগুন ধরাল। কানে গোঁজা আধপোড়া বিড়িটা জ্বেলে টানতে টানতে বলল, 'খাব—সে কপাল আমার নয় রে মা! বেচতে যাব কেয়াতলায় বাবুদের বাড়ি। দু'দিন ভাতের মুখ দেখিনি, মা—খুলেই বলছি তোকে।'

চপলা নাকছাবি খুঁটতে খুঁটতে মাছটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেয়াতলার বাবুদের কাছে কেন বেচবে বাপু? ওনারা তো তোমাদের শত্রু এখন। হয়তো কেড়েই নেবে মাছটা। মারধরও করবে।'

ঘনশ্যাম ভারি মুখে বলল, 'গউরটা কী কাণ্ড বাঁধালে দেখ দিকিনি। সত্যি বলেছ মা। আজকাল কেয়াতলামুখো যেতে বড্ড ভয় করে। নবীন কাল কেয়াতলার হাটে গিয়েছিল পাটের শাক বেচতে। কার পাটের ডগা ছিঁড়ে এনেছে বলে ওকে মারধর করেছে।'

'হরিণমারার লোক দেখলেই বাবুরা নাকি তাড়া করছে। জামাইদাদা বলছিল।'

'তাহলে কী করি বলো দিকিনি? এত বড় মাছটা!' বুড়ো হতাশ ভঙ্গিতে তাকাল চপলার মুখের দিকে।

চপলা একটু ভেবে বলল, 'আমার মাসির গাঁ চেকনপুরে অনেক গেরস্থ আছে, কাকা। চলো না সেখানে।! নগদ পয়সা হয়তো পাবে না—তবে চাল পাবে তার বদলে। ভাত রেঁধে খাবে।'

ঘনশ্যাম একটু হাসল। 'সেই চাল দিয়ে তোমার মাসির বাড়ি ভাত রেঁধে খাব।'

চপলা হাসতে হাসতে বলল, 'মাসি গরিব হতে পারে, অমানুষ না। দু'মুঠো ভাত তোমাকে দেবে না বুঝি? এসো ঘনাকাকা।'

সামনে চপলা, পেছনে জালের ভেতরে মাছ নিয়ে ঘনশ্যাম বাঁধের পথে হাঁটতে থাকল। নদী বাঁক নিতে নিতে দক্ষিণে ঘুরেছে ক্রমশ। বাঁধের পিঠে ঘন গাছপালা। তার ছায়ায় যেতে ঘনশ্যাম হঠাৎ বলল, 'সেদিন বললে গউরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিলে। তারপর আর দেখা হয়নি বুঝি?'

চপলা দ্রুত ঘুরে বলল, 'ক্যানে?'

ঘনশ্যাম অপ্রস্তুত হ'ল। 'খারাপভাবে নিয়ো না মেয়ে। ইটা কথার কথা শুধোচ্ছি।'

'আর দেখা হয়নি'। বলে চপলা হাঁটতে থাকল।

ঘনশ্যাম আনমনে বলল, 'দুখোবাবু এক হপ্তা সময় দিয়েছিল। আর দুটো দিন বাকি। ভেতরে ভেতরে লোক পাঠিয়ে এ-গাঁ, সে-গাঁ খোঁজ করেছে হরি মোড়ল। মোল্লাও পাঠিয়েছে। গউরের খবর নাই।'

চপলা শক্ত গলায় বলল, 'জানি'।

'খোঁজ যদি পেয়েও থাকে কেউ, কী হবে? গউর ধরা দিলে তো?'

'হু—ভেবেছে, গউরকে বলবে মোড়লরা ডেকেছে এসো, আর গউরও ভালো ছেলের মতো গাঁয়ে হাজির হবে। কী বুদ্ধি মিনসেদের।' চপলা বাঁকা হাসল।

ঘনশ্যাম খসখসে গলায় বলল, 'গাঁ জ্বলে যাবে দেখবে। গাঁ জ্বালিয়ে দেবে।'

চপলা সকৌতুকে বলল, 'তাই বুঝি এতদূরে পালিয়ে এসে মাছ ধরছিলে ঘনাকাকা? শুধু তুমি না—সবাইকে আজকাল দেখি গাঁ ছেড়ে মাঠে-পথে থাকতে। আ-মরদার দল! হেসোতে শান দিয়ে বসে থাকতে পারে না? দা-কুড়ুল নেই ঘরে? সাঁওতালডাঙা থেকে তীরধনুক যোগাড় করে আনতে পারে না কেউ? গণশাদের বলতে গেলাম তো তাই নিয়ে দিদি-জামাইদাদার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধল। এখন মরগে সব বেগুন পোড়া হয়ে। আমি ভিন গাঁয়ের মেয়ে। আমার কী?'

ঘনশ্যাম ভয় পাওয়া ভঙ্গিতে বলল, 'চুপ চুপ। বাতাসের কান আছে। বলতে নেই।'

'আমার অত ভয় নেই।'

'বড়বাবুদের বন্দুক আছে মা! পুলিশের লোক ওনাদের হুকুমে চলে'। চপলা হঠাৎ থেমে নিচে নদীর দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই দেখ ঘনাকাকা, মাছ ঘাই মারছে। আরেকবার ফেলবে নাকি জালখানা?'

ঘনশ্যাম নদীর দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর জাল থেকে মাছখানা বের করে বলল, 'ধরো তো মা। দেখি, আরেক খেপ।'

সে নদীর ঢালু পাড়ে একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে লাথি মেরে পা রাখার জায়গা করল। তারপর জাল ফেলল। একটু পরে জালটা টানতেই নড়ে উঠল জাল। এবার মাছটা বেশ বড়। অনেক কষ্টে টাল সামলে ঘনশ্যাম একটা রুই মাছ তুলে আনল জালের ভেতর। তিন কিলোর কম নয় মাছটা!

চপলা খিলখিল করে হাসছিল। ঘনশ্যাম হাঁফাতে হাঁফাতে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে চপলাকে দেখছিল। একি সত্যি পঞ্চাননের শালী—পেটের দায়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় যে, স্বামী যাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, মা-বাবা নেই বলেই এমন হাঘরে হয়ে ঘুরছে, একি সেই চপলা? নাকি কোনও দেবী ঘনশ্যামের ওপর দয়া করে নির্জন নদীর ধারে সঙ্গ নিয়েছে! আনন্দে অথবা কি একভাবে বুড়োর চোখে জল এসে গেল।

নির্জন নদীর ধারে হিজল গাছের ছায়ায় বসে ঘনশ্যাম ডাকল, 'আয় মা! খুব হয়েছে। একটু জিরিযে নিই। তুই আমার আর জন্মোতে বেটি ছিলিস মা। আয়, কাছে বোস।'

চপলা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কাঁদছ ক্যানে ঘানাকাকা?'

'সুখে মা, বড় সুখে।' ব্যাবড়া হাজা ধরা আঙুলে চোখের জল মুছে ঘনশ্যাম আবার চকমকি ঠুকতে থাকল।...

চপলার মাসি বিধবা হয়েছে যৌবনে। ছেলেমেয়ে ছিল গোটা দুই। ছেলেটা গেরস্থ বাড়ি রাখালি করত। সাপের কামড়ে মারা যায়। মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুরে। বাচ্চা হওয়ার সময় মারা পড়ে। চপলার মাসি চিন্তামণির জীবনে এই দুটো বড় ক্ষতচিহ্ন। তবু কোমর বেঁধে বেঁচে আছে। বাড়ির উঠোন আর পাশের টুকরো জমিতে সে তরিতরকারি ফলায়। কিছু ফলের গাছও লাগিয়েছে। ঝুড়ি যায় নন্দীগাঁয়ের বাজারে। ভাত কাপড়ের অভাব নেই চিন্তামণির। চপলাকে আদর করে কোল দিয়েছে।

চিন্তামণি মেয়েটার রুক্ষ চুলে তেল চিরুনির ছোঁয়ায় সৌন্দর্য ফিরিয়ে বলে, 'থা'ক তুই আমার কাছে। আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন তোর কিসের অভাব? আমি মলে এইসব গাছ-গাছালি ফল পাকড় রইল। ফলাবি, বেচে আসবি নন্দীগাঁয়ের বাজারে। পয়সা পাবি। ভাবনা কিসের?'

'নন্দীগাঁয়ের বাজারে আমাকে নিয়ে যাবে মাসি?'

'যাব বৈকি। কালই চল, সঙ্গে।' চিন্তামণি একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলে, 'পরনে আর তো বস্তর নেই দেখছি। কালই একখান বস্তর কিনে দেব। পরবি। সেজেগুজে থাকবি। এই তো সাজের বয়স, মা।'

চপলা ভাবে, কেন এতদিন সে মাসির বাড়িতেই ওঠেনি! মরতে গিয়েছিল দিদির কাছে আশ্রয় নিতে। খুব ভুল হয়ে গেছে হিসাবে। আসলে মাসি বিধবা মানুষ। তাব নিজের কিভাবে চলছে, এই ভাবনায় চপলা আসেনি মাসির কাছে। কিন্তু এসে দেখে, মাসি ভালোই আছে।

বর্ষার রসে মাসির উঠোনে ঘন সবুজ রঙ ধরেছে। সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে থোকা থোকা। সন্ধ্যায় জোনাকি পোকারা আলোর মালা পরায় গাছ গাছালিতে। মাঝরাতে বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। চপলার হঠাৎ ঘুমটা কেটে যায়। গউয়ের কথা মনে পড়ে। কোথায় আছে এখন সে? এমন করে কতকাল লুকিয়ে থাকবে আর? আবোল-তাবোল ভাবতে গিয়ে কতক্ষণ ঘুম আসে না।

নন্দীগাঁয়ের বাজারে গিয়ে চপলা মাসির পাশে বসল আনাজপাতির ঝুড়ি নিয়ে। পিচরাস্তার দু'ধারে বাজার বসেছে। কত গ্রামের লোক এসেছে শাকসবজি আনাজপাতি নিয়ে। চিন্তামণির সঙ্গে কতজনের আলাপ! কখনও রোদ, কখনও মেঘের ছায়া—কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ছেঁড়া ছাতার তলায় মাসি-বোনঝি একটু আধটু ভিজলও! দুপুর গড়ালে বাজার ভাঙার সময় এলো। খালি ঝুড়ি নিয়ে দু'জনে গেল ময়রার দোকানে। সঙ্গে মুড়ি ছিল। তেলেভাজা কিনে রাস্তার ধারে টিউবওয়েলের কাছে বসে দু'জনে খেল। টিউবওয়েলে জল খেয়ে মাসি বলল, 'আয়, তোকে একখান আঙারবণ শাড়ি কিনে দিই।'

ফেরার সময় বিকালের মাঠে আলপথে রাঙাবরণ শাড়িটা ঝুড়ির ভেতর হাত ভরে কতবার ছুঁয়ে দেখল চপলা। মাসি আগে হাঁটছিল। মাসির মুখে পান। মেঘের ফাঁক গলিয়ে গলা সোনার মতো হলুদ রোদ উপচে পড়ছে চিকনপুরের মাঠে। ক্ষেতে হাঁটু গেড়ে বসে বীজ ধান উপড়াচ্ছে কোনও একলা চাষি। সে মুখ ঘুরিয়ে তাদের দেখে হাসি মুখে বলে, 'ও চিন্তেমাসি বাজারে যেঁইছিলা নাকিন গো? সঙ্গে উটি কে?'

চিন্তামণি জবাব দেয়, 'আমার বোনঝি গো, বোনঝি!'

বাড়ি ঢুকেই চপলা বলে, 'চান করে আসি মাসি। তুমি চান করতে যাবে তো এসো।'

চিন্তামণি বলে, 'আন্না চাপিয়ে তবে না? তোর ইচ্ছে করে তো যা বাছা। কিন্তুক সাবধান, নদীতে বড্ড সোঁত। আঘাটায় ডুবতে যাস না যেন মা!' চান করে দিনের আলো থাকতে থাকতে কখন শাড়িটা পরবে, চপলার মনে সেই ব্যস্ততা। নদীর এপাড়টা ঢালু হয়ে নেমেছে, ওপাড়টা খাড়া। বুক ভরে গেছে জলে। আসার দিন এত জল ছিল না। শ্যাওড়া হিজল ভাঁড়লে গাছের ভেতর দিয়ে ঘাটের পথ। সূর্য ডুবুডুবু। নদীর জলে লাল ঝিমিমিকি ছটা খেলছে। ঘাটের ডাইনে একটু দূরে কে বসে আছে ঝোপের পাশে ঘাসের ওপর। তার পাশে বাঁধা বীজধানের প্রকাণ্ড একটা বোঝা রাখা আছে। আরেকজন আঘাটায় কোমর জলে নেমে গা কচলাচ্ছে আর গল্প করছে পাড়ের লোকটা'র সঙ্গে।

এখানে ঘাটে কয়েকটি মেয়ে নেমেছে। চপলাকে দেখে কেউ একটু হেসে নীরব সম্ভাষণ করে। পাড়ার সব মেয়ের সঙ্গে এখনও চেনাজানা হয়নি চপলার। কিন্তু তার চোখ আঘাটায় ঝোপের ধারে, সেই ঘাটে বসে থাকা লোকটার দিকে। তার মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে।

একটু পরে সে এদিকে ঘুরলে চপলার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। হরিণমারার সেই গউর বসে আছে।

চপলা হনহন করে এগিয়ে গেল কুমড়োর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে।

গউর নিস্পলক চোখে তাকে দেখছিল। জল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল বদরু। সে একটু হেসে বলে উঠল, 'কী হ'ল হে কাদের আলি? অমন করে কাকে দেখছ? মেয়েটা কে বটে হে!'

কাদের আলি! চপলা কুমড়ো ক্ষেতের মধ্যিখানে থমকে দাঁড়াল। তার ভুল হচ্ছে না তো? একই চেহারার মানুষ থাকা সম্ভব? তাছাড়া যাকে গউর ভেবেছে, তার মুখে পাতলা দাড়িও রয়েছে। অথচ সে হরিণমারার গউর ছাড়া কেউ হতে পারে না।

চপলা আরও গণ্ডগোলে পড়ে গেল। গউরের পরণে মালকোচ করে পরা সবজে রঙের লুঙ্গি। লুঙ্গি হিন্দু-মুসলমান সবাই পরে। সেটা কথা নয়—কিন্তু 'কাদের আলি' বলে ডাকছে যে ওকে? তারপর সে দেখতে পায়, 'কাদের আলি' হাসছে। ওই হাসিটা তার চেনা। চপলা ঠোঁট বাঁকা করে তাকিয়ে থাকে। গউর হাত তুলে ডাকে, 'কী হ'ল চপলা? দাঁড়ালে ক্যানে? এসো।'

চপলা কাছে গিয়ে বলে, 'মোছলমানে জাত দিয়েছ প্রাণের ভয়ে? বাঃ, খুব মানিয়েছে দেখছি।'

গউর হো হো করে হাসে। 'জাত দিলেও কি শালারা আমাকে ছাড়বে, চপলা? মোছলমান সেজে আছি। বুঝলে না। তবে কথা কী, আমি জানি তুমি চেকনাপুরে এসেছ।'

চপলা বলে, 'কে বলল?'

'ঘনাকাকা'। গউর ঘাসের দিকে আঙুল তুলে বসার জায়গা দেখায়। বলে, 'না বসলে ঘাট থেকে ওদের দৃষ্টি পড়বে। পাঁচ কথা জানতে চাইবে। এসো বসো।'

চপলা ঘাটের দিকটা দেখে নেয়। এখান থেকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে পড়েছে ঘাটটা। সে বসে পড়ে। জলে বদরু মাছের মতো সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে আপন মনে।

গউর বলল, 'পরশু ঘনাকাকার সঙ্গে ওপারে দেখা হ'ল। মাছ বেচতে এসেছিল। সব কথা শুনলাম। তোমার কথাও শুনলাম। ঘনাকাকা চলে গেলে ভাবলাম যাই, তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু সাহস হ'ল না। চপলা অবাক হয়ে গেল, 'ক্যানে? সাহস হ'ল না ক্যানে শুনি?'

'এমনও তো হতে পারে, তোমাকে ওরা আমার খোঁজে পাঠিয়েছে!'

গউর খিকখিক করে হাসতে লাগল।

চপলা দুঃখিতভাবে মুখ নামিয়ে বলে, 'জানো তুমি বড্ড স্বার্থপর। বড্ড নেমকহারাম।' একটু চুপ করে থাকার পর সে ফের বলে, 'তাই যদি হতো, তাহলে এখনও তুমি এমন করে বেড়াতে পারতে না।'

গউর হাসির মধ্যে বলে, 'ঘনাকাকার কাছে শুনলাম সেদিন গাঁসুদ্ধ লোকের সামনে বলে দিয়েছ, আমার সঙ্গে বিলে তোমার দেখা হয়েছে।' 'বলেছি। রাগ করে বলেছি। বলেছি, ও কিছুতেই ধরা দেবে না! একথাটা বলেনি ঘনাকাকা?'

'হুঁ বলেছে।' গউর আস্তে বলে। 'আসল কথা বলি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি তোমার মাসির ভয়ে। তোমার মাসি তো নানা জায়গায় যায়—বাজারে যায়, টাউনে যায়। তাই।'

'মাসি তেমন মেয়ে না।'

গউর চোখে চোখ রেখে বলে, 'জানতাম এখানে যদ্দিন আছি, তুমিও আছ। যখন-তখন দেখা হয়ে যাবেই। এই তো হ'ল।'

'এমন করে চিরকাল লুকিয়ে বেড়াবে?'

'ধরা আমি কিছুতেই দেব না জেনে রাখো।'

'গাঁয়ে তো ফিরতে পারবে না।'

গউর চুপ করে থাকে। ঘাস ছিঁড়ে চিবোয়।

'তোমার বাবা-মার ওপর অত্যাচার হবে। গাঁয়ের লোকের ওপর জুলুম হবে। জানো না, বড়বাবু শাসিয়ে গেছে, গাঁ জ্বালিয়ে দেবে?' বলেই চপলা একটু চমকায়। ফের বলে, 'এই জানো? আজ শেষ দিন তোমাকে ধরে দেয়ার। আজকের দিনটা দেখে বড়বাবু শোধ নিতে আসবে তোমাদের গাঁয়ে।'

'জানি! ঘনাকাকার কাছে সব শুনেছি।'

'শুনেও চুপচাপ বসে আছো?'

গউর নদীর এপারে দৃষ্টি রেখে বলে, 'বসে নেই। শোনা অবধি মাথায় আগুন ধরে গেছে। আজ রাতে আমি হরিণমারা যাব। ওই দেখছ আমার মিতে বদরু। সেও যাবে। বদরু হরিণমারা গিয়েছিল কাল। আমাদের গাঁওয়ালারাও চুপচাপ বসে নেই। আশপাশের সব গাঁয়ে খবর দিয়েছে। বড়বাবুরা আসুক না গাঁ জ্বালাতে। দেখবে কী হয়!' সে শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলে।

চপলা মুখ নামিয়ে বলে, 'যদি তেমন কিছু হয় তুমি পালিয়ে এসো। আমার মাসির বাড়ি আমি আছি।' বলে সে হাত তুলে গাছপালার আড়ালে বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। 'ওই দেখ মাসির বাড়ি। রাতবিরেতে যখন হোক, এসে আমার নাম ধরে ডেকো। কেমন?'

গউর বলে, 'বেঁচে থাকলে এসে ডাকব।' তারপর সে একটু হাসে। 'তা তুমিও কি এমন করে পালিয়ে বেড়াবে চপলা? সোয়ামীর ঘরে ফিরবে না?'

'অমন সোয়ামীর মুখে আগুন। ভাত দেবার ভাতার না, কিল মারবার গোঁসাই।' বলে চপলা উঠে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার ধূসরতা নদীকে ঘিরেছে। সে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে বলে যায় ফের, 'সাবধানে গাঁয়ে যেও।'

বদরু উঠে এসে গা মুছতে মুছতে বলে, 'মেয়েটা কে হে মিতে?'

গউর বলে, 'আমাদের গাঁয়ের পঞ্চাদার শালী।'

'তোমার সঙ্গে ভাব আছে নাকি হে মিতে?'

'ভাব? তা একটু আছে।' গউর হাসে। 'তবে করেই বা কী লাভ? কবে সোয়ামী এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

বদরু সুর ধরে ছড়া গেয়ে ওঠে, 'পরের সোনা দিওনা কানে, কেড়ে নেবে হ্যাঁচকা টানে।'

ওদিকে ঘাট থেকে চান করে ফিরতে দেরি দেখে চিন্তামাসি ভেবে সারা হচ্ছিল। নদীতে জোরালো তোড় বইছিল। চপলাকে ফিরতে দেখে সে তেড়ে যায়। 'ঘাটে এতক্ষণ কী করছিলি রে মুখপুড়ি? বিদেশ বিভুঁই জায়গা। জোয়ান মেয়ে হয়েছিস — দিনকাল বড্ড খারাপ জানিস না?'

'একটা পুরোনো কাপড় দাও না মাসি, পরি।'

'লতুনখানা পরবি বলছিলি যে?'

'বাজারে যাওয়ার দিন পরব। এখন রাতের বেলা নতুন কাপড় পরে নাকি কেউ?'

চিন্তামণি মুখ টিপে হেসে পেঁটরা খুলে বহুকালের পুরোনো নিজের সধবা জীবনের শাড়িটা বের করে আনে। লম্ফের আলোতে দেখিয়ে বলে, 'এটাই পর তাহলে। খুব মানাবে তোকে।'

শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে দাওয়ার চালের বাতায় ভেজা শাড়িটা মেলে দেয় চপলা। তারপর বাতা দিয়ে প্লাস্টিকের লাল বড় চিরুনিটা পেড়ে চুল আঁচড়াতে থাকে। মাসি তার জন্য কিনে এনেছিল বাজার থেকে।

চিন্তামাসি বোনঝিকে দেখতে দেখতে ধরা গলায় বলে, 'আঁটকুড়ো মিনসের চোখে পোকা পড়েছিল। এমন মেয়েকে দুটো ভাত দিয়ে ঘরে রাখতে পারল না কেন? শুনলাম, এখন কেয়াতলার ইটভাটায় ইট বইছে। পুণ্য চৌকিদারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল বাজারে। সেই বলল। তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম বাছা।'

চপলা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, 'চুপ করো তো মাসি। সন্ধ্যেবেলা বাজে কথা শুনতে ভালো লাগে না।'...

৭

'আপনারা শুধু মুখেই আশ্বাস দিচ্ছেন, কাজে কিছুই করছেন না মশাই!' বড়বাবু দুঃখহরণ সখেদে বললেন। কিন্তু দামি সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে ভুললেন না। আজ প্রায় দু'সপ্তাহের বেশি হতে চলল। আসামিকে অ্যারেস্ট করতে পারলেন না। একটা পুঁচকে ছোঁড়া—একটা জংলী ভূত! তার কাছে পুলিশ ফোর্স হার মানল।'

মাধু দারোগা সিগারেট নিয়ে লাইটার জ্বেলে একটু হেসে বললেন, 'আর কয়েকটা দিন ওয়েট করুন বড়বাবু। জাস্ট কয়েকটা দিন। আবার এমনও হতে পারে আজ রাতেই আসামি পাকড়াও হয়ে যাবে। চারদিকে লোক লাগানো আছে। ভাববেন না।'

'ধুস মশাই!' দুঃখহরণ ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। 'খালি লম্বা চওড়া বাত।'

মাধু দারোগা মিটিমিটি হেসে বলল, 'মুশকিলটা কী হয়েছে জানেন বড়বাবু? ওই যে আপনি আফজলদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে শাসিয়ে এসেছেন, এটাই গণ্ডগোল বাধিয়েছে। খুলে বলি শুনুন। শাসানোর খবর সারা এলাকায় রটেছে। এটা ওদের শ্রেণির লোকেরা অন্যভাবে নিয়েছে।'

দুঃখহরণ ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

মাধুবাবু বললেন, 'দ্বারকা নদীর দু'ধারে নাবাল এলাকার গ্রামের হাব-ভাব আপনি আমার চেয়ে বেশি করে জানেন। ওরা ইল্‌লিটারেট, বোকাসোকা সরল ধরনের মানুষ। কিন্তু বড্ড সেন্টিমেন্টাল। এদিকে প্রাণরঞ্জনবাবু—আই মিন, ছোটবাবুর ওপর এলাকার কয়েকটা গ্রামের লোকের চাপা ক্ষোভ ছিল সেও হয়তো আপনার জানা।'

দুঃখহরণ ফুঁসে উঠলেন। 'ব্যাটা ছোটলোকরা হাড়ে হাড়ে নেমকহারাম! ছোটকুর দয়ায় ওরা..'

হাত তুলে মাধু দারোগা বললেন, 'জানি। কিন্তু যা ঘটেছে তাই বলছি। এরা দারুণ এককাট্টা কোনও কোনও ব্যাপারে। এমনিতে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মাথা ফাটাচ্ছে। খুনোখুনি করছে। কিন্তু স্বভাবে এককাট্টা সব। এর ফলে হয়েছে কী, আসামি গাঁয়ে লুকিয়ে থাকলেও বের করা কঠিন। একটা কচি বাচ্চাও মুখ খুলতে নারাজ। প্রব্লেমটা বুঝলেন?'

বড়বাবু বললেন, 'গোঁত্তা মারুন, তবে তো খবর বেরুবে! সোজা আঙুলে কি ঘি ওঠে?'

মাধু দারোগা হতাশ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললেন, আসামির বাবা-মাকে পাকড়াও করতে পাঠালাম। তারা গা ঢাকা দিয়েছে। ঘরে তালা বন্ধ। ঘনশ্যাম বলে একটা লোককে নিয়ে এলো। ব্যাটাকে ভালো মতন দুরমুস করেও মুখ খোলানো গেল না। তবে একটা খবর আছে হাতে। রাতের মধ্যেই জানা যাবে কী হ'ল!'

দুঃখহরণ উঠে দাঁড়ালেন। 'আর আপনাদের ভরসা করতে পারছি না মশাই। যাই বলুন আপনি। ওপরে মুভ করতে হবে। আপনি নিশ্চয় জানেন মিনিস্টার আমার আত্মীয়। এম.এল.এ আমার ভায়রা ভাই।'

মাধু দারোগা বললেন, 'আহা, সেটা জানি বলেই তো এত গা ঘামাচ্ছি স্যার। তবে শুধু একটা রিকোয়েস্ট, যেন নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে প্রব্লেম বাধাবেন না। প্লিজ বড়বাবু!'

দুঃখহরণ থানার বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে জিপে উঠলেন। জিপটা চলে গেল। মাধু দারোগা বারান্দা থেকে নেমে হাঁক দিলেন, 'সমাদ্দার আছে নাকি?'

এস.আই রমেন সমাদ্দার বেরিয়ে বললেন, 'বলুন বড়বাবু!'

'আমারে আর বড়বাবু কইও না। ক্যায়াতলার বড়বাবুরে সামলাও গিয়া।'

মাধু দারোগা মাতৃভাষায় ক্রোধ প্রকাশ করলেন। 'হালায় গণ্ডগোল না বাধাইয়া ছাড়ব না!'...

৮

...দু-দুটো পাঁচসালা যোজনাতেও এ এলাকার আদিম দশা ঘোচেনি, বাসের ঝাঁকুনিতেই সেটা মালুম হচ্ছিল। কোন মান্ধাতা আমলে পিচ পড়েছে রাস্তায়, জানি না। জায়গায় জায়গায় পিচের চাবড়া সরে গেছে। খানাখন্দ আর পাথরের টুকরো ছড়ানো, মাঝে মাঝে খানিকটা পিচ টিকে আছে। ছোকরা কন্ডাক্টর বলল, 'খুব ফেলাড হয়েছিল স্যার। অর্থাৎ ফ্লাড।' সে দু'ধারের গ্রামগুলো দেখিয়ে বলল, 'সব চাষাভুষোর বাস। আপনি হরিণমারা যাবেন বললেন তো স্যার? তাহলে গাছতলায় নামিয়ে দেব। ভাববেন না।'

গাছতলা মানে বিশাল গাব গাছ। সেখানে নেমে দেখি জনা চার-পাঁচ কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। খবরের কাগজের লোক শুনে তারা আকাশ থেকে পড়ল যেন। তারপর বলল যে, কেন অত কষ্ট করে মিছিমিছি এলাম। হরিণমারায় তেমন কিছু ঘটেনি। যা কলকাতার কাগজে ছাপা যায়। বললাম, ঘটেনি তো আপনারা এখানে কী করছেন? তারা জানাল, এস.পি, ডি.এম—ওনারা সব আসবেন। ভাবলাম, একটু অপেক্ষা করে দেখি, যদি পরিচয় দিয়ে ওদের গাড়িতে লিফট পাই। অবশ্য কন্টাক্টর বলেছিল, মাইল দুই এই কাঁচা রাস্তায় হাঁটলে পৌঁছে যাবেন।

পিচ রাস্তার দু'ধারে বড় বড় গাছ। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ফাঁকা মাঠের গনগনে রোদ্দুর দেখে আতঙ্ক জাগছে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম কারুর পাত্তা নেই, তখন কাঁচা রাস্তায় এগিয়ে গেলাম। কনস্টেবলরা আড় চোখে তাকিয়ে আমাকে দেখতে থাকল। দু'ধারের জমি শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে। ধানের চারা মিইয়ে গেছে। সারা মাঠ হলুদ হয়ে রয়েছে। বুঝলাম, বর্ষা এসেই দূরে সরে গেছে, আকাশ প্রচণ্ড নীল। তবে বাতাস বইছিল উদ্দাম বেগে। আধঘণ্টার মধ্যে গ্রামের কাছে পৌঁছে গেলাম। তারপর চমকে উঠলাম। গাছপালার আড়ালে ন্যাড়া দেয়াল নিয়ে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কিছু গাছও একেবারে ন্যাড়া। ডালপালায় একটিও পাতা নেই। পোড়া ডাল নিয়ে কঙ্কালের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে আছে। একটা নেড়ি কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। গ্রামে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কদাচিৎ দু'একটা টালি বা মরচে ধরা জীর্ণ টিনের চাল ছাড়া আর কোনও বাড়িতে একটু কারও চাল নেই। সব পুড়ে গেছে। কোথাও কোনও লোক দেখলাম না। একটা ফাঁকা জায়গায় পুরোনো ভাঙাচোরা মন্দির দেখলাম। সেখানে যেতেই অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় আবার একদল পুলিশ দেখতে পেলাম।

তাদের মধ্যে ছিলেন কেয়াতলা থানার ও.সি মাধু চন্দ্র ঘোষ দস্তিদার। পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক বাঁকা মুখ করে বললেন. এই জংলি এলাকায় এমন হামেশা হচ্ছে মশাই। লোকগুলো বড় হিংস প্রকৃতির। এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকের সঙ্গে হরদম দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। এ আর নতুন কথা কী?

মাধুবাবুর বক্তব্য হ'ল, কেয়াতলার জোত-জমিওলা ভদ্রলোককে এ গ্রামের একজন যুবক খুন করে। তারপর কেয়াতলার লোকেরা গত শুক্রবার শেষ রাতে এসে গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! এরাও তৈরি ছিল। দু'পক্ষে জনা তিরিশ জখম হয়। জখম লোকদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দারোগাবাবু ক্ষুব্ধভাবে বলেন, বদলির চেষ্টা করছি মশাই। এ খুনেদের দেশে সাত বছর কেটে গেল। নার্ভের বারোটা বেজে গেছে।

বললাম, গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

দারোগাবাবু হাসলেন। পরশু এ ঘটনা। তারপর গ্রাম ফাঁকা। এখনও অনেকে বিলের জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। কাউকে পাবেন না।

দেখি তো! বলে এগিয়ে গেলাম। একটা পোড়া বাড়ির সামনে দেখি, একটা ধানের বস্তা পড়ে রয়েছে। ধানগুলো আধপোড়া। মনে হ'ল হামলাকারীরা লুট করে পালাচ্ছিল। নিয়ে যেতে পারেনি। অধিকাংশ বাড়ি পাচিল ঘেরা নয়। বোঝা যাচ্ছে গ্রামের অবস্থা তত ভালো ছিল না। দারিদ্রের চিহ্ন সবখানে দেখতে পেলাম। কিন্তু ভয়ঙ্কর দৃশ্য হ'ল, বাড়ির

উঠোনে ভাঙা হাঁড়িকুড়ির আবর্জনা। হামলাকারীরা নিশ্চয় গ্রামের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল। ঘরে আগুন জ্বেলেও ক্ষান্ত হয়নি। জিনিসপত্র বের করে ভাঙচুর করেছে। যথেচ্ছ লুটপাটও নিশ্চয় করেছে। একটু পরে ভীষণ দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিতে হ'ল। দুর্গন্ধটা থেকে দূরে সরে গিয়ে একটা পোড়া বাড়ির দাওয়ায় একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে ফ্যালফ্যাল করে আমাকে দেখছিল।

তাকে যখন বললাম, খবরের কাগজ থেকে এসেছি খবর নিতে, মনে হ'ল সে কিছু বুঝল না। বোবা ধরা গলায় বলল, ভগবান নাই!

একটা সিগারেট দিলে সে হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল। তাকে বুঝিয়ে বললাম, কাগজে আসল কথাটা লিখলে সরকারের টনক নড়বে! তখন সে বলল, তাতে কী হবে? আমার জোয়ান ছেলে দুটোকে ফিরে পাব? আমার খোরাকি ধানচাল ফেরত দেবে? সব যে লুটে নিল কেয়াতলার বড়বাবুরা।

বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক কথা জানা হ'ল। কেয়াতলার যে জোতদার ভদ্রলোক খুন হ'ল, বড়বাবু তার দাদা। একদিন গুণ্ডাদের নিয়ে শাসিয়ে যান ভদ্রলোক। গত শুক্রবার শেষ রাতে দুটো ট্রাকভর্তি পঞ্চাশ-ষাটজন লোক নিয়ে... হামলাকারীদের কাছে বোমা বন্দুক আর পেট্রল ছিল। তারা ঘর জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামের পাঁচজন লোককে খুন করে। বোমায় অনেক লোক জখম হয়। বউ-ঝি'র ইজ্জত যায় গুণ্ডাগুলোর হাতে। জিনিসপত্র লুট করে তারা। খাসি-গরু-মুরগি-হাঁস যা পায় লুট করে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা বেগতিক দেখে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। ছোট ছেলেমেয়েদের আগে থেকে পাশের গ্রামে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি রেখে এসেছিল। তাই তারা প্রাণে বেঁচেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, দুর্গন্ধটা কিসের?

গোয়ালঘরে আগুন দিয়েছিল। গরু পুড়ে মরেছে।

কোনও সাহায্য আসেনি সরকার থেকে?

বৃদ্ধ মাথা দোলাল।

হামলা হবে জেনে পুলিশে খবর দাওনি কেন?

দিয়েছিলাম।

পুলিশ আসেনি?

এসেছিল।

ঘটনার সময় কোথায় ছিল তারা?

ঠাকরুনতলায়। বৃদ্ধ একটু পরে ফের বলল, চারজন সেপাই ছিল। কিন্তু তাদের তো পেরানের ভয় আছে বাবু মশাই। বুঝলাম পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চায় না সে। বললাম, তোমার নাম কী?

পশুপতি। আমার ছেলে হরিপদ এ গাঁয়ের মোড়ল।

সে কোথায়?

বৃদ্ধ ধরা গলায় বলল, হাসপাতালে। তার বুকে বল্লম মেরেছিল। কেয়াতলার ভদ্রলোককে কে খুন করেছিল? ক্যাদারের ছেলে গউর্যা। গউব। কেন খুন করেছিল? তা জানি না মশাই। ছিল মনে কোনো রাগ। তাকে পুলিশ ধরেছে কি? ধরতে পারেনি বলেই তো এই হাঙ্গামা। বলে বৃদ্ধ ঘোলাটে চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর চাপা গলায় বলল, হাঙ্গামার সময় গউর্যা গাঁয়ে ছিল। ধনুক আর কাঁড় ছিল গউর্যার হাতে। সেই

কাঁড়ে বড়বাবুর দলের অনেক লোক জখম হয়েছে। গউব এখন কোথায় বলতে পার? বৃদ্ধ পশুপতি মাথাটা জোরে দোলাল।

তার সঙ্গে কথা বলার পর গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। তারপর মুসলমান পাড়ায় ঢুকে শুনি কেউ সুর ধরে কাঁদছে। ঠিক কোন বাড়ি থেকে কান্নাটা শোনা যাচ্ছে হদিস করতে পারলাম না। সারা পাড়ায় কোথাও কোনও লোক নেই। একটা অক্ষত বাড়ির দরজা ভেতর থেকে আটকানো। ধাক্কা দিলাম। কিন্তু কেউ খুলল না। যখন চলে আসছি, তখনও সেই কান্নাটা শুনছি। কান্নাটা ঠাকরুনতলা অবধি যেন আমার পেছন পেছন এলো। একি কোনও মানুষের কান্না, নাকি হরিণমারা গ্রামের কান্না?...

৯

চপলা মাসির সঙ্গে নন্দীগাঁয়ের বাজারে যাবে। চিন্তামণি মাসি বেচবে ছাতু আব চিড়ে। চপলা বেচবে ঝিঙে লাউ ঢেঁড়স আনাজপাতি। যাওয়ার সময় উঠোনের কোণায় দাঁড়িয়ে ষষ্ঠিতলার উদ্দেশে প্রণাম করে চোখ খুলতেই দেখে, নদীর ঘাট থেকে গউর আসছে।

চোখ জ্বলে ওঠে চপলার। কাছাকাছি এসে গউর থমকে দাঁড়াল। তখন চপলা ঝাঁঝালো স্বরে বলে ওঠে, এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি? লজ্জা করে না তোমার?

গউর গলার ভেতর বলে, ক্যানে?

চপলা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তোমার জন্য আমার দিদি বিধবা হয়ে গেল? গাঁসুদ্ধ লোক ঘরছাড়া হ'ল। আবার বলছ ক্যানে? যদি না পারবে কাকেও রক্ষে করতে, ক্যানে তুমি সাপের ন্যাজে পা দিতে গিয়েছিলে?

চিন্তামণি বাঁকা মুখে ডাকল, অ চপলা। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

দুর্গা দাওয়ায় মাটিতে এলোচুলে শুয়েছিল। হাতের শাঁখা নোয়া ঘুচে গেছে। সিঁথি শূন্য। কোলের ছেলেটাকে মাই দিচ্ছিল সে। ছেলেটার মুখ ঠেলে দিয়ে রাক্ষুসীর মতো তেড়ে যায়। তারপর হিংস মূর্তিতে অভিশাপ দিতে থাকে গউবকে।

গউর আস্তে আস্তে ঘোরে। ঘাটের দিকে হাঁটতে থাকে ফের। চপলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে চোখে জল নিয়ে।

গউর নদীতে যায় মোষের মতো। সাঁতার কেটে নদী পেরোতে থাকে। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে চপলা দেখে গউর স্রোতের টানে অনেকটা ভাটিতে চলে গেছে। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওপারে উঠে গউর হনহন করে চলতে থাকে। তার ময়লা মালকোচা করে পরা ধুতিটা লেপ্টে গেছে কোমরে। জল চোয়াচ্ছে ঝরঝর করে। ওপরে বাঁধের পথে সে হিজল গাছের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেও চপলা দাঁড়িয়ে থাকে।

গউর কি কিছু বলতে এসেছিল তার কাছে? চপলা ভেবে কূল পায় না। এখন তার মাথা কুটতে ইচ্ছে করে।

গউর হাঁটছিল বাঁধের পথে। কতদূর গিয়ে সে কাশবনে নেমে যায়। কাশবন ভেঙে হনহন করে চলতে থাকে। বহুদূরে কেয়াতলার বিলে বর্ষার জল চকচক করছে। সবুজ ফাঁড়ি ঘাসের মধ্যে সাদা বক দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। এসব হিজল জামরুলের ছায়া,

কাশকুশ, ফাঁড়ি ঘাসের বনে তার জীবন কেটেছে। এই জগৎটা তার খুবই আপন। খুবই চেনা। অথচ এখন যেন সবকিছু দূরে সরে গেছে। এক অচেনা জগতে হেঁটে চলেছে। ওই বিস্তীর্ণ মাঠ হরিণমারার প্রান্ত থেকে নকশি কাঁথার মতো বিছানা ধূ ধূ করছে রুক্ষতা। সবুজ ধানের চারা শুকিয়ে গেছে। অনেক জমিতে এবার চাষবাসও হ'ল না। হরিণমামার বুকে এখনও দগদগে ঘা শুকোয়নি।

গউরের মাথা ঝুলে গেল। সে হেঁট হয়ে জলকাদা ভেঙে এগোচ্ছিল। তার চোয়াল আঁটো, হাতের মুঠি শক্ত। অনেক দূরে দিগন্তে ছোটবাবুর দালান বাড়িটা রোদে জ্বলজ্বল করছিল। একবার করে মুখ তুলে লাল চোখে দেখে নিচ্ছিল সে।

আবার নদীর বাঁকের কাছে জামবনে ঢুকল সে। বড় জামগাছটার গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে ওপরে উঠল। কোটর থেকে লুকানো অনেক দিনের সঙ্গী সেই ঘাসকাটা প্রকাণ্ড হেসোটা তুলে নিল। তারপর লাফ দিয়ে নামল।

হেসোটার গায়ে বাদামি ছোপ পড়েছে। ধারটা পরখ করল সে। তারপর প্রচণ্ড রাগে একটা হুঙ্কার তুলে সে দৌড়াতে থাকল।

মাঝে মাঝে হাঁফ সামলাতে সে দাঁড়াচ্ছিল। আবার দৌড়াচ্ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম এক বন্য মানুষের মতো দেখাচ্ছিল তাকে।...

বড়বাবু দুঃখহরণ এখন এ বাড়ির মালিক। বাড়ির পেছনের পুকুরে মাছ ধরাচ্ছিলেন। একদল জেলে শোলার ভেলায় চেপে মাছ ধরছিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন বড়বাবু। চারদিকে এখানে সবুজ মাঠ। পয়সার জোরে চাষবাস হয়েছে। বড়বাবু মাঝে মাঝে মুখ তুলে সেই সবুজ দেখছিলেন। ছোটবাবুর কুকুর দুটো তাকে ঘিরে খেলা করছিল। কুকুর দুটোর নতুন মনিবকে খুব পছন্দ। তবে মাঝে মাঝে বেয়াদপি করতেও ছাড়ে না।

হঠাৎ দুঃখহরণ থমকে দাঁড়ালেন। পুকুর পাড়ে একটা মূর্তি ভেসে উঠল। কুকুর দুটো দৌড়ে চলে গেল তক্ষুণি। আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই গেল। কিন্তু লোকটার হাতে ধারালো কী অস্ত্র আছে। একটা কুকুর চোট খেয়ে পড়ে গেল। অন্যটা দূরে সরে গেল।

বড়বাবু দৌড়ে গিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। বন্দুকে গুলি পুরে বেরিয়ে এলেন। গউর এবার জানোয়ারের মতো চিৎকার করে হেসোটা তুলে দৌড়ে এলো। তারপর বন্দুকের শব্দ। জেলেরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এবার প্রচণ্ড চেঁচাতে শুরু করল।

গউর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বড়বাবু জুতোর ডগায় মুখটা কাত করে দিয়ে বললেন, এটা সেই, গউর্যা না? ওরে, আফজলকে ডাক। লাশটা বিলের তলায় পুঁতে দিয়ে আসুক।...

কেয়াতলার বিলের তলায় গউরকে পুঁতে ফেলার সময় আফজল ওর কোমরে জড়ানো একটা সুন্দর লাল গেঞ্জি দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু গেঞ্জিটা ছেঁড়া দেখে সে নেয়নি। গেঞ্জিটার জন্য একটু পস্তানি হয়েছিল আফজলের।

নয়নতারা

১

ন্যাশনাল হাইওয়ে এখানে বাঁক নিয়ে চলে গেছে দূরের শহরে। এই বাঁকের এক পাশে গ্রাম অন্য পাশে হাসপাতাল, খেলার মাঠ, স্কুল, থানা, পোষ্টাফিস। আবগারী দোকানও রয়েছে একটা। ঠিক তারই পাশে শুঁড়িখানা। তারপর ধু ধু মাঠ—বন্ধুর নগ্ন একটা ব্যাপকতা, যতদূর চোখ যায়।

সপ্তায় দু'দিন হাট বসে ধর্মরাজের প্রাচীন বটগাছের ছায়ায়। কয়েকটি চায়ের দোকানও তার আনাচে কানাচে রয়েছে। এমনি এক দোকানে বসে তুষ্টুরামের সঙ্গে পরিচয়।

সেদিনই হাটবার ছিল। কোলাহলে মুখর ছিল পরিবেশ। অভ্যাস মতো ত্রিলোচনের চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

ত্রিলোচনের দোকানটা ছিল বেশ মজার। সদর ও অন্দর দুটি ভাগে বিভক্ত। সদরে তার চায়ের সরঞ্জাম, উনুন, বিস্কুটের টিন, গুটিকয় চেয়ার, বেঞ্চ হাইওয়ের মুখোমুখি। তার পাশ গলিয়ে চটের পর্দা তুলে ঢুকলে অন্দর। সেখানে ঘরভর্তি একটা তক্তপোশ—তাতে তেলচিটে মাদুর পাতা। উপরে ছিটে বেড়ার দেয়ালে মা কালীর ক্যালেন্ডার—যার নীচের দিকটা সিঁদুরের ছোপে অদ্ভুত হয়ে আছে। ব্রাকেটে দুটি-একটি ময়লা জামা কাপড়। তারপরই শুরু হ'ল মোহিনী নারীমূর্তি—পৌরাণিক রাধিকার বস্ত্রহরণ থেকে শুরু করে বম্বের চিত্রতারকা অব্দি অগুনতি মেয়েমানুষ।

ত্রিলোচন বিয়ে করে নি। সে বলত, 'এই তো তিন হাত জায়গার মালিক। নিজেরই কুলোয় না কোন হতভাগীকে এনে কষ্ট দোব!' রামহরি মেকদার গোপনে দাঁত ছরকুটে মন্তব্য করত, 'ব্যাটার জাতজন্মোর ঠিক নেই। ভাসা হাঁড়ির মতো ঘাটে-অঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছে। মেয়ে দেবে কে বলো?' আমি জানতাম না কার কথায় সভ্যতা আছে। তবে ত্রিলোচন তার মাথার পেছনটা দেখিয়ে একদিন বলেছিল, 'দ্যাখো তো নন্দবাবু, মনে হচ্ছে কাদের যেন জাত গেছে; খুঁজে বের করো দিকি!' নিঃসংকোচে সে আমাকে তার পেকে ওঠা চুলের খোঁজ-খবর নিতে বলেছিল। পেছনের ছোট্ট জানালা দিয়ে রোদের আলো ছড়িয়ে আসছিল ঘরে। সেই আলোয় সযত্নে তার দুটি পাকা চুল তুলে দিয়েছিলাম। তখন ত্রিলোচন ক্যালেন্ডারের দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকিয়ে ছিল। বলছিল, 'এটা কত সাল?' তারপর বিড়বিড় করে কী গোনার পর ফিক করে হেসে ফেলেছিল। 'তাহলে পঁয়ত্রিশ পেরোলাম। কিন্তু চুলের কী দোষ হ'ল বলতে পার নন্দবাবু? নাকি গন্ধতেলের বিষ?'

আমি বলছিলাম, 'অসম্ভব নয়। বরং নারকেল তেলই মেখো এবার থেকে।'

নিঃশব্দে মাথা নেড়েছিল ত্রিলোচন। তবলা জোড়া টেনে নিয়ে বলেছিল, 'চুলোয় যাক গে। এসো, খানিক হয়ে যাক'। ডেনোর ওপর অনর্গল তেরেকেটে তোলার পর হঠাৎ থেমে সে ফের বলেছিল, 'নন্দবাবু, মধ্যে মধ্যে খুবই ভয় পাই, জীবনটা তো চলেই যাচ্ছে ফুরোবার দিকে, কী যেন বাদ থেকে গেল। কিন্তু...' কিছু সময় থেমে কথাটা শেষ করেছিল ত্রিলোচন, 'এই জগৎটায় ডুবে গেলে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। ...কই লাগাও একখানা ঠুংরী গোছের বেশ জমাটি কিছু...'

সত্যি, সব তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে। গানের গভীর সমুদ্রে আমাদের সবটুকু অস্তিত্ব ডুবুরীর মতো খণ্ড খণ্ড অজ্ঞাত সত্যের মুক্তো সঞ্চয়ে ব্যাপৃত। আমরা বিশ্বাস করেছি, জীবনে ঈশ্বর যদি থাকে তা এই সুরের জগৎ। চেতনার সঙ্গে তা একাকার। শরীরের জৈব কোষগুলি সুরের আগুনে ফসফরাসের মতো জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। তন্ময়তার এক উজ্জ্বল অগ্নিস্রোত লেহন করছে সত্তাকে। ত্রিলোচন ঝুঁকে পড়েছে তবলার ওপর। স্রোতে ভাসমান শবদেহের মতো তার শরীর শিথিল শীতল মাংসপিণ্ড মাত্র। এবং তখনই হঠাৎ জেগে দেয়ালের দিকে তার যত্নে টাঙানো ছবিগুলি আমি দেখে নিয়েছি। নগ্ন কালীমূর্তিতে সিঁদুরের ছোপ আর অপরূপা সব মানবী...দিনক্ষণসময়ের লালরঙে চিহ্নিত সংখ্যাবলী—যা নিয়ে ত্রিলোচন কোনো কোনো দুঃসহ বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে।

বেকার ক্লান্ত বিক্ষত সেই দিনগুলিতে ত্রিলোচনের ছোট্ট অন্দর আমাকে টেনেছে নিবিড়ভাবে। মনে হয়েছে, না গেলে কত কী ফুরিয়ে যায়।

জীর্ণ মলিন মাদুরের ওপর হারমোনিয়াম, বাঁশি, খঞ্জনি আর তবলা দুটি ছিল ছাড়পত্রের কয়েকটি বিবরণ। হাতে নিলে আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে যায়।

ফাল্গুনের শেষ সময় তখন। হাইওয়ের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছে থরে থরে ফুল ফুটেছিল। নগ্ন দূর মাঠের নিঃসঙ্গ শিমূলেব শীর্ষেও রক্তবর্ণ ফুলের মেলা বসেছিল। দক্ষিণের বাতাস বইছিল একটু করে। ত্রিলোচনের অন্দরে বসে আমি হারমোনিয়ামে এলোমেলো সুর তুলছিলাম। রীড থেকে রীডে ছেলেমানুষী বিহ্বলতায় আঙুলগুলি সঞ্চারিত হচ্ছিল।

সেদিন হাটবার।

ত্রিলোচন সদরে বসে খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মধ্যে মধ্যে তার চামচ নাড়ার মিষ্টি শব্দ, ছাঁকনির ঠকঠক, পয়সা গোনাও শুনতে পাচ্ছিলাম। বাইরের তুখোড় হট্টগোল ভেদ করে তাব এই জীবন যাত্রার ছোট্ট একটা দিক প্রকট হচ্ছিল এতে। আমার হাসি পাচ্ছিল। ত্রিলোচনের একটা কথা মনে পড়ছিল। সে বলত, 'আচ্ছা নন্দবাবু, বিধাতা সবই দিলেন ইচ্ছা বাসনা কামনা; ষড়রিপুও দিলেন। তা বেশ করলেন। কিন্তু এইটে কেন দিলেন বাপু?' পেটটা বাজিয়ে সে এইসব বলত। 'শুধু ইনিকে বাদ দিলে যা হ'ত না! সে এক মজার কাণ্ড!' হিহি করে সে হাসত। তার এই হাসির গভীর দুঃখটা আমি বুঝতাম। আসলে সে একজন যথার্থ গুণীলোক। অথচ নেহাৎ পেটের জন্যই তাকে কী হাস্যকর চেহারা নিতে হয়। খদ্দেরের সঙ্গে বচসা. গরম জলের চিৎকার, উনুনের চোখ রাঙানি—এসবের মধ্যে বিপন্ন ত্রিলোচনকে মনে হতো দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীর মতো—যে এগুলি ফাঁকি দিলে সতর্ক সেপাইয়ের বুট-বেটন খাবে। দুঃখিত হতাম তাকে দেখে।

ত্রিলোচনের ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর শুনলাম। 'মাফ কর দাদা, ওসব অনেক দেখেছি। তিল তাল হয়ে ওঠে দেব-দিচ্ছি করে। তারপর রাতারাতি বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে উধাও। তখন মরো না পাছা চাপড়ে।

অপরিচিত কণ্ঠ হা হা করে হেসে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। তেমন প্রাণখোলা হাসি আমি জীবনে শুনি নি। 'বাপরে বাপ! আপনি তো দেখছি পোড়খাওয়া আদমী।'

ত্রিলোচন বলল, 'সেবারে একটা সার্কাস এলো। রঙঢঙ দেখে মনে হয়, না জানি সব কত মহাজন ব্যক্তি। টাই সুট বুট লাগিয়ে সপ্তায় চোদ্দশো কাপ চা খেয়ে গেল। একদিন সকালে উঠে দেখি, ও মা...শুধু মুরগীর পালক, পেয়াজের গুচ্ছের খোসা, মাটির চাঙড় আর পোড়া ইট নিয়ে ময়দানটা দাঁত ছরকুটে পড়ে রয়েছে। বাসী মড়া একেবারে।—'

লোকটা আর হাসছে না। বলল, 'লেকিন এটা সার্কাস নয় রে দাদা। সার্কাসে ওসব হয়। আমাদের হচ্ছে ভ্যারাইটি শো। মালিকও মস্তো আদমী। দু'চারদিন শো বন্ধ থাকলে দুশো পাঁচশো পকেট থেকে হামেশা ছুঁড়ে দ্যান। আলাপ হলে দেখবেন, যা বলেছি ঠিক কি না।'

ত্রিলোচন দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। 'রাখুন মশাই। একই রোগা বাঘ আর একটা খোঁড়া সজারু নিয়ে আর গুমোর করবেন না। চেহারা দেখেই বুঝেছি!'

লোকটিও রেগেছে এবার। 'ইচ্ছে হয় দেবেন, না হয়, না। তা বলে যা তা বলবেন না। আমাদের পার্টির একটা ইজ্জত আছে। শুধু বাঘ-ভেড়া নিয়ে খেল দেখাই নে। মোহিনী মেয়েছেলেও রয়েছে। গান শুনলে তামাম চকবাজার পায়ে সেলাম বাজিয়ে যাবে।...'

এমনভাবে কথা বলছে, যেন এই সুযোগে একটা বিজ্ঞাপনও ঘোষণা করছে সে। তারপর সত্যি সত্যি অনর্গল উচ্চকণ্ঠে সে তার পার্টির ক্রিয়াকাণ্ডগুলি বলে গেল। একটা অদ্ভুত সাপিনী—তার নাম আমিনা। তাকে জড়িয়ে ধরে মেয়েমানুষ নাচে। নাচতে নাচতে গান করে। আর ওই ভয়ংকর বাঘটার নাম 'ওসমান খাঁ'। সেও ভি নাচে আমিনাকে কোলে নিয়ে। আমিনা তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। তারপর আছে বুঢুয়া সজারু। সব সময় সে ঝিমুচ্ছে। দানাপানি খেতে ইচ্ছে নেই। গুটিসুটি বসে কী সব ভাবছে। কিন্তু স্টেজে এনে খাঁচা খুলে দিল। সব সে বঢ়িয়া আউরত তাকে গানের সুরে ডাক দিল। শেষে নাচতে ভি থাকল। তখন...বাস রে বাস, কাঁটাগুলি খিট খিট করে বাজছে তালে তালে। সে মাতাল হয়ে যাচ্ছে।

...আব জানো রে দাদা, বুঢুয়া একটা সজারু। বনের জানোয়ার। কিন্তু সে মানুষের মতো কাঁদে। সজারুর চোখে জল। ঝরে পড়ে আঁসুর ফোঁটা। ধারাল কাঁটাগুলি। বেয়ে খাঁচার শক্ত পাটাতনে টুপটাপ পড়ে। যদি বলেন, ও তো একটা অবোলা সজারু, লেকিন কাঁদে কেন?

...কেন? তো পুছে লিন ওর কাছে। ওর বাইরের কাঁটা ভেতরের দিলেও নাকি ঢুকে গেছে কখন। বুঢুয়ার বহুটা মরে গেছে ভাই রে...নসীব!

আবার সেই প্রাণখোলা হা হা হাসি। স্থির থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে গেলাম বক্তাকে দেখতে। দেখলাম ছোটখাটো একটি মধ্যবয়সী মানুষ। চুলগুলি ঠিক সজারুর মতো খাড়া। বড় ডাঁসালো গোঁফ স্থূল নাকের নীচে এক হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কানের বাঁধে ঘন লোম। তেমনি ওর গলার নীচে শার্টের ফাঁকে উঁকি মারছে। হাত দুটো কনুই অব্দি খোলা। সেখানেও লোমারণ্য। প্যান্ট-পরিহিত লোমবহুল হ্রস্ব শরীর এই লোকটি আমাকে আকর্ষণ করছিল।

ত্রিলোচন চুপ মেরে গেছে ততক্ষণে। আমাকে দেখেই মুচকি হেসে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সে যা ভাবছিল তা নয়। একটা গুহ্যতত্ত্ব থাকলেও থাকতে পারে।

বললাম, 'এসো দাদা। বসো এখানে।'

জোড়হাতে নমস্কার করে বলল, 'হ্যাঁ স্যার। বসবো বৈকি। বসতেই তো এসেছি আপনাদের দেশে। কিন্তু দোকানদার মশাই কেমন বেরসিক দেখুন...'

পাশে বসে সে বলল, 'আমার নাম আজ্ঞে, তুষ্টুরাম। শো-তে দেখবেন হামেশা। খেলা কসরতও জানি, লোক হাসাতেও পারি।'

ত্রিলোচন বলল, 'ও। ক্লাউন।'

তুষ্টুরাম ফের নমস্কার করে বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। কালাউনই বটে।'

আমি বললাম, 'চা দাও ত্রিলোচন। দুটো।'

ত্রিলোচন ভ্রূভঙ্গী করে লুকিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'গানের ব্যাপার আছে বলল গো, শুনেছেন?'

তুষ্টুরাম অন্দরের দিকে হঠাৎ ঝুঁকে উকি মেরে বলল, 'ও হো! তাই বলুন। অনেকক্ষণ থেকে পোঁ পোঁ কানে আসছিল। কথায় বলে নাড়ীর টান। তাতে জহুরী জহর না চিনলে চিনবে কে? বুঝলেন স্যার? আমিও অল্পস্বল্প চলাফেরা করি ও লাইনে। সঙ্গদোষ বলতে পারেন। নয়নতারা গাইতে বসলে সঙ্গত-টঙ্গত করতে হয়। পার্টিতে আর সবাই তো ও বিদ্যেতে অষ্টরম্ভা।...

প্রশ্ন করলাম, 'কে বললে?'

'নয়নতারা।' তুষ্টুরাম চোখ নাচিয়ে নিঃশব্দে হাসল।

'সে-ই বুঝি ভালো গায়?'

'শুধু গায় না, নাচেও ভালো। যাবেন, আলাপ করিয়ে দোব।' তুষ্টুরাম গভীর তৃপ্তিতে চা খেতে থাকল।

তুষ্টুরামের হাত ধরেই প্রবেশ করেছিলাম সেদিন। আবগারী দোকান আর শুঁড়িখানার মাঝামাঝি ফাঁকা এক টুকরো জমিতে ছোটবড়ো কয়েকটা কাঠের খাঁচা, সারবন্দী বাক্স-পেটরা লোহার রড আর খুঁটিখাম্বাগুলি পড়ে ছিল। একদল লোক শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ছিল। অদ্ভুত চিত্রবিচিত্র পোশাক পরা আরও কয়েকজন জমিটার চারপাশে ঘোরাফেরা করছিল। ঠিক মধ্যখানে স্থূল ও দীর্ঘ একটি শালকাঠের মাস্তুল কপিকল রশারশি ও প্রকাণ্ড কাপড়ের বান্ডিল। তুষ্টুরাম না বলে দিলেও জানতাম ওটা তাঁবু। তুষ্টুরাম পরিহাসের ভঙ্গীতে বলেছিল, 'উও ভি একটা জানোয়ার। হাঁ করলে আদমীরা পেটে সেঁধিয়ে যায়।' এবং বিকট মুখব্যাদানের অপেক্ষায় একটা রহস্যময় জন্তুর মতোই যেন জাবর কাটছিল গুটোনো তাঁবুটা। তাকে জীর্ণ ও ঝুলিমলিন দেখাচ্ছিল। ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। আর তার ঠিক পিঠের ওপর বসেছিল দৈত্যাকৃতি একটা লোক। স্থূল কিন্তু তীক্ষ্ণ নাক, তুষ্টরামের মতো গোঁফ, মাথায় টাক। তার পরনে ওই তাঁবুর রঙের ধূসর একটা পাঞ্জাবী ও ধুতি। পায়ের পাম্পশু জোড়াও ঈষৎ মলিন ও জীর্ণ। তারপর তার মুখের দিকে সোজাসুজি না তাকিয়েও হাতের ময়ূরমুখো কালো ছড়িটা সমেত ওই বিরাট অস্তিত্ব ঈষৎ সমীহ জাগিয়েছিল আমার মনে। ঠিক অন্য কোনো কারণেও নয়, তুষ্টুরাম কথিত জন্তুটার যথার্থ মালিককে আমি অনুভব করেছিলাম তক্ষুণি।

তুষ্টুরাম হঠাৎ থেমে মিলিটারি কায়দায় জুতো ঠুকে স্প্রিঙের মতো একখানি সেলাম ঠুকেছিল। তারপর আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল 'মালিক। দুর্গামোহনবাবু।'

জানি না কে আমার হাত দুটি তুলে আমাকে নমস্কার করিয়ে দিল। আমার শিক্ষাদীক্ষার বোধ, সকল অহংকার দুর্গামোহনের প্রথম দৃষ্টিপাতেই জ্বলে খাক হয়ে গেল যেন। আমি গুটিয়ে যাচ্ছিলাম একটু করে। চকবাজারের সবচেয়ে গুণী ও জনপ্রিয় একটি ভালো ছেলে নন্দ ঠিক খাঁচায় পোরা প্রাণীদের মতো বশ মেনে গেল।

পরে বহুবার এই দীনতা ও সংকোচবোধ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল আমার মধ্যে। এ বিরোধ থেকে বিদ্রোহের বীজ এমনি করে উদগত হয়েছিল পরবর্তী জীবনে।

তুষ্টুরাম চুপিচুপি আমাকে বলেছিল, 'নন্দবাবু, ও লোকটা বহুত জাদুর খেল জানে। ও জানোয়ারের সামনে এলে জানোয়ার ভি মাথা লুটিয়ে দ্যায় পায়ে। লেকিন, বলুন তো দাদা, আমরাও কি জানোয়ার? দেখুন তো, হাজার লোক তাঁবুর ভেতর খেল দেখছে। অপসন্দ হলে চেল্লাচ্ছে। পসন্দ হলেও ভি চেলাচ্ছে। কিন্তু মালিকবাবু যেই এসে বলল, চুপ, চুপ...আমার একটা কথা শোনেন আপনারা...বাস, সব চুপ। চুহা ভি দাঁতে মাটি কাটতে ভুলে গেছে।'

ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম এ কথা শুনে। প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই এই প্রশ্ন মনে জেগেছিল বলে ক্ষোভটা বুঝি চলছিল একটানা। আমাদের ভিতর বুঝি একটা নিতান্ত জানোয়ার লুকিয়ে রয়েছে। দুর্গামোহনকে তারা ভয় পায়। প্রথম দৃষ্টিপাতেই সে চমকে উঠেছিল। সম্মোহিত হয়েছিল।

নাকি অন্য কিছু?

তুষ্টুরাম তারপর আমাকে জমিটার শেষপ্রান্তে নিয়ে গেল। ঘন ফণিমনসা আর কাঁটামাদারের গাছে ছোটখাটো একটা দুর্ভেদ্য জঙ্গল সেখানে। গ্রামের পরিত্যক্ত মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়ানো চারপাশে। কিছু আবর্জনা। আঁতুরঘরের নোংরা ছাইপাঁশ ও ন্যাকড়া। বীভৎস গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে। তুষ্টুরাম নাকে রুমাল দিয়েছিল।

তার একপাশে শিরীষ গাছের নীচে ততক্ষণে একটা ত্রিপলের তাঁবু তৈরি হয়ে গেছে। ফাল্গুন মাসের কাঁটামাদার গাছ থেকে একটি মেয়ে লাল লাল ফুল তুলছিল। তার খোঁপাটা ঝুলে পড়েছিল পিঠে। চিত্রিত হলুদ শাড়ি থেকে আঁচলটাও লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। নগ্ন ব'লে পায়ের পাতা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। থেমে যেতেই তুষ্টুরাম মুচকি হাসল। 'জাদুকা খেল দেখুন স্যার।'

প্রশ্ন করলাম, 'কে ও?'

তুষ্টুরাম হঠাৎ আমার হাত ধরে তালুতে একটু চাপ দিল। অশ্লীল ধরনের একটা ইঙ্গিত যেন প্রচ্ছন্ন তাতে। অথচ আমার ভালো লাগল। আমি কি ততক্ষণে ঠিক জানোয়ার হয়ে গেছি? আমি যখন পা তুললাম, মনে হয় বড় ক্লান্ত। আমার জানু দুটি ভারী বোধ হচ্ছিল। এবং বিস্মিত হয়ে আরও অনুভব করলাম, আমার বুক কাঁপছে। তুষ্টুরাম বলল, 'নয়নতারা।'

তারপর নয়নতারা মুখ ফেরাল। পাথরের একখানি মুখ। যে উচ্ছলতার আশা করছিলাম, তা ছিল না ও মুখে। তারপর সে ফুলগুলি নিয়ে যত অগ্রসর হ'ল, তাতে আমার প্রত্যাশিত আক্রমণাত্মক কিছু নেই। তার পদক্ষেপগুলি শান্ত। তার হলুদ শাড়ি

কালো ব্লাউজ খুবই নিস্তেজ। তুষ্টুরামকে দেখে সে একটু হাসল। তার হাসিটুকুও বেশ অনিচ্ছুক। পাণ্ডুর মুখে ওই হাসি, যতখানি ভেবেছিলাম, গ্রাস করতে পারছিল না আমাকে।

একদিন কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতে আমি নদীর ওপারে নিঃসঙ্গ চলে গিয়েছিলাম। বাঁশি বাজানোর একটা সেকেলে খেয়াল আমাকে সে-রাত এরূপ বিভ্রান্ত করেছিল। নদীপারের বিস্তৃত প্রান্তরে কাশবনের শীর্ষে কৃষ্ণাতিথির ক্ষীণ চাঁদটা দেখতে দেখতে ঠিক যেমন হতাশাব্যঞ্জক অনুভূতি আমাকে কাতর করেছিল, শেষরাতের সে ক্লান্তি ও অর্থহীনতা অবিকল মনে পড়ে গেল।

কোনো সুর কোনো দৃশ্য যেমন মনে পড়িয়ে দেয় কোনো অলৌকিক অথবা রহস্যময় ঘটনার কথা—যে-ঘটনার সবিশেষ আমরা জানি না...

অথচ মনে হয়। শুধু মনে হয়। ঠিক সেরূপ মনে হওয়া জেগে উঠতে আরও কিছু দেরি ছিল সে-মুহূর্তে।

অথচ সেই অজ্ঞাত জেগে ওঠার ক্ষণ ভ্রূণরূপে সুপ্ত ছিল আমারই মনে। তাই কি নয়নতারার পাথরের প্রতিমার চোখ দুটি আমাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেল?

স্পষ্ট জানতাম না। একটু হেসে প্রতি-নমস্কার করার সময়ও হঠাৎ জেগে ওঠা লালিত আভিজাত্যবোধ ফের সংকুচিত করছিল আমাকে। তবু বাইরে পেতে রাখা তক্তপোশে আমি বসলাম। তুষ্টরাম বলল, 'জবরদস্ত গানেওলা গো। আপনা কানসে শুনে এলাম।'

নয়নতারা স্থিরচোখে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। এবার নীরসমুখে বলল, 'বেশ তো। ভালো।'

উত্তরোত্তর আমার ক্ষোভের কারণ ছিল তার এই নিস্তেজ আচরণে। তাই এবার মুখোমুখি ওর দিকে তাকালাম। প্রশ্ন করলাম, 'আপনি ভালো গাইতে পারেন। তাই না?'

জবাব দিল তুষ্টুরাম। হাততালি দিয়ে বলল, 'বাপ রে বাপ। স্টেজে দেখবেন, না শুনবেন? য্যায়সা নাচ, ত্যায়সা গান। বলছিলাম না বুঢ়ুয়াকে মাতাল করে দ্যায়। মানুষ তো মানুষ। আদমী!' হা হা করে হাসতে থাকল সে।

বললাম, অসুবিধে না হলে হোক না একখানা।

নয়নতারা জবাব দিল না। তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল। স্টোভের পাশে একটা থালায় আনাজ কোটা ছিল। একটা শূন্য বালতি নিয়ে সে বেরিয়ে এলো। তারপর ডাকল, ডিব্বু, ওরে ডিব্বু।'

বাঘের খাঁচার ওপার থেকে একটি বছর সাতেকের ছেলে ছুটে এলো। পরণে খাঁকি হাফপ্যান্ট। উদোম গা। পা-দুটিতে জুতো নেই সুশ্রী হাসিখুশি ছেলেটি নয়নতারার হাত থেকে বালতি নিয়ে হাটতলার দিকে চলে গেল।

বললাম 'কে ও?'

তুষ্টুরাম ইতস্তত করছিল যেন। নয়নতারা বলল, 'আমার ছেলে।'

বিস্মৃত হয়ে তার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালাম। তখনই তার কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাটা দাগটা দেখতে পেলাম। এই দাগটা তার মুখের শ্রী-কে পরিস্ফুট করেছে। এবং বয়সের ব্যাপারে আমার হিসেবের গলতিটুকুও তখন ধরা পড়ে গেছে। কত বয়স হতে পারে তবে? চব্বিশ? ছাব্বিশ? আমার মন ঈষৎ কটু হয়ে গেল এই

হিসেব-নিকেশে। দিদির বয়সী একটি মেয়ের সম্পর্কে আমি কিছু অশ্লীল চিন্তার অপরাধে অপরাধী। এবং এই বোধ আমাকে ছন্নছাড়া করছিল। নয়নতারার মাতৃত্বকে আমি অপমান করেছি মনে মনে। হয়তো এ দোষ তুষ্টুরামের ভঙ্গীগুলি থেকে জন্মেছিল। ক্ষুব্ধভাবে বললাম, 'তুষ্টুরাম, এখন উঠি ভাই। পরে আসব।'

তুষ্টুরাম কিন্তু অন্যমনস্ক। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আসবেন। জরুর আসবেন।'

উঠে আসছিলাম। সুমুখে দুর্গামোহনকে দেখে দাঁড়ালাম। দুর্গামোহন হাসল। 'চলে যাচ্ছেন যে? আপনাদের দেশে নতুন এলাম মশাই, আলাপ-টালাপ না হতেই কেটে পড়ছেন? বেশ লোক আপনি। আসুন আসুন...' হাত ধরে টানল দুর্গামোহন। 'মুসাফিরী লাইন আমার। তবু যেখানে দুদণ্ড বসি, সেখানেই নাড়ীর টান বসে যায়। জীবনটা তো এই করেই কাটল...'

অনর্গল কথা বলতে বলতে সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। তার মধ্যে ভীতিকর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। এবং রজ্জুতে সর্পভ্রমের নিরসনে সরল আনন্দ আমাকে পেয়ে বসেছিল। তক্তপোশটা রুমালে ঝেড়েপুঁছে দুর্গামোহন চাপড় মারল। বলল, 'বসুন এখানে। এখনও কিছু গুছিয়ে উঠতে পারিনি। সাঁইথে থেকে পৌছেছি সেই ভোর রাতে। লোকজন ল্যাগিয়ে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। আজ সন্ধেতেই শো দেব।' তারপর বলল, 'বাবা, তুষ্টুরাম, এক কেটলি চা নিয়ে আয় দিকি।'

তুষ্টুবাম মুখ নিচু করে বলল, 'এখানে দোকানগুলো যেন কী। বিশ্বাসই করতে চায় না স্যার। খুব ফ্যাসাদ বেধেছিল খানিক আগে।'

'ঘাবড়াও মাৎ।' দুর্গমোহন কেটলিটা তার হাতে গুঁজে দিল। তারপর পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে মারল ঠিক মুখের ওপর। তুষ্টুরাম সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

দুর্গামোহন বলল, 'কী রে নয়ন, চুপচাপ বসে কেন? রান্না চাপালি নে?'

নয়নতারা বলল, 'ডিব্বু জল আনতে গেছে।'

'কী মুশকিল!' দুর্গামোহন হাটের দিকে ব্যস্তভাবে তাকাল। বলল, 'কেন, ওকে পাঠালি কেন? আ হা, বেচারা।'

'আর কে যাবে! সব্বাই তো ওদিকে ব্যস্ত।'

'কেন, তুষ্টুরাম তো ছিল!'

নয়নতারা জবাব দিল না।

দুর্গামোহন বলল, মরুক গে। এখন আয় দিকি এখানে। বাবুজীকে একখানা শুনিয়ে দে। ঘরে গিয়ে নাম করবেন। ওনারা নাম করলেই আমাদের মানসম্মান। নইলে পোঁছে কে? কী বলেন মশাই?'

দুর্গামোহন জোর হাসছিল। তার শরীর দুলছিল। তক্তপোশটার কাঁপুনি অনুভব করছিলাম। কিন্তু সে হাসি ঘোর নিঃশব্দ। এত নিঃশব্দে প্রচণ্ড হাসি আমি কোথাও দেখি নি। নয়নতারা পেছন ফিরে একটা বাক্সর ওপর ঝুঁকে পড়ল। অস্ফুট স্বরে কী সে বলছিল। তারপর ডালা খুলে একটা হারমোনিয়াম বের করল।

তক্তপোশে এনে রাখবার সময় সে হাঁফাবার ভান করছিল। বলল, 'বাব্বা! একটা সেকেলে সিন্দুক!' সাড়ে তিন অক্টেভো সেই বিরাট হারমোনিয়ামটা দেখে আমি ঠিক

বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দুর্গামোহন সোল্লাসে বলল, 'আরে বাবা! আপনিও দেখছি মশাই একজন গুণীলোক। নয়ন, তোর রান্নার লোক দিচ্ছি আমি। সকাল বেলাতেই শুভযাত্রা হয়ে যাক।'

বলতে বলতে তুষ্টুরামও হাজির এদিকে। দুর্গামোহন বলল, 'বাবা তুষ্টু, খুব তুষ্ট হয়েছি তোর ওপর। তবলা বাঁয়া বের কর।' নয়নতারা কাপে চা এগিয়ে দিল। হারমোনিয়ামের ওপর কাপটা রেখে, তবলায় সুর বাঁধবার আগেই গান গেয়ে উঠলাম। মীরার ভজন।

এই যন্ত্রটায় যে সুর উঠেছিল তা যেন দূর ও গভীর থেকে। যেন একটা প্রাচীন বিষাদ এর কাঠ ও ধাতুনির্মিত পাতগুলির খোলস অতিক্রম করে আসবার সময় শুধু একটা করুণ আর্তিকেই বহন করতে সমর্থ হচ্ছিল। হাইওয়েতে নিয়ত চলমান যানবাহনের গর্জন, হাটতলার কোলাহল, এখানে চারপাশে কর্মরত লোকগুলির শ্বাসক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর...সবকিছুর ওপর যেন একটা নিস্তল অসহায়তার সৃষ্টি করছিল সে। এবং এই বিষাদময় সুরাবরণের অন্তরালে দুর্গামোহনের মুখ ধূসর হয়ে উঠেছিল। তার ছড়িটা অস্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হচ্ছিল। তুষ্টুরামের তবলার ধ্বনিপুঞ্জ দ্রুততালে সেই ঘোরঘন বিষাদের ওপর ক্ষিপ্র বুনুনিতে নকশা আঁকছিল। ঠিক বহুছিদ্রবিশিষ্ট বিস্তৃত জালের আড়ালে মৃত মৎসের মতো ভাসমান নয়নতারাকে দেখছিলাম।

স্বকপোলকল্পিত বিভ্রমের ঘোর মুহূর্তে কেটে গেছে তারপব।

অন্তরার শেষ কলি এবার নয়নতারাই গেয়ে উঠেছে।

শিরীষগাছের ভঙ্গুর কাচের মতো লঘু-ছায়ায় তক্তপোশটা ইতিমধ্যে আবৃত হয়েছে। তুষ্টুরামের বোল বদলে যাচ্ছে এবার। নয়নতারা আড়চোখে চেয়ে বলল, 'ঠিকসে বাজাও।'

সলজ্জমুখে হার স্বীকার করেছিল নয়নতারা। দুর্গামোহন ঘাড় কাৎ করে বসে ছিল। শেষে বলেছিল, 'আপনি কী করেন?'

বলেছিলাম, 'কিছু না। পড়াশুনা শেষ করে বসে আছি। চাকরী খুঁজছি।'

'ঘরে কে আছে?'

'বাবা। মা নেই।'

'ভাই বোন?'

'কেউ নেই।'

'বাবা কী করেন?'

'স্কুল মাস্টার।'

দুর্গামোহন কী বলতে যাচ্ছিল। তার কথা থামিয়ে নয়নতারার গান শুনতে পেলাম আবার। 'পরজনমে...রাধা হয়ো তুমি প্রিয়...'

দুর্গামোহন অবার নিঃশব্দে সেই হাসি হাসতে থাকল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চাপা গলায় বলল, 'ছাড়ছে না আপনাকে। অনেক ঘাটের ইয়ে তো...'

তুষ্টুরাম তবলায় চাঁটি মেরে বলল, 'মড়া।'

নয়নতারা একটু হাসল মাত্র। লক্ষ্য করলাম একেবারে এগারো পর্দায় গলা দিয়েছে। হাসি পাচ্ছিল। শেষরক্ষা হলে হয়।

কিন্তু...কিন্তু আমাকে যথার্থ বিস্মিত করল সে। এবং এ বিস্ময় আস্তে আস্তে নিঃশেষ করে তার গান আমাকে কেমন অস্থির করে তুলল। চারপাশ থেকে তার সুর আমাকে আক্রমণ করছিল। এ বিষাদ নয়। এ ছিল তীব্র, সুতীব্র এক জ্বালা। দাবানলের মতো তার গান গ্রাস করছিল আমার সত্তাকে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখা আমাকে লেহন করছিল। তার কণ্ঠস্বরে সুরের যাত্রায় প্রতি বাঁকে একটি করে জ্বলন্ত মশাল সঞ্চারিত করে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল।

ডিব্বু ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। তাকে ডেকে বললাম, 'খোকা, একটা কথা শুনবে?'

সে মাথা নাড়ল।

'ওই দোকানে একটা লোক আছে। তার নাম ত্রিলোচন। তাকে গিয়ে বলো, নন্দবাবু বাঁশিটা দিতে বললেন।'

একটা অমানুষী ধরনের ছেলেমানুষী আমাকে পেয়ে বসেছিল। বাঁশি দিয়ে আমি আত্মরক্ষার ভান করছিলাম। এ খেলার কোনো অর্থ হয় না। শিক্ষাদীক্ষা রুচি সব ভুলে গিয়েছিলাম।

নাকি সবই দুর্গামোহনের আরোপিত একটা কারচুপি? তুষ্টুরাম তারই ম্যাজিকযষ্টির ইঙ্গিতে আমাকে এখানে ওতপ্রোত সংলগ্ন করতে পারল? আমার পরিচিত নিজ মাংসময় অস্থিময় বিস্তার খণ্ড খণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় মিশে গেল।

আমার মতন কাঁদিও...রাধা হয়ো তুমি প্রিয়, হে প্রিয়..

রোদে এসে ছায়াকে সরিয়ে দিলে ঘর্মাক্ত শরীরে এক সময় আমি উঠে দাঁড়ালাম। দুর্গামোহন কিছু বলার আগে নয়নতারা বলল, 'আবার আসবেন। খুব ভালো লাগল।'

তুষ্টুরাম আমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে সে নমস্কার করল। 'আসুন তাহলে। ও বেলা শো দেখতেও আসবেন। ভুলবেন না।'

ত্রিলোচন ডাকছিল দেখতে পেয়ে। সেদিকে এগোতেই ফের তুষ্টুরাম পেছন থেকে বলল, 'একটা কথা নন্দবাবু, আপনাকে আমার খুব পসন্দ হয়েছে. তাই বলছি। দয়া করে অন্য কান করবেন না যেন।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বলো।'

ময়দানটার দিকে দ্রুত একবার চেয়ে চাপা গলায় সে বলল, 'এখানে আসবার সময় পকেটে যেন টাকা পয়সা কিছু আনবেন না।'

'কেন?'

সে চোখ টিপল। 'বলছি, মালিকবাবু আপনাকে খাতির করল কেন, তা তো জানেন না! পরে জানতে পারবেন। তবে নয়নতারা...সে অবশ্যি মেয়েমানুষ। মনটাও সাদা ছিল। এখন দুগ্‌গামোহনের হাতের গুটি হয়ে গেছে।'

সারা দুপুর আমি অস্থির হয়ে থাকলাম সেদিন। প্রতিটি মুহূর্ত বিকেলের দিকে আর অগ্রসর হতে পারছিল না যেন। এত শ্লথগতি সময় কোনোদিন অনুভব করি নি।

এবং তুষ্টুরামের প্রতি অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হচ্ছিল। লোকটা কোনো কারণে দলের প্রতি অসন্তুষ্ট। তাই কি বিশ্বাসঘাতক? আস্তে আস্তে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষ কেমন করে দানা বাঁধল আমার মধ্যে। সে শূন্য পকেটে যেতে বলছিল। আমি টাকা পয়সার কথা ভাবছিলাম। প্রয়োজন কী, জানতাম না তবু মনে হচ্ছিল এই

দিয়েই হয়তো বা সে রহস্যে প্রবেশ করতে পারি। কিংবা ভাবছিলাম শূন্য পকেটে সেখানে যাওয়া আমার মর্যাদার পক্ষে ঠিক নয়। কিংবা এমনও হতে পারে দুর্গামোহন আমাকে আর গ্রাহ্য করবে না।

একটা গভীর নেশা বিস্তৃত হয়েছিল যেন। বিকেলে ত্রিলোচনকে বললাম, 'দশটা টাকা হবে ত্রিলোচন? খুব দরকার।'

কোনোদিন নিই নি বলেই ত্রিলোচন নিঃসংকোচে টাকা দিয়েছিল আমাকে। এবং গর্বিত পদক্ষেপে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। দরজার ওপরে মাচায় জয়ঢাক ও ভেঁপু বাজছিল! তুষ্টুরাম অঙ্গভঙ্গী করে ক্লাউন সেজে চিৎকার করছিল। ...আসুন, দেখে যান। আমিনা সাপিনী, ওসমান খাঁ বাঘ, সজারু...আর সব সে...দুনিয়ার সব সে বঢ়িয়া স্টার আউরত আপনার আঁখো কে তারা...

তাঁবু প্রদক্ষিণ করে যেতে-যেতে একটু থমকে দাঁড়ালাম। একটা ছোকরা পাশের দরজায় টাঙাচ্ছিল। ওপরে লেখা : 'মহিলাগণ' সে পেছন ফিরে ভেতরে কাকে বলল, 'শালা হামবাগ কাঁহেকা। স্টার আউরত! নিজের বৌকে ভাঙিয়ে পেট চালাচ্ছে। লজ্জা করে না শয়তানটার।'

আমার সর্বাঙ্গ দারুণ চমক খেল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। ওরা কি নয়নতারার কথা বলল? নয়নতারা তুষ্টুরাম ক্লাউনের বৌ?

নয়নতারা তার তাঁবুতে বসে সাজছিল। মুখে সফেদা-মিনার পেন্ট। কাজলের ভ্রু। কপালে লাল টিপ। দুহাত তুলে খোঁপায় ফুল গুঁজছিল সে। এবং ঠিক তখনই প্রথম—একেবারে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম তার সিঁথিতে দীর্ঘ উজ্জ্বল রক্তলাল সিঁদুর।

আমাকে দেখে মুখ তুলে সে হাসল। এ হাসি আগেকার সে পাথরের প্রতিমা-মূর্তির নয়। জীবন্ত মানুষের। যুবতী মেয়েমানুষের। এ-হাসি ভীষণভাবে প্রাণবন্ত। নিদারুণ অগ্নিময়। পুরুষ দ্রষ্টার সমুদয় কোষগুলি সে বারুদের মতো বিস্ফোরিত করে।

ত্রিলোচনের টাকাটা আলতো হাতে একবার অনুভব করে নিয়েছিলাম তক্ষুনি।

২

স্টেজটা বেশ চওড়া। একপাশে উইংসগুলির সংলগ্ন বাঘ, সজারু ও সাপের খাঁচা। অন্যপাশে যন্ত্রী ও নাচিয়ে-গাইয়ের আগম-নির্গম ঘটে। স্টেজের নীচেও একপাশে কিছু খোলা জায়গা। সেখানে জ্বলন্ত লোহার রিঙ গলিয়ে তীরের মতো বেরিয়ে যাওয়ার একটা খেলা রয়েছে। উপরে ত্রিশুল ছুঁড়ে চট করে শুয়ে পড়ার পর দেখা যায় তিনটে ফলা পেটের দুপাশে ও দুই জানুর মধ্যিখানে পাটাতনে বিঁধেছে—এমন একটি খেলাও রয়েছে।

এই মারাত্মক খেলাটি তুষ্টুরামই দেখায়। একেবারে শেষদিকে। স্টেজে নানা হাস্যরসাত্মক গান গেয়ে, দর্শকদের ভীড়ে কখনও নেমে এসে ক্লাউনগিরি ফলিয়ে, ফাঁক পেলেই সে হাসতে চেষ্টা করে। নয়নতারার গানে তবলাসঙ্গত করাব সময়ও এটা সে ছাড়ে না। নয়নতারা নাচতে থাকলে তখনও, চরম কোনো জমাটির মুহূর্তে, সমে কি ফাঁকে, অত্যন্ত হঠাৎ সে একটি তুখোড় কথা বলে বসে। কোনো খিস্তি, কোনো রসালো

মন্তব্য, যা তার লাগসই। তারপর শেষবেলায় ওই ভীষণ খেলা। তখন সে হাসে না। হাসায় না। যন্ত্রী বলতে দুর্গামোহন আর তুষ্টুরাম। কেবল নাচের সময় ব্যান্ডপার্টির লোকগুলি বাইরে মাচা থেকে নেমে এসে স্টেজের সুমুখে নীচের জায়গাটুকুতে বসে পড়ে। বিকটভাবে বাজিয়ে জমাটি আনার চেষ্টা করে।

কখনও স্টেজের পেছনে, কখনও সামনে দর্শকদের ভীড় থেকে ক্রমাগত ঘুরে ফিরে দুর্গামোহনের 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো'র সবকিছু দেখার চেষ্টা করছিলাম। দুর্গামোহন ম্যাজিকও দেখাচ্ছিল। স্টেজের পিছনের পর্দাটা ছিল কালো কাপড়ের। তারও পেছনে একটা ঘর বানানো হয়েছিল। সেই তক্তপোশটা সে-ঘরে পাতা ছিল। ওপরে একখানা বাঘের ছবি আঁকা কমদামী পুরু কার্পেট। একবার উঁকি মেরে দেখে নিয়েছিলাম।

'ওখানে কী হয়?' তুষ্টুরাম তার শেষ খেলা দেখিয়ে এলে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম।

তুষ্টুরাম জামা পরছিল তখন। তার শরীর ঘামে জবজবে। সে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল। আমার প্রশ্ন শুনে একটু মাথা নেড়েছিল শুধু।

ফের আমি নয়নতারার তাঁবুতে গিয়ে তাকেও প্রশ্ন করেছিলাম।

নয়নতারা বালতির জলে পেন্ট ধুয়ে ফেলছিল। হ্যাসাগের আলোয় আর মুখে সাবানের ফেনাগুলি চর্বির মতো জমতে দেখছিলাম। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বন্ধ চোখদুটি ঈষৎ মেলবার চেষ্টা করেছিল। তারপর বলেছিল, 'শেষ খেলা।' স্পষ্ট বুঝতে পারি নি।

তারপর একসময় সে তোয়ালেতে মুখ মুছল। আমি একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছি দেখে বলল, 'বসুন! দাঁড়িয়ে কেন?'

তাঁবুর ভেতর একটা কাঠের বাক্সে আমি বসলাম।

নয়নতারা বলল, 'বাড়ি গেলেন না যে?'

তার এ-প্রশ্ন আমাকে আঘাত করল। কান অব্দি লাল হয়ে উঠেছে আমার। বললাম, 'যাবো। রাত হয়ে গেছে। দুর্গাবাবুর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'ও মা! তাই নাকি?' নয়নতারা একটু হাসল। 'কেন?'

'দরকার আছে।' গম্ভীর ভাবে বললাম।

ডিব্বু এককোণে ঘুমোচ্ছে। ফাল্গুনের গভীর রাতে মাঠের হাওয়ায় কিছু শৈত্য। আমারও শীতবোধ হচ্ছিল। নয়নতারা একটা শাড়ি দুভাঁজ করে তার গায়ে চাপিয়ে দিল। আড়মোড়া খেল দুহাত তুলে। তারপর ছোট করে হাই তুলল মুখে হাত ঢেকে। বলল, 'জায়গাটা বড় নোংরা। ভূতপ্রেত আছে নাকি!'

আমি জবাব দিলাম না।

'লোকগুলো কি মারা গেল! কেউ এদিকে আসে না যে।' নয়নতারা ফের বলল।

বড় তাঁবুর ভেতর স্টেজ থেকে দুর্গামোহনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। আমি উঠে সেদিকে যাচ্ছিলাম। নয়নতারা পেছন থেকে ডাকল, 'নন্দবাবু, চলে যাচ্ছেন নাকি?'

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হ্যা, যাই।'

নয়নতারা বেরিয়ে এলো। 'বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন না?'

মাথা নাড়লাম।

সে হেসে উঠল। 'আজ বোধহয় জমবে না। একা-দোকা খেলা জমে না তত। মিছিমিছি রাত জেগে কী হবে? কাল আসবেন।'

'কাল কী হবে?'

'নতুন জায়গা। খবর ঠিক মতো পৌঁছায় নি। টনক নড়লে ঠিক হাজির হবে সব।' দুর্বোধ্য ভঙ্গীতে সে কথা বলছিল। তুষ্টুরামকে দেখা গেল পর্দা তুলে এদিকে আসতে। তার হাতে একটা হ্যাসাগ। রুমালে আংটা ধরে খুবই সাবধানে সে অগ্রসর হচ্ছে। হ্যাসাগটা দপদপ করে জ্বলে উঠছে। অস্পষ্ট খিস্তি করছিল তুষ্টুরাম।

আমাকে দেখে বলল, 'এখনও যান নি দেখছি।'

'হ্যাঁ। তোমাদের শেষ খেলার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

তুষ্টুরাম বড়-বড় চোখে আমার মুখ দেখার চেষ্টা করল। তারপর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল।

পর্দা সরিয়ে স্টেজে ঢুকলাম। দুর্গামোহন পা ছড়িয়ে বসে ছিল। বলল, 'আরে নন্দবাবু যে! আসুন, সিগ্রেট খান।'

যখন বসলাম, এ-বসার মধ্যে কিছু হ্যাংলা ভিখারির ভঙ্গী ছিল। কিংবা ভোজপর্বের পরও আবও কিছু আশা নিয়ে উৎসবগৃহের আনাচে কানাচে ঘুরে-বেড়ানো। পলকে-পলকে এ জানা আমাকে বিব্রত করছিল। অথচ উঠে আসবার ইচ্ছে করছিল না। আমাকে বসতে বলে দুর্গামোহন তার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলছিল। সেই ফাঁকে হঠাৎ চলে আসতে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল। ভীষণ অস্বস্তিতে আমি ভুগছিলাম। মনে হচ্ছিল এভাবে স্থানত্যাগ—আমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আগেই—বড় অসম্মানজনক। দারুণ ইচ্ছে করে ওরা কিছু কথাবার্তা বলুক আমার সঙ্গে যাতে 'আচ্ছা, আসি' বলে যথোচিত মর্যাদায় কেটে পড়তে পারি।

এবং সব থেকে আশ্চর্য এই যে বাবার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

স্টেজের ওপর দুটি উজ্জ্বল হ্যাসাগ পাটাতনে দাঁড় করানো ছিল। দুর্গামোহনের চিবুক অব্দি সে-আলোর স্পষ্টতা। তার মুখমণ্ডল খানিক অস্পষ্ট। উইংসের মুখে টেরচা হয়ে আলো পড়তেই ওসমান খাঁকে দেখলাম। অমনি আমার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

বাঘটা প্রকাণ্ড জিভ বের কবে ঠিক সোজাসুজি আমাকে দেখছে। সামনের দুটি পায়ের ওপর মুখটা নামিয়ে রেখেছে। উজ্জ্বল আলোয় নীলাভ চোখ থেকে যেন প্রশ্নের চিহ্ন। আমার গা ছম ছম করল।

একটু হেলে আমিনাকে দেখলাম।

বিরাট ময়াল সাপিনীও খাঁচার প্রায়ান্ধকার কক্ষ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কি? সজারুর খাঁচার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপেব সাহস ছিল না। শেষরাতের নিঃশব্দ পরিবেশে খানিক আলো ও খানিক অন্ধকারে কিছু স্পষ্টতা কিছু অস্পষ্টতা। দু'জন নয়নতারা দু'দিকে। নটী ও ভার্যা।

ঠিক মধ্যবিন্দুতে বসে আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি। কোনোদিকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি নে।

'নন্দবাবু!' দুর্গামোহন ডাকল।

'বলুন।'

'কেমন দেখলেন পার্টি? চলবে তো এখানে?

'ভালো চলবে।'

'হ্যাঁ।' দুর্গামোহন তার ছড়িটা খুটখুট করে ঘা দিল পাটাতনে। আজকের নমুনা ভালোই বলা যায়। কিন্তু...

'কিন্তু কী?'

তার প্রকাণ্ড মাথাটা আমার মুখের দিকে নেমে এলো। 'আসল খেলাটা না জমলে চলে না ভাই।'

আমি হেসে ফেললাম। অর্থহীন হাসি।

দুর্গামোহন বলল, 'নয়নতারার নাচ দেখিয়ে আমাদের পেট ভরে না নন্দবাবু। পেছনে একটা লাক-রুমও তৈরি করে রাখি।'

'কী রুম বললেন?'

'লাক-রুম। ভাগ্যের ঘর।'

'দেখেছি।'

আমার হাত ধরল দুর্গামোহন। তেমনি ভয়াবহ নিঃশব্দ হাসতে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কোথাও এমন হয় নি। আমার লোকজন আগে থেকে সব খোঁজখবর নিয়ে রাখে। কিন্তু কী বেয়াড়া জায়গা মশাই, একজনও টিকি দেখাল না!'

বললাম, 'বেশ তো, আমার সঙ্গেই একহাত হয়ে যাক।'

আমার বুকপকেট থেকে হঠাৎ ক্ষিপ্র হাতে দশটাকার নোটটা তুলে নিল দুর্গামোহন। ফের রেখে দিল। বলল, নন্দবাবু, 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না। জাত যায় ওতে। তবু অব্যেস। এক রাত খালি গেলে হাত নিসপিস করে। আসুন...'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার সঙ্গে গিয়ে সেই ভাগ্যের ঘরে ঢুকে ছিলাম। কার্পেটের ওপর ছক পাতা ছিল। রাজমুকুট, ড্রাগন, চিড়িতন, এস্কাপন, হরতন আর রুইতনের ছ'টি ঘর। চামড়ার কৌটোয় ছ'টি হাড়ের গুটি। তারপর কে একজন এক বোতল মদ এনে রেখেছিল। দুর্গামোহন একমাত্র গিলে বলেছিল, 'ইচ্ছে করে তো দু-এক পাত্র নিতে পারেন। আপনি গুণী লোক। জোর করব না।' আমি অত্যন্ত হঠাৎ একটা দুষ্কর্মের জগতে প্রবেশ করার উল্লাস নিয়েও ছুঁতে সাহস পাই নি। বারবার আমার মধ্যে একটা বিষাক্ত লালসা নড়ে-চড়ে উঠছিল রাতের সেই শেষ যামে। তারপর ভীষণ শব্দ করে গুটিগুলি ছড়িয়ে পড়ছিল ছকের ওপর। হ্যাসাগের গায়ে।

একদিকে নীল সেলোফেন কাগজ মোড়া ছিল। অন্য দিকটা থেকে উজ্জ্বল আলো পড়ছিল ছকে। নীলাভ আলোয় ভাগ্য-ঘরের অবশিষ্ট পেছনের অংশ রহস্য ও অলৌকিকতার সৃষ্টি করছিল।

শেষ দানের সময় সেখানে একবার তুষ্টুরামকে দেখলাম যেন। এক সময় আমাদের খেলা শেষ হ'ল। আমার টাকাগুলি সম্পূর্ণ জিতে নিয়ে দুর্গামোহন বলল, 'চার আনার দানে খেলে সুখ নেই। খেলি না। ওসব বাইরের খেলা। জুয়াড়িরা গ্যাসবাতি জ্বেলে খেলে। তবু আপনার খাতির,—আমার হাতের সুড়সুড়ি।' সে একটু হাসল বলতে বলতে। 'কিন্তু নন্দবাবু, আপনি কি কিছু আনন্দ পেলেন?'

সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা করে বললাম, 'ভীষণ।'

আমার পিঠ চাপড়ে দিল সে। 'হারারও আনন্দ আছে, ভাই। সেবার বনোশ্বরের মেলায় শেষ টাকাটিও হেরেছিলাম। সে এক ওস্তাদ খেলোয়াড়। ক্ষেত্রমোহন দারোগা।

ওস্তাদ বলে পায়ে নমস্কার করেছিলাম। পরদিন কিন্তু সব ফিরে পেলাম। ওস্তাদেরও ওস্তাদ থাকে তো।' দুর্গামোহনের কণ্ঠস্বর ক্লান্ত কিংবা শিথিল মনে হচ্ছিল। সে ঈষৎ চাপাস্বরে কথা বলছিল। 'তাকে আমি পয়সা দিয়ে পুষছি। ওই জন্তুগুলোর মতো। তাকে এড়িয়ে যাওয়া বড় কঠিন। শুধু মধ্যে মধ্যে বড় খামখেয়ালি করে। দেখুন না, আজ কী করল...'

'কী?'

সেদিকে কান না দিয়ে দুর্গামোহন হঠাৎ হাঁসফাঁস করে গর্জাল, 'শয়তানীর চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারতে ইচ্ছে করে। নতুন জায়গা। প্রথম দিন দিলে আমার বারোটা বাজিয়ে!'

স্পষ্টত সে নয়নতারার কথা বলছিল। শিউরে উঠে বললাম, 'কেন! ও তো ভালোই নেচেছে-গেয়েছে। অনেকে প্রশংসা করছিল।'

'না।' দুর্গামোহন গম্ভীরভাবে ঘড়ঘড় করে বলল। 'সেরূপ আপনি দ্যাখেন নি মশাই। চকবাজারে কেউ দ্যাখে নি।'

'তাই নাকি?'

দুর্গামোহন ডাকল, 'তুষ্টু, তুষ্টুরাম!'

তুষ্টুরাম নীলাভ আলোয় এসে স্পষ্ট হ'ল। সেলাম করছিল সে অভ্যাসমতো।

'নয়নের কী হয়েছে রে আজ?'

'কিছু না তো!'

'তুষ্টু, ওকে এক্ষুনি বলে দে, আমার দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে।'

'বলছি স্যার।'

'বলে দে, কাল পার্টির নাম ডোবালে ওকেও আমি ডোবাবো।'

'আচ্ছা স্যার।'

'গিদধড় কা বাচ্ছা, ভাগ।' হঠাৎ পা তুলে ওর পেটে লাথি মারল দুর্গামোহন। তুষ্টুরাম ছুটে পর্দা তুলে পালাল।

এবার সে আমার দিকে তাকাল। 'নন্দবাবু, তুমি এসো তাহলে।'

অপমানিত ও বিস্মিত হয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলাম। কেন আমি এসব করছি—এই দ্বন্দ্ববোধ, উৎকণ্ঠা, লোভ ও আকর্ষণ? কী পেতে চাই আমি?

অনিচ্ছুকভাবে দুর্গামোহনের সঙ্গে এক অলৌকিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি। ঘরে আমার রুগ্ন বাবা। স্কুলের জীবন তাঁকে শেষ দিকে অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমার ভবিষ্যৎ থেকে প্রতীক্ষিত আলো ও উত্তাপ তিনি অনুক্ষণ অনুভব করছেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকে তিনি মৃত্যুর কথা ভুলে যাচ্ছেন। ...এইসব যুগপৎ আমার মধ্যে প্রবেশ করছিল। আমাকে ছন্নছাড়া করে তুলছিল, উদভ্রান্ত ভাবে পথ চলছিলাম।

চুপিচুপি ঘরে ঢুকেছিলাম। বাবা জেগে ছিলেন। বললেন, 'কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?'

'ত্রিলোচনের ওখানে।'

'গানের জলসা ছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

এই জবাবটুকু যথেষ্ট ছিল বাবার কাছে। সংগীতকে তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে মনে করতেন। কতদিন তাঁর পাশে বসে আমি গান শুনিয়েছি। তাঁর চোখ দিয়ে নিঃশব্দে ঝর

ঝর করে জল ঝরে পড়েছে। কলেজের পাঠ সমাপ্ত করার পর প্রায়ই বলতেন, 'চাকরির চেয়ে বরং অন্য পেশা ভালো। তাঁর ইঙ্গিত আমি বুঝতাম। কিন্তু জীবন-ধারণের পক্ষে সংগীতের পেশা কতখানি উপযোগী, একথা স্পষ্ট করার মতো নিদর্শন আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাঁর স্কুলের প্রতি তিনি বিরক্ত ছিলেন। ইচ্ছে করলে সেখানে আমার স্থান করে দিতে পারতেন, করেন নি। যেন ভাগ্যের প্রতি নির্ভর করে কাটাচ্ছিলেন তিনি।

এবং আমিও।

বাবা বললেন, 'খেয়ে এসেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ।'

আমার খিদে মরে গিয়েছিল। কেবল তৃষ্ণা পাচ্ছিল। গলা ও বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, বাবার বিশ্বাস ও নির্ভরতায় এতদিন পরে অত্যন্ত হঠাৎ একটা ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছি আমি।

কিন্তু কেন?

পরদিন রাতের স্টেজে নয়নতারাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

বাঘ ও সজারুটা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। আর দু'টি শেকল ধরে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে নয়নতারা। শরীরে নাচের মুদ্রা। সাপটা তার গলায় জড়িয়ে থেকে বুকে মাথা ঘষছে।

তারপর সে ঈষৎ হিল্লোলিত হ'ল। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে একবার করে ঝুঁকে ফের স্থিরভাবে দাঁড়াল। এ সময় কোনো বাজনা বাজছিল না। ডানপাশের উইংসে হারমোনিয়াম ও দুর্গামোহনকে দেখা যাচ্ছিল। তুষ্টুরাম অদৃশ্য।

এ বুঝি এক ভয়ংকর খেলা।

সমবেত দর্শক স্তব্ধ হয়ে দেখছে। এ নয়নতারাকে আমিও প্রথম দেখতে পাচ্ছি। তার চোখে, ঠোঁটে দুটি বাহুতে যে লীলাবিভ্রম, তা ঠিক অশ্লীল নয়। ওই বাঘ, সজারু ও সাপের জগতের এক আদিম, অস্পষ্ট ও অলৌকিক অবিচ্ছিন্নতার অংশ। পৃথক করা যায় না কোনোমতে। নয়নতারা দুর্গামোহনের যাদুদণ্ডে খুবই গভীর এক প্রাকৃতিক সত্তা হয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে নিজেরই অলক্ষ্যে কখন উঠে গেছি। গতকাল দুপুরে বাঁশিটা হারমোনিয়ামের রীড-কভারের নীচে রেখে গিয়েছিলাম। কখন দুর্গামোহনের পাশে বসে সেটা তুলে নিয়েছি। দুর্গামোহন মুখ ফিরিয়ে তাকাল। একটু হাসছিল সে। তারপর সুর দিল। ধীর ও শান্ত সুর। আমি নিশীথ রাত্রির আহ্বানের ব্যাকুলতা সঞ্চারিত করছিলাম বাঁশিতে। বাঁশি দ্রুত চড়াইয়ে ছুটে গিয়েছিল। ফের নেমে এলো। মধ্যবর্তী স্তরে বিচরণ করতে থাকল। তুষ্টুরাম তবলার ওপর ঘাড় গুঁজে মৃদু-মৃদু বোল তুলল। তারপর ঘুঙুরের ঝুম-ঝুম ধ্বনিপুঞ্জ। ব্যান্ডপার্টি দুর্গামোহনের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছিল। না পেয়ে থেমে আছে। ধুয়োয় ফিরে আসবার পরই বাঘটা হাঁ করে উঠল। সজারুর ডানার খটখট শব্দ শুনলাম।

চোখ বুঁজে বাজাচ্ছিলাম। শব্দগুলি পাশার গুটির মতো মনে হচ্ছিল।

এক সময় পর্দার শব্দ। স্ক্রিনের নীচের কোণে বাঁধা ইটের টুকরো আমার পায়ে সজোরে আঘাত করে স্টেজের মধ্যবিন্দুতে পৌঁছেছে।

দর্শকেরা হাততালি দিচ্ছিল।

নয়নতারা বলল, 'আপনাকে চিনতে খানিক বাকি ছিল।'

বললাম, 'আমারও।'

সে রাতে ভাগ্য-ঘরের পর্দা তুলে পিছিয়ে এসেছিলাম। চকবাজারের সেইসব ভদ্রজন, যাঁদের গুরুজনের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম, তাঁদের দেখছিলাম পাশার ছক ঘিরে বসে থাকতে। তাঁদের এক প্রান্তে আমাদের খঞ্জনীবাদক রামহরি মেকদারকেও দেখলাম। তারপর দেখলাম ত্রিলোচনকে। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

পেছনে নীলাভ আলোয় একটা টুলে বসেছিল নয়নতারা। গ্লাসে মদ ঢেলে সে এগিয়ে এলো আলোর দিকে। পাত্রটা একজনের সম্মুখে এগিয়ে দিল। তারপর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল।

বেরিয়ে সেই ছোট্ট তাঁবুর কাছে এসেছিলাম। ডিব্বু শুয়ে ছিল। তুষ্টুরাম হেঁট হয়ে বসে শুকনো ভাত গিলছিল। বারবার জল খাচ্ছিল ঢকঢক করে।

আমাকে দেখে একটু হাসল। 'বসুন নন্দবাবু।'

চুপচাপ বসে তার খাওয়া দেখছিলাম। সামনের দিকে খুবই বেশি রকম ঝুঁকে গেছে তার শরীর। বাম হাতে বারবার গোঁফটা মুছে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। উদোম পিঠের পাশে তেরচা হয়ে আলো পড়ায় পাঁজরের হাড় ও রঙের উজ্জ্বলতা স্পষ্ট। একটা সম্ভ্রান্ত কিছু ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে পড়েছে—এ কথাই মনে হচ্ছিল তাকে দেখে। তার মস্ত ছায়া ঘুমন্ত ছেলেটিকে ঢেকে ফেলেছে। কোণে একটুকরো দড়িতে ঝুলন্ত নয়নতারার শাড়ির কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বাকিটা একই অন্ধকারে। বাক্সের ওপর আয়না ও প্রসাধনের কৌটাগুলি তখনও গোছানো হয় নি। ত্রিপলের মেঝেয় আলতা বা মিনার গুঁড়ো। কিছু পাউডার ইতস্তত ছড়ানো। কালো চিরুনিটাও দেখতে পেলাম এক কোণে। এবং এইসব জিনিসগুলি অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করছিল আমাকে। ভাবছিলাম আমার সঙ্গে এগুলির কি কোনো পরোক্ষ সংযোগ থাকতে পারে কোথাও? এদের স্পষ্টতা আমাকে আমারই গুহাহিত কোনো স্মৃতির দিকে আলো ফেলতে নির্দেশ করে। মনে হয়, রক্তের খুব ভিতরে এরূপ একটি ধূসর তাঁবুর জগতে ঘুমন্ত কোনো গায়িকার মুখ দুহাতে তুলে ধরার সংগুপ্ত প্রয়াস চলছিল এতদিন ধরে—এই তুচ্ছ বস্তু ও চিহ্নগুলি তার উপাদানের প্রতীকচিহ্ন ছাড়া কিছু নয়।

খুবই আকস্মিকভাবে ত্রিলোচনের ঘরের নারীমূর্তিদের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সুর ও সংগীতের অবাস্তবতা কতবার মরে গেছে এদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতে। সুর ও সংগীত সব ব্যতিরেকে ওতপ্রোত হয়ে উঠেছে, খণ্ড-খণ্ড বাস্তব নারীমূর্তির সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। গান এমনি করে সহজ হয়ে উঠেছিল আমার কাছে—নিশ্বাসের বায়ুর মতো। অনুভব করেছি, আমি সেই অন্ধ ভিখিরি যে শূন্য পাত্র নিয়ত মেলে ধরে পথের প্রান্তে উপবিষ্ট—অকম্প্র হাতে ধরে আছে তাকে পূর্ণ করার জন্যে, যে কণ্ঠ দ্বারা আত্মপরিচয় ঘোষণা করে না...।

সহজ বাস্তবেব পরিচ্ছন্নতায় অযৌক্তিকভাবে নয়নতারা প্রবেশ করেছে; তারপর দেখি সুর ও সংগীত আর সহজ হয়ে ওঠে না। বাস্তবতায় চিহ্নও তাতে লিপ্ত নেই। একটা অলৌকিকভাব উত্থিত হচ্ছে।

তুষ্টুরাম পরিপাটি করে আহার সমাপ্ত করল। হাত-মুখ ধুয়ে। কুলকুচো করল। এবং এতে তার জীবনের কোনো কোনো দিক সম্পর্কে দারুণ নিষ্ঠার পরিচয় মেলে।

সে মুখোমুখি একটু দূরে মাটিতে উবু হয়ে বসল। সিগ্রেট জ্বেলে দাঁত খুঁটল কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে। তারপর বলল, 'কাল আপনার কাণ্ড দেখেছি।'

'তাই নাকি।'

'একদিন ঠিক এমনি করেই আমি এ পার্টিতে এসেছিলাম।' তুষ্টুরাম ফের দাঁত খুঁটতে থাকল। তার এ মূর্তি ঠিক গাম্ভীর্যের নয়। ক্লাউন তুষ্টুরাম তো হতেই পারে না এই বসে থাকা লোকটি। তার ভাষা ও শব্দাবলী কিছু মার্জিত। তাতে সে অভ্যাসমতো হিন্দি বুলি ও ঢঙ একটুও মেশাচ্ছে না।

শুকনো হেসে বললাম, 'এমনি জুয়ো খেলতে। তাই না তুষ্টুরাম?'

তুষ্টুরাম বলল, 'হ্যাঁ।' তার মুখের আধখানা অন্ধকারের দিকে। আধখানা মুখে তৃপ্তি। বাকিটুকু বুঝি দুঃখ—যা সে ঢেকে রাখতে চায়। 'বনোশ্বরের মেলায় একটা সার্কাসদলে আমি ছিলাম। সেটা জুয়াড়ীর দল নয়। কিন্তু জুয়া খেলতে আমার ইচ্ছা করছিল। দুর্গাবাবু সেখানে শো দিচ্ছিল। শেষ রাতে এমনি ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিলাম তাঁবুর পাশে...'

গা জ্বলে গেল আমার। 'আমাকে কী মনে করো তুমি?' উঠে দাঁড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে।

মুখ তুলে আমার আপাদমস্তক দেখল তুষ্টুরাম। তারপর বলল, 'আপনাকে অপমান করবার জন্য ও কথা বলি নি। মাফ করবেন স্যার।'

'আমি জুয়ো খেলবার জন্য আসি নি।'

'জানি।'

'আমি নাচ-গান ভালোবাসি।'

'জানি।'

'তবে ও-কথা বললে কেন?'

ইশারায় আমাকে বসতে বলল তুষ্টুরাম। 'এ লাইন বড় কষ্টের নন্দবাবু। ওই বনের জানোয়ারও কেঁদে ফ্যালে।'

'তাতে আমার কী?'

তুষ্টুরাম একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আপনার রক্তে নেশা রয়েছে কিনা, তাই ভয় হয়। আপনি শিক্ষিত মানুষ। সাদা কাপড়ে কালি খুব ঘন হয়ে লাগে।'

'যাও, যাও! মুখভঙ্গী করে বললাম, 'ওই তো দেখলাম চকবাজারের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের। পাশার ছকে বসে মদ গিলছে।'

'আমিও অনেক দেখেছি স্যার, বয়স তো কম হয় নি।'

তুষ্টুরাম উত্তেজিত হচ্ছে না বিন্দুমাত্র। তার ফলে আমি ক্রমশ বিরক্ত বোধ করছিলাম। ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। অথচ চলে গেলে মনে হয় কত কী ফেলে রেখে যাচ্ছি। কত আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ হতে যেন বাকি।

'তুষ্টুরাম, তুমি কি এখানে আসতে নিষেধ করছো আমাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনি গুণী লোক। এখানে সম্মান থাকবে না। কেউ দেবে না সে সম্মান।'

'আমি কি খেলাও দেখবো না তোমাদের?'

এ কণ্ঠস্বরে একটা অলক্ষিত দীর্ণ অসহায় চিৎকার ছিল।

তুষ্টুরাম আমার হাত ধরে টানল। 'আপনি খুব অবুঝ নন্দবাবু। দুগ্‌গামোহন জাদুর টানে সারা চকবাজারকে লাক রুমে হাজির করবে দেখবেন। তারপর রাতারাতি খুটিখাম্বা তুলে উধাও হবে। তখন শুনবেন ওরা বুক চাপড়ে কাঁদছে। কেউ পোড়ামুখ লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আর ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে খাক হচ্ছে। এ বড় সর্বনেশে নেশা নন্দবাবু।'

'কেন তুষ্টুবাবু, কেন?'

'পাশার একদিকে যে বসে থাকে, তাকে কি দ্যাখেন নি আপনি?'

তুষ্টুরামের কণ্ঠে একটা কাতরতা ফুটে উঠল। তার চোখদুটি ঘোলাটে মনে হ'ল। আমি চুপ করে থাকলাম।

'আমার কপাল নন্দবাবু, আমি একটা বিদঘুটে কানামাছি খেলার বুড়ি হয়ে বসে আছি। আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মেয়েটা ঘুরছে—তার দু'চোখে কাপড় বেঁধে দিয়েছে দুগ্‌গামোহন।'

ঈষৎ ঝুঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, 'ডিব্বু কার ছেলে?'

ভাগ্যের ঘর থেকে উদ্দাম হাসি ও স্খলিত কণ্ঠে চিৎকার ভেসে এলো এতক্ষণে। খেলা বড় জমে উঠেছে বুঝি। নয়নতারার উচ্ছ্বসিত হাসিটি অনায়াসে ওই মিলিত কণ্ঠের হল্লা থেকে পৃথক করা যায়। তুষ্টুরাম দু'হাঁটুর ফাঁকে মাথা ঝুলিয়ে দিল। যেন শুনতে চাইছে না কিছু। একসময়ে সে ফের মুখ তুলল। 'রাতের পর রাত ওইসব শুনি। তবু অভ্যাস হ'ল না। বড় বিচ্ছিরি লাগে। নিদ টুটে যায় আমার।' ওই স্বগতোক্তির মতো অর্ধস্ফুট স্বরে একথা বলল সে।

'ডিব্বু কার ছেলে বললে না তো?'

তুষ্টুরামও এতক্ষণে তার ক্লাউনের হাসি হেসে উঠল। সেই প্রাণখোলা প্রচণ্ড হাসি। তারপর বলল, 'আপনি বয়সে কাঁচা, স্যার। বুঝলেন? পাকতে দেরি আছে।'

'হেঁয়ালি রাখ তুষ্টুরাম।'

'আপনি যে সরকারি উকিলের মতো আইনের বুলি বলছেন নন্দবাবু! কী তাজ্জব!'

'বলবে না?'

'শুনে কী লাভ আপনার?'

'ইচ্ছে করে জানতে?'

'কেন?'

'ওর চেহারা ঠিক তোমার মতো না। নয়নতারার মতোও না।'

'তবে বুঝে লিন না।'

'ওর বাবা কোথায়?'

'জানি না।'

'নয়নতারা তো তোমার বউ?'

'তাও জানি না।'

'থাক। বলতে হবে না।' ছেলেমানুষী অভিমান নিয়ে আমি চলে এলাম। তাঁবু পেরিয়ে সড়কে উঠতেই শুনি, সে আমার পেছন পেছন আসছে। ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, কী হ'ল আবার?'

তুষ্টুরাম আমার হাত ধরে সড়কে হাঁটতে থাকল। তার হাতের স্পর্শে একধরনের আন্তরিকতা ছিল। ছাড়িয়ে নিতে পারলাম না।

সে বলছিল, নন্দবাবু, 'প্রথম থেকেই আপনাকে আমার ভালো লেগে গেছে। মনের কথা বলার ইচ্ছে করে। কিন্তু...'

'কিন্তু কী তুষ্টুরাম?'

'কিছু না চলুন, খানিক হাওয়া খেয়ে লিই গায়ে। এখন বেশ আরাম লাগে হাঁটতে।'

হাঁটতে হাঁটতে নদীর পোল অব্দি গিয়েছিলাম আমরা। মধ্যবসন্তের ঠিক মধ্যরাত। তুষ্টুরাম তার জীবনের কিছু কিছু কাহিনি বলছিল। তার শৈশবের অনাথ পরিচয়হীন দিনগুলির কথা গভীর মমতায় বিশ্লেষণ করছিল। তারপর সে একটা ম্যাজিকের দলে আশ্রয় পায়। সেখান থেকে সার্কাসে। সায়েব কোম্পানির সার্কাস। বুনো জন্তু নিয়ে খেলা দেখানোর বিদ্যায় সেখানেই তার হাতেখড়ি। কোম্পানি ভেঙে গেলে একটা দেশি সার্কাসে ফের সে ঢোকে। খুবই নাম বাড়ছিল। কিন্তু বনোশ্বর মেলায় এসে তার দিকভুল ঘটে যায়।

দুর্গামোহনও তার মতো একজন লোক খুঁজছিল। নয়নতারার নাচ-গানের সঙ্গে একটা ভয়ংকর কিছু জুড়ে দেবার মতলব তুষ্টুরামই দেয় তাকে।

সেই শুরু হ'ল সাধনা। যে সাপিনীর খাঁচার কাছে যেতে নয়নতারা ভয় পেত, একদিন তাকে গলায় জড়িয়ে নাচতে পারল। বুড়ো বাঘটা আর হাঁকরায় না তাকে দেখে। হিংস্র সজারুটাও বশ মেনে গেছে।

ডিব্বু তখন দুধের ছেলে। দোলনায় শুইয়ে রেখে নয়নতারা ওইসব নিয়ে মেতে থাকত। ডিব্বু কাঁদতো ট্যাঁ-ট্যাঁ করে। আর আশ্চর্য, দুর্গামোহন তাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে যেত দূরের দিকে। ঘুম পাড়াতো। গান শোনাতো মেয়েলি সুরে।

তুষ্টুরাম অবাক হয়ে লক্ষ্য করত এ সব। প্রশ্ন করেও জবাব পেত না নয়নতারার কাছে।

একদিন ডিব্বুকে কোলে নিয়ে বাঘের খাঁচার কাছে গিয়েছিল দুর্গামোহন। সেদিন বাঘটা ক্ষুধার্ত ছিল। খাবার দিতে একটু দেরি হয়েছিল তার। ডিব্বুর উদ্দেশ্যে ক্ষিপ্তভাবে সে থাবা বাড়িয়ে দেয়। দুর্গামোহন ডিব্বুকে সরিয়ে না নিলে ঠিকই মেরে ফেলতো। কেবল জামার টুকরো নিয়ে গালে পুরেছিল বাঘটা।

শিউরে উঠেছিল নয়নতারা। পরের রাতে বাঘের সঙ্গে নাচটা বাদ দিতে হয়েছিল। ফলে দর্শকেরা ক্ষেপে যায়। দারুণ মারামারি বেঁধে যায় দলের সঙ্গে। তাঁবুতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারা। দুর্গামোহনকে ঘিরে ফেলেছিল উত্তেজিত জনতা। হঠাৎ লোহার রড হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুষ্টুরাম। ক্লাউন তুষ্টুরামের এই দিকটা কেউ জানতো না। দুর্গামোহনকে খুবই বাঁচিয়ে দেয় সে। নইলে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো ক্ষিপ্ত জনতা।

আর নয়নতারারও কিছু ভক্ত সবখানেই জমে যায়। সেখানেও ছিল। তারাই তাঁবুর আগুন নিভিয়ে ফ্যালে। এক সময় দুর্গামোহন নয়নতারাকে নির্জনে ডেকে বলছিল, 'এর

কৈফিয়ৎ চাই, নয়ন। তুই আমার ইজ্জত খুইয়ে দিয়েছিস। তোকে আমি খুন করব। আর তার আগে ওই বাচ্চাটাকে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলবো।'

নয়নতারা জবাব দিতে পারে নি। সে বিভ্রান্তভাবে বসে ছিল চুপচাপ।

সত্যি সত্যি ছুরি বের করেছিল দুর্গামোহন। 'সেই এতটুকু থেকে তোকে মানুষ করেছি। নাচগান শিখিয়েছি। তুই এমনি বার বার আমার ইজ্জত খোয়াবি কেন?'

তুষ্টুরাম বিস্মিত হয়েছিল। বাঘের আক্রমণ ব্যাপারটা তাহলে আজ নেহাতই উপলক্ষ্য, নয়নতারা এমনি কাণ্ড আরও অনেকবার করেছে!

'সেবারে রতনের সঙ্গে রাতারাতি উধাও হয়েছিলি। স্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনলাম। তোর ইচ্ছামতো বিয়েও দিলাম ওর সঙ্গে।...'

দুর্গামোহনের ছড়িটা আলোয় সঞ্চারিত হচ্ছিল। তুষ্টুরাম জানতে পেরেছিল নয়নতারার আগের স্বামী রতন—এ দলেরই একজন খেলোয়াড়। তার ছেলে ওই ডিব্বু। ডিব্বুর জন্মের আগেই রতন মারা যায়। সে মৃত্যুর কারণ তখনও জানত না তুষ্টুরাম। দুর্গামোহন ছুরি নিয়ে আর একটু অগ্রসর হতেই সে মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। 'মালিক, আমাদের বাপ মা বলতে আপনিই। অবলা মেয়েমানুষ। পদে পদে দোষ করবে। নিজগুণে মাফ করুন স্যার।'

'সরে যাও তুষ্টুরাম—খুনখারাপি আমার অনেক ধাতসওয়া। পুলিশে আমার একগাছা লোমও ছিঁড়তে পারবে না। ও মাগীর রক্ত না দেখে আমার খিদে-তেষ্টা বারণ।...

প্রচুর মদ গিলেছিল দুর্গামোহন। সে টলছিল। অশ্লীল খিস্তি করছিল নয়নতারার মায়ের নাম ধরে। মনোমোহিনী বাঈজীর নামে। সে মরে গেলে তার মেয়েকে সে কোলে তুলে নেয়। মেয়ের মতো লালন-পালন করে। তার প্রতিদান এমনিভাবে নয়নতারা দিয়ে যাচ্ছে।

নয়নতারার পাথরের মুখে কোনো বিকার ছিল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়েছিল সে।

হঠাৎ তুষ্টুরামের হাত ধরে। 'তুষ্টু, হারামজাদীর ব্যাপারটা আমি বোধহয় ধরে ফেলেছি রে।'

তুষ্টু অবাক হয় নি প্রথমে। মাতাল হলে দুর্গামোহন অনেক অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে থাকে।

'দ্যাখ তুষ্টু, ও আমার কথা আর মানবে না। ও ভালো জেনে নিয়েছে আমার মুরোদ কতখানি।

তুষ্টু হেসে ওঠে। 'হুজুর মালিক, আপনার বুক যত চওড়া দিলও ততখানি।'

'এমন একজন দরকার, যে ওকে উঠতে বসতে শাসন করবে।'

'তা কে পারে হুজুর?'

'পারে, পারে।' দুর্গামোহন হা হা করে হেসে উঠেছিল। মাতাল মানুষের মন। তাতে ওই দারুণ অপমান। টাকাপয়সা দিলেও লোকশান বড় কম নয়। সে বলেছিল, 'আমার মতোই ছুঁড়ির মনটা কিছু নরম নরম আছে রে বাবা তুষ্টু! দ্যাখ না, কেমন বোবার মতো তাকাচ্ছে।'

'তা ঠিক স্যার।'

'ওকে একটা ভালোবাসার পুরুষ দিতে হবে।'

'বাবু!' চিৎকার করে উঠেছিল তুষ্টুরাম। 'ও আপনার মেয়ের মতো। ওর ইজ্জতের দাম আছে।'

'দাম!' প্রচণ্ড অট্টহাসি হেসেছিল দুর্গামোহন। সে হাসি অবশ্যই ঘোর নিঃশব্দ। তার শরীর দুলছিল ঝড়-খাওয়া গাছের মতো। 'রোজ রাতে ওর ইজ্জতের দাম আমি জুয়োর ছক থেকে কুড়িয়ে পকেটে পুরি।'

তুষ্টুরাম রাতের পর রাত এইসব অশ্লীলতা দেখেছে। নাচ-গান দেহভঙ্গী, জুয়ার ছক, মদ্যপান, লালসার ক্লেদ পুঞ্জপুঞ্জ জমে উঠতে দেখেছে নয়নতারার জীবনে। তবু সে দুঃখ পাচ্ছিল। মেয়েমানুষের জীবন নিয়ে পাশাখেলার এই কুৎসিত পরিহাস সে মনে মনে কোনো সময় সইতে পারছিল না। দুর্গামোহন এক সময় স্খলিত পায়ে শয্যায় গড়িয়ে পড়েছিল। তখন নয়নতারাকে প্রশ্ন করেছিল তুষ্টুরাম। 'তুমি কি বাঘটাকে ভয় করছো নয়ন?'

নয়নতারা জবাব দেয় নি।

'আমি যতদিন আছি, তোমার ছেলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ওসমান খাঁ। আমাকে বিশ্বাস করো।'

নয়নতারার চোখ থেকে এবার অশ্রুর ফোঁটা ঝরছিল নিঃশব্দে।

'দুগ্‌গাবাবু তোমার বাপের মতো। মুখে যতই বলুক, সে তোমাকে মেয়ে বলেই জানে। তুমি দুঃখ করো না নয়ন।'

হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে ওর হাত চেপে ধরেছিল নয়নতাবা। ফিসফিস করে বলেছিল, 'আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে তুষ্টুদা।'

'কেন নয়ন?'

'তুমি আমাকে ভয়ংকর খেলায় নিয়ে গেলে। সারারাত ঘুমোতে পারিনি আমি। গা ছমছম করে। তুমি আমাকে বাঁচাও তুষ্টুদা, তোমার পায়ে পড়ি। ও খেলা আমি খেলতে পারবো না!'

'অবুঝ হয়ো না। এ ছাড়া উপায় কি বলো তো?'

'তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চলো।' নয়নতারা ফিসফিস করে বলেছিল অশ্রুজড়িত কণ্ঠে। 'তুমি বাজাবে আমি নাচবো। ডিব্বুকে লেখাপড়া শেখাবো।...'

'নয়ন!' তুষ্টুরাম ক্লাউন পাথর হয়ে গিয়েছিল শুনতে শুনতে। তারপর সে অস্ফুটভাবে বলেছিল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?'

'পারবো।'

'সেবার একজনকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিলে। পারো নি। এবার কি পারবে?'

'তুমি কি পুরুষ নও?'

নয়নতারার পাথরের চোখে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ঠিক এমনি করেই হয়তো সে রতনকে প্ররোচিত করে থাকবে। তুষ্টুরামের মনে হচ্ছিল এ কথা। একটা সংশয়ে দ্বন্দ্বে সে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল।

বলেছিল, 'কিন্তু... আমাকে তুমি সইতে পারবে?'

'এতদিন ধরে সইছি তো।'

তুষ্টুরাম জানে না, এ ভালোবাসা না বিপন্ন নারীর চিৎকার। নাকি মজ্জমান মানুষের তৃণখণ্ডের অবলম্বন। জীবনে বহু নারী সে দেখেছে। তাদের সঙ্গে কাটিয়েছে। বৈধ সম্বন্ধের সুযোগ কোনোদিনই অবশ্য ঘটে নি। ইচ্ছাও ছিল না। তার ভালো লেগেছে শুধু এই ভ্রাম্যমান জীবনযাত্রা, দেশ থেকে দেশে, জনতার সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে। জনতার মুখ না দেখলে তার অস্থিরতা ঘোচে না। জনতার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট চিহ্নটি খুঁজে পায় নিজ অস্তিত্বের। তার ইচ্ছে করে জনতার মুখ, কোলাহল, উত্তেজনা, হাসি, নৈঃশব্দ উৎকণ্ঠা চুমুকে চুমুকে পান করে নেয়। সে জনতারই পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আবার তাদের উত্তেজিত করতে চায়, নিঃশব্দ করতে চায়, হাসায়, উৎকণ্ঠায় অধীর করে... নানা রূপ দিতে ভালোবাসে। এই তার জীবনে পরম মূল্যবোধ। জনতা তাকে গ্রাহ্য না করলে সে অর্থহীন।

নারীর অস্তিত্ব, নারীর প্রেম তার কাছে নিতান্ত আহার নিদ্রা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতো জৈব প্রয়োজন।

নয়নতারার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়েছিল তুষ্টুরাম ক্লাউন। এক অপরিচিত ভাবে আপ্লুত হচ্ছিল সে। একটা আকস্মিক কিছু নতুন বস্তু উপহৃত হয়েছে তার সম্মুখে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। হাতের মুঠোয় অলৌকিক পেলে যেমন বিভ্রান্ত হতে পারে মানুষ, তুষ্টুরাম তেমনি বিভ্রান্ত। তারপর গভীর সংশয়ে ও উৎকণ্ঠায় ঈষৎ ঝুঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসতে পারবে নয়ন?' নয়নতারা তার দুহাতে মুখ ঢেকেছিল। হাত ভিজে যাচ্ছিল তুষ্টুরাম সওদারের। পাথরের প্রতিমা বলে যাকে জেনেছে এতদিন, ধরাছোঁয়ার বাইরে এক ইষ্টদেবীর মতো সুদূর ও সুন্দর, তার হৃদয় হাতে গলে গলে পড়ছে।

তুষ্টুরাম বলেছিল, 'বেশ তাই হবে। তোমাকে নিয়ে চলে যাবো এখান থেকে।'

এবং তখনই বাঘটা ভয়ংকর গর্জন করে উঠেছিল খাঁচার ভেতর। নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে তার প্রচণ্ড গর্জন সারা শূন্য তাঁবুকে তোলপাড় করেছিল। দুর্গামোহনও উঠে বসেছিল লাফিয়ে। তারপর বলেছিল, 'তুষ্টুরাম!'

'স্যার!'

'তোদের কথা সবই শুনেছি।' অভ্যাসমতো নিঃশব্দে হাসছিল দুর্গামোহন।

৩

তুষ্টুরামের কাহিনী আমার মনে একটা ভিন্ন রকম অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। নয়নতারার কথা ভাবতেই মনে হচ্ছিল ওসমান খাঁ বাঘের মতো তুষ্টুরাম অতি নিকটে থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে। যে পরিণতি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তার সুখকর অংশে তার হ্রস্ব শরীরের বিরাট হয়ে ওঠা ছায়াপাত ঘটছে।

একটি বয়সী মানুষের ক্লান্ত ক্ষুধার্ত যৌবন নয়নতারার জীবনকে গ্রাস করে আছে, ভাবতে গা ঘিনঘিন করে। অথচ সন্ধ্যার পর আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে নটী নয়নতারাকে দেখে সবই বড় হাস্যকর মনে হয়। হাস্যকর ওই তুষ্টুরামের সঙের মতো। ছুঁচলো টুপি, কিম্ভূত

কোর্তা, ডিগবাজি, ছারপোকা সংক্রান্ত একটা হাসির গান—তুষ্টুরামের নিজের বাস্তবতাগুলির খণ্ড খণ্ড প্রতীক ছাড়া কিছু নয়।

বাঁশি বাজাতে বাজাতে গভীর আবেগে আমি অনুভব করেছি, সুরের বিস্তারে দীর্ঘ বন্ধুর সঞ্চরনের পরে ওই অবাস্তব নটীমূর্তি আমারই আরোপিত। যেন নিজের দুর্গমতা থেকে নিক্ষিপ্ত করেছি মোহিনী নারীকে নির্ধারিত ভূমিকায়—লৌকিক মঞ্চে সে এক অলৌকিক সত্তা। বাঘ, সজারু ও সাপিনীর খণ্ড খণ্ড বাস্তবগুলি তার রূপেরই এক জটিল অংশ। পেছনের ঘরে দুর্গামোহনের পাশার গুটির শব্দ, মাতাল জুয়াড়িদের অট্টহাসি, মদের গ্লাসে হাত রেখে এগিয়ে আসা নয়নতারার কথা একেবারে ভুলে যেতে হয় তখন। সেখানে সে ঠিক আমার আরোপিত কোনো সত্তা নয়। তাকে দুর্গামোহন গ্রাস করেছে। সে ক্ষুধার্ত কাতর বাঘের কান্না—যা গর্জন বলে ভুল হয়।

তারপর রক্তমাংসের নয়নতারা তুষ্টুরামের রোমশ শরীরে শরীর মেলায় – তখন আমি দিবালোকের হাটতলায় পৌঁছে গেছি। এই স্পষ্টতা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে। ঈর্ষায় ঘৃণায় কাতর হয়ে গেছি।

তবু আমি বার বার গেছি। নয়নতারার মুখের একটি নির্দেশের অপেক্ষায় বাঁশি হাতে নিয়ে প্রস্তুত থেকেছি। সে ইঙ্গিত করেছে স্টেজ থেকে। দুর্গামোহন চাপা হেসে মাথা দুলিয়ে বলেছে, 'চালান নন্দবাবু।'

মুখে আপত্তি করেছি। 'থাক না। ব্যান্ডপার্টি তো রয়েছে।'

'না। যার সঙ্গে যার মানায়।'

তুষ্টুরাম কেবল চুপ করে থেকেছে।

তারপর ওইটেই রেওয়াজ হয়ে গেল ক্রমে। কদিন পরে শুনলাম দর্শকেরা চিৎকার করছে, 'বাঁশি, বাঁশি!' দুর্গামোহন আমার জানুতে চাপড় মেরে বলল, 'নন্দবাবু, এতদিনে আপনার পরীক্ষা পাশ হ'ল।'

'তার মানে?'

'মানুষ নিয়েই আমার কারবার ভাই। ওদের খিদে রয়েছে। ওরা খিদে নিয়ে এখানে এসে ঢোকে। কিন্তু কী খাবে জানে না। আমাদের জোগাতে হয় সেই খিদের খাবার। প্রথমে হয়তো যা দিই মনঃপূত হয় না। আস্তে আস্তে সয়ে যায়। তখন বিষ গেলালে চোখ বুঁজে গেলে।'

হাঁ করে ওর কথা শুনছিলাম। কথাগুলি বড় অস্পষ্ট ছিল। পরদিনই দুপুরে দুর্গামোহন আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বাবা শুধু একবার মুখ তুলে দেখলেন। কিছু বললেন না। ওদের দলে বাঁশি বাজাচ্ছি বা মেলামেশা করছি, এ খবর তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তিনি বলেছিলেন সে কথা। অথচ মুখ ফুটে তাঁর বিরক্তির কথা জানান নি। তিনি কী ভেবেছিলেন আমি জানি না।

ত্রিলোচনের দোকানে আর যেতাম না। ত্রিলোচনও দূর থেকে দেখলে আর অভ্যাসমতো ডাকতো না। দীর্ঘ সময়ে আড্ডাটা হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল আমাদের। আমার মনে হচ্ছিল, ত্রিলোচন এবার সেই নারীমূর্তির জগতে প্রবেশ করেছে। আমার হাসি পাচ্ছিল।

দুর্গামোহনের সঙ্গে যেতে যেতে দেখলাম ত্রিলোচন নয়নতারার তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে। আমাকে দেখে একটু আমতা হাসল সে। তারপর দ্রুত পাশ কাটাল। সে ঠিক ধরা পড়ার ভঙ্গীতে দীন ও চকিত ভাবে সরে যাচ্ছিল। এতে অবাক হই নি।

তাঁবুতে নয়নতারা একা শুয়েছিল। আমাদের দেখে উঠে বসল। দুর্গামোহন বললে, 'তুষ্টু কোথায় রে?'

নয়নতারা বলল, 'ডিব্বুকে নিয়ে খেলা শেখাচ্ছে ওদিকে।'

দুর্গামোহন থমকে দাঁড়াল। এত স্থির হয়ে গেছে তার শরীর যে কাঠের পুতুল মনে হয়। তারপর সে যেন হাঁসফাস করতে থাকল। উজ্জ্বল সূর্যালোকে তার মুখমণ্ডল দারুণ লাল হয়ে উঠেছে। ছড়িটা মুঠোয় কাঁপছে একটু করে।

নয়নতারা মুখ নিচু করে ছিল। তার কপালের কাটা দাগটা খুবই করুণ দেখাচ্ছিল। এক সময় দুর্গামোহনকে বড় তাঁবুর পর্দা তুলে এগিয়ে যেতে দেখলাম। আমি অনুসরণ করতেই নয়নতারা ডাকল, 'নন্দবাবু!'

'বলো।'

'এখন ওদিকে যাবেন না।'

'কেন?'

আবার মুখ নামাল সে। খুবই নির্বিকার মুখ। আস্তে আস্তে বলল, 'অনেক কিছু এখানে দেখবেন, যা সইতে কষ্ট হবে আপনার।'

'কী নয়নতারা, কী?' আমার হাতের মুঠি দঢ় হচ্ছিল।

'এখনই শুনতে পাবেন।'

পরক্ষণেই শুনতে পেলাম। স্টেজের কাঠের পাটাতনে একটা হুটোপুটির শব্দ। তারপর তুষ্টুরামের অস্পষ্ট আর্তনাদ। আনাচে-কানাচে পার্টির লোকজন ছুটে এসে উঁকি দিচ্ছিল।

ছুটে পর্দা তুলে স্টেজে ঢুকলাম। দেখলাম তুষ্টুরাম উবুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার কোমরে পা রেখে দুর্গামোহন ছড়িটা দিয়ে মুখে আঘাত করার চেষ্টা করছে। দুহাতে মুখ ঢাকছে তুষ্টুরাম। তার হাত রক্তাক্ত।

ডিব্বু জড়সড় হয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমাকে দেখে পা নামিয়ে সরে এলো দুর্গামোহন। বাঘের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেল। খাঁচার দরজায় একটা তালা ও চাবি ঝুলছিল। সে তালাটা এঁটে চাবি পকেটে রাখল। তারপর বলল, 'চলুন নন্দবাবু।'

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। একটা সাপ নিয়ে খেলা করছি, এরূপ ভয় ও ঘৃণা আমাকে জড়িয়ে ধরছিল। শিরীষ গাছের ছায়ায় একটা ত্রিপল পেতে বসল দুর্গামোহন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকল।

আমি চলে আসবার কথা ভাবছিলাম।

'নন্দবাবু।'

'বলুন।'

'দেখলেন কেমন করে আমি জানোয়ার শায়েস্তা করি!'

জবাব দিলাম না।

'আমি একশোবার বলেছি, ছোঁড়াটাকে ও সব শেখাবি না। তবু কথা শোনে না। বনের জানোয়ার, তাতে পেট পুরে খেতে পায় না। কখন কী বিপদ হয়ে যায়!'

আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম। বললাম, 'কিন্তু তুষ্টুরাম তো সার্কাসের লোক। জানোয়ারের খেলা ও ভালো জানে।'

'জানতে পারে।' দুর্গামোহন সিগ্রেট জ্বালল। ...'তা আপনাকে ও সব বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'জানোয়ারকে বিশ্বাস করতে নেই। আমি বিশ্বাস করি না। ও সব আমার কাছে একটা বোমার মতো।'

'তবে পুষেছেন কেন?'

'কেন?' কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকল দুর্গামোহন। তারপর বলল, 'আমি আজীবন জুয়াড়ি নন্দবাবু। তবে আমার জুয়ার সঙ্গে একটু বেশি কিছু ছিল। বাঈজি মেয়ে। এটা এ লাইনে রাখতে হয়। ডিব্বুর বাবার নাম ছিল মাস্টার রতন। নয়নতারাকে দেখে সে এদিকে ভিড়ে যায়। জন্তু-জানোয়ার আনা তারই কথায়। নয়নতারার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলাম। বেশ চলছিল সব। ও একটা মাস্টার খেলোয়াড় ছিল। অথচ জানোয়ারের মর্জি টের পেত না এই এক আশ্চর্য। একদিন ওসমান খাঁ তার মাথায় থাবা মারল। সে বড় বীভৎস দৃশ্য নন্দবাবু। অনেক খুন-খারাপি এ লাইনে আমি দেখেছি। কিন্তু যাকে আমি ভালোবাসি, তাকে এমনিভাবে মরতে দেখে আমার দেমাগ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি ওকে মেরে ফেলার কথা ভাবছিলাম। সে সময় জুটল ওই তুষ্টুটা...

একটু থেমে আবার বলতে থাকল দুর্গামোহন, নয়নতারা প্রথমে ভয় পেয়েছিল। তার স্বামীকে খুন করেছিল ওসমান খাঁ। কিন্তু মেয়ে মানুষের মন, অন্তত আমি তো টের পেলাম না মশাই, বয়স কবে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে এদিকে। ...ওই হতভাগা তুষ্টু তাকে খাঁচার দিকে এগিয়ে নিতে পারল। আশ্চর্য, বড় আশ্চর্য লাগে আমার। যেন মেয়েটা বাঘের ওপর এমনি করে শোধ তুলবার চেষ্টা করছিল.. কিংবা ওই লোকটাকে নতুন করে পছন্দ হয়েছিল তার। তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল...

দুর্গামোহন তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল এবার। হাসতে থাকল। ..'আমি অত বুঝি নে নন্দবাবু। পাশার গুটি কোন দিকে চিত হয়ে শোয় এইটে বেশ বুঝতে পারি। আমি আড়চোখে নয়নতারার তাঁবুটা দেখে নিলাম। ডিব্বু চুপচাপ শুয়ে আছে। পাশে নয়নতারা বসে-বসে পায়ের নখ কাটছে ব্লেড দিয়ে। তার চুলগুলি খোলামেলা ঝুলছে বুকের ওপর। মুখটা ঢেকে ফেলেছে।

'আজ আমি একটা কথা ভাবছিলাম নন্দবাবু। তাই আপনাকে ডেকে এলাম।'

দুর্গামোহনের কথা শুনে উৎসুকভাবে তাকালাম তার মুখের দিকে।

'একটা অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে আসছে। রতন আর তুষ্টুরাম একটা করে নতুন খেলা এনেছিল আমার পার্টিতে। এবার আপনি আনলেন।'

হেসে উঠলাম। 'কী আর খেলা! তুচ্ছ বাঁশি...'

'তুচ্ছ নয় ভাই। গুণীলোক ছাড়া কাকেও আমল দেয় না দুর্গামোহন। আপনাকে দেখে আমি ভেবেছি সেই নতুন খেলাটা বেশ জমে ওঠে। আপনার গান, বাঁশি, নয়নতারার নাচ...'

'কিন্তু জন্তু-জানোয়ার দেখে আমি যে ভয় পাই দুর্গাবাবু।' খুবই সম্মোহিত এবং জড়িতস্বরে এ-কথা বলে উঠেছিলাম। দুর্গামোহনের বিরাট থাবা আমার কাঁধে নামল। 'ডরো মাৎ ইয়ংম্যান। লেখাপড়া শিখেছেন। খুব ভালো কথা। মনুষ্যত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু ওটা তো লক্ষ্মণের গণ্ডি ভাই। না পেরোলে জীবন মোটেও জমে ওঠে না।'

'দুর্গাবাবু, আমাকে কি আপনার পার্টিতে আসতে বলছেন?'

'শুধু আমি বলি নি। নয়ন বলেছে, অন্যেরাও বলেছে...'

'তুষ্টুরাম?'

'সেও বলেছে।'

'মিথ্যা কথা।'

দুর্গামোহন দুলে-দুলে হাসতে থাকল। 'ওর বলা না-বলায় কী আসে যায়। কবে দেখবেন ওর পাছায় লাথি মেরে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।' তবে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন নয়নতারার সাথে?

'ব্যাটা আপনার মাথাটা খেয়ে ফেলেছে দেখছি। নন্দবাবু একদিন যদি দেখি আপনিও নয়নকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন, আমি অন্যমত করবো না। একটা পুরুষ ওর বড় দরকার। নইলে বাগ মানানো যায় না।'

তার স্পর্ধা ও কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে দারুণ বিচলিত করল। কী বলবো, খুঁজে পেলাম না। উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। দুর্গামোহন আমার হাত ধরে টানল। 'রাগ করবেন না। একটু তামাশা করছিলাম।'

'এ-তামাশার জন্যে বাড়ি থেকে ডেকে আনার কোনো মানে হয় না।'

দুর্গামোহন আমার হাত ধরে বড় তাঁবুতে প্রবেশ করল। যন্ত্রচালিতের মতো তার পাশে পাশে যাচ্ছিলাম। স্টেজে উঠে তুষ্টুরামকে আর দেখতে পেলাম না। আমাকে দেখে বাঘটা উঠে দাঁড়াল। একবার ঘুরে আবার দু'থাবার ওপর মুখ রেখে শুলো।

হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে দুর্গামোহন বলল, 'ডেকেছিলাম একটু সংগত করে রাখা দরকার। মেজাজটা একেবারে গড়বড় করে দিলে হারামিটা। আসলে ও নয়নকে খেপাবার তালে আছে। বুঝলেন। কী-সব আজেবাজে বুঝিয়েছে হয়তো। নয়ন অমনি রাজি হয়ে গেছে। ডিব্বুও খেলা শিখুক। ভবিষ্যতে ওই করে খেতে হবে তো.. বুঝুন মজাটা। ওসমান খাঁ আবার একটা থাবা চালাক ডিব্বুর ওপর, ব্যস।' হারমোনিয়ামের সুর তার বাকী কথাগুলি ঢেকে ফেলল।

তারপর দুর্গামোহন একখানা গান গেয়েছিল। বিস্মিত হয়েছিলাম। এক সময় ওস্তাদ গাইয়ে ছিল লোকটা। এ-পথে কেন এলো কে জানে। বললাম, নয়নতারার নাচও তো আপনার কাছে শেখা?'

বেলো টানতে-টানতে দুর্গামোহন বলল, 'কিছুটা ওর মা শিখিয়েছিল। কিছুটা আমি।'

'ওর বাবা কে?'

জোরে বাজিয়ে দিল হারমোনিয়াম। ঠোটের কোণে হাসি রেখে গুনগুন করে টোড়ি ভাঁজছিল দুর্গামোহন।

কোনো-কোনো মানুষের মুখ আমাদের খুবই চেনা এই পৃথিবীতে। পথে ঘরে নগরে মধ্যে যেখানে দেখি, চিনে ফেলি। এই তো, সেই তুমি! তোমার সবই জানা আমার কাছে।

ওই হাসি, ভ্রূভঙ্গী, মুখরেখাগুলি, ওই ইচ্ছা বাসনা চলাফেরা —সবকিছু আমার জানা হয়ে আছে। ভালোবাসতে ঘৃণা করতে কিংবা মায়া-মমতা প্রেম-প্রীতি-স্নেহ করুণায় জড়িয়ে দিতে আমি পারি তাকে। আমার কাছে এ অতি সহজ ও স্পষ্ট।

নাকি আমারই মনের জাদুঘরে থরে-থরে সাজানো একটি করে ওই সব মুখের আদল জীবনের ছাঁচ! জনারণ্যে দেখামাত্র মিলিয়ে নিই মাপে। বলে উঠি, ভালোবাসি অথবা ঘৃণা করি ওই মুখ।

দুর্গামোহনের মুখে নেই সেই আদল? নয়নতারার? এবং যেন তুষ্টুরামেরও।

যেন বা আমার মধ্যে প্রবিষ্ট ছিল নিভৃতে এক ওস্তাদ জুয়াড়ি রাজা, উর্বশী নটী ও রাজসভার ভাঁড়। কিংবা এমনও হতে পারে তাদের ইচ্ছা বাসনা, মুখভঙ্গী, কণ্ঠস্বর পৃথক-পৃথক খণ্ডে ছাঁচের আকারে সন্নিবিষ্ট ছিল আমার মন।

তারপর দিনের নির্জন স্টেজে সারাদুপুর আমাদের রিহার্সাল চলেছে। নয়নতারাকে মনে হয়েছে আমার হারিয়ে যাওয়া সেই গানের খাতাটা, প্রতি পাতায় শব্দহীন গানের রেখা, যার মলাটটা ক্রমে জীর্ণ হয়ে এসেছিল, পাতাগুলি কোণের দিকে দুমড়ে গিয়েছিল ভাঁজে-ভাঁজে। আমার কণ্ঠে উচ্চারিত হলেই সে সম্পূর্ণতা পায়—তখন একবারও মনে পড়ে না ওই জীর্ণতা, কীটের দংশনচিহ্ন, ভাঁজগুলির বিকৃতি। হয়তো কান্নার জলে ভিজে কিংবা অসতর্ক উলটে যাওয়ার ফলে কোথাও ঈষৎ ফাটল... কিছু অক্ষর ও বাক্য হয়ে গেছে অস্পষ্ট, তবু ক'বার গাইলেই ঠিক মনে পড়ে যায়। স্মৃতির দেশের আলোকপাতে সব পুনরুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গানের খাতা তখন তাপ বিকিরণ করে। অগ্নিময় অসহনীয়তা জেগে ওঠে। সে-জ্বালা বড় মধুর। সে-যন্ত্রণা স্বপ্নের জগতের। নাচতে-নাচতে নয়নতারা হঠাৎ ঝুঁকে এসেছে আমার দিকে। ঠোঁটের কোণ চুঁইয়ে কয়েক বিন্দু হাসির ফোঁটা ঝরিয়ে আবার দ্রুত উত্থিতা, দুলতে-দুলতে পিছিয়ে গেছে দূরে। এই লুকোচুরি খেলা কোনোদিন আমরা করেছিলাম কি? কোনো জন্মে, জন্মান্তরে? বাঁশি থেমেছে—কখনও গান গাইতে-গাইতে থেমে গেছে আমার কণ্ঠও। দুর্গামোহন কনুইয়ে গুঁতো মেরেছে, 'কী হ'ল নন্দবাবু?'

'উ?' নির্বোধের মতো মুখোমুখি চেয়ে থেকেছি।

'থামলেন কেন?'

'এমনি।'

'থামবেন না। জমাটি আসছে।' ফের ইঙ্গিত করে ঝুঁকে গেছে দুর্গামোহন। তার বিরাট শরীর, স্থূল জানু তালে-তালে দুলছে। ভুরু দুটি কুঁচকে গেছে। চোখ বুজে এসেছে। তার গণ্ডদেশ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম। চওড়া কপাল চকচক করছে। পাঞ্জাবির সোনার বোতাম খুলে গেছে।

একজন পরিশ্রমী মানুষকে দেখছিলাম। যে প্রাণপণে একটা পাথরের বন্ধুর চড়াই পেরিয়ে যেতে চাইছে। কিংবা অন্ধকার বদ্ধ গুহার পাথর দরজাটা খোলার জন্যে হাঁফাচ্ছে। এই উত্তরণ কিংবা মুক্ত করার পরই যে পরিস্থিতি—তাকেই দুর্গামোহন বলত 'জমাটি'। সে বড় অনিশ্চিত—প্রচুর ঘর্মও তাকে আনতে পারে না। আবার অতি সহজেই নিজ ইচ্ছায় সে উদ্ভুত হয় যেন। তখন একটুখানি প্রয়াসেই তাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায়।

আর তুষ্টুরাম তাকে বলতো 'বাকবাদিনী।' সে এক বিদেহী অলৌকিক। মঞ্চের ওপর আসরের শীর্ষে অকস্মাৎ কখন এসে সঞ্চারিতা হয়। তুষ্টুরামও দুর্গামোহনের মতো টের পেয়ে যায় এটুকু। নয়নতারাও পায়।

তখন তুষ্টুরামের তবলার ধ্বনি-তরঙ্গ অন্য রূপ ধরে। অপরূপ দ্রুততায় গভীর নদীর স্রোতের মতো উদ্দাম। দুর্গামোহনের হারমোনিয়ামে অন্য সুর বাজে। রীড থেকে রীডে ক্ষিপ্রতায় তার স্থূল আঙুলগুলি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। পুরোনো যন্ত্রটা হঠাৎ নতুন হয়ে ওঠে তখন! তখন দুর্গামোহন তার বিরাট শরীরসহ উপবিষ্ট অবস্থায় মূর্তিমান নৃত্যকলা। আমার হাসি পেত। আমি লক্ষ্য করেছি, চারপাশে তখন সকল দর্শক বাঘ-সজারু-সাপ-লোকজন-মঞ্চ-তাঁবু-আলো নিদারুণ নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে। তখন অন্য সময়ের মতো অশ্লীল টিপ্পনী নেই, খিস্তি নেই 'কেয়া বাত'—বাহবা নেই—এক শোকাবহ সুগভীর নিস্তব্ধতা গুম গুম করছে। আলো তখন অদ্ভুত অন্ধকার। তাঁবু তখন আশ্চর্য প্রশস্ত গুহা। থমথম করছে কোনো অশরীরীর আবির্ভাব। অথচ আমি—শুধু আমি এদের থেকে পৃথক হয়ে গেছি কিছুক্ষণের জন্যে। আমার হাসি পেয়েছে—নেশাগ্রস্ত দর্শক, নৃত্যময় দুর্গামোহন, শিথিল ভাসমান মৃতদেহ তুষ্টুরামকে দেখে।

মুখ তুলেছি নয়নতারার দিকে। মুহূর্তে আবার সেই সর্বগ্রাসে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছি। অত সুন্দর বাঁশি, অমন মধুর কণ্ঠ...সে কি আমার? এরা কি যত্নচর্চিত দীর্ঘলালিত আমারই সৃষ্টি! সংশয় জেগেছে।

আমি এই 'জমাটি' বা 'বাকবাদিনীর আবির্ভাব'কে বলতাম সমবেত মুড। এবং সমবেত বলেই ব্যক্তির ইচ্ছা অভিপ্রেতের উর্ধ্বে সে। তাই সে অনিশ্চিত। বহুর অনুগামী সে—যে বহু কোনো-কোনো মুহূর্তে কোনো আকস্মিক কারণে এক অখণ্ড ঐক্যে অভিষিক্ত হয়।

কিন্তু ওই হঠাৎ জেগে ওঠা চেতনা আমার কেন—যে কেবল আত্মা বাদ দিয়ে রক্তমাংসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে?

সেকি আমার শিক্ষাদীক্ষার সংস্কার? নাকি আমারই মধ্যে বাস করছিল এক বুদ্ধিদীপ্ত যন্ত্রবিজ্ঞানি—যে হঠাৎ চাবুক মেরে বিদ্রুপ করত আমার ক্লাউন অন্য সত্তাটাকে চরম জমাটির মুহূর্তে, যখন তার যন্ত্রগত ফলাফলের অতিরিক্ত কিছু উদ্ভূত হতো, পান-চুন-খয়েরে লাল বঙের মতো?

নয়নতারা তার নটীত্বের মায়ায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছে বারবার এমনি করে। তার মুখভঙ্গী হাসি কথা কণ্ঠস্বর পদক্ষেপগুলি আমারই সুপরিচিত ও প্রিয়তম মনে হয়েছে। প্রিয় নারী নটীর পুনরুত্থান ঘটছিল আমার দৃষ্টির জগতে। মন থেকে চোখের পর্দায় সে পৌঁছেছিল।

তুষ্টুরাম বলত, 'নন্দবাবু, বাকবাদিনী বড় খামখেয়ালি মেয়ে। যখন আসেন, অল্প শ্রোতার মধ্যে, ভাঙা যন্ত্রের সুরে, কাঁচা নাচিয়ে-গাইয়ের আসরেও আসেন। যখন আসেন না, তখন হাজার লোক, নতুন যন্ত্র, পাকা ওস্তাদের মাঝখানেও আসেন না। সে তো ইচ্ছে তাঁর। খুশি হলে আসবেন, নয় তো না।' দুর্গামোহন তাকে ধমকাতো। 'ব্যাটা পণ্ডিত! আমি বলি কি জানেন নন্দবাবু? অনেক সময় জমাটি এসেও আসে না। আমি তখন দোষটা খুঁজতে চেষ্টা করি। হয়তো একটু খাটুনির অভাব ঘটেছে কোথাও। যেই সবে মিলে গা

ঘামাতে শুরু করলাম...ঠিকই এসে গেল। আসলে ও জিনিসটি খানিক বাড়তি দাবী করে আর্টিস্টদের কাছে। একটু মনোযোগ, একটু চেষ্টা...ব্যাস!' হাততালি দিত দুর্গামোহন।

তুষ্টুরামের মনঃপুত হতো না কথাটা। সে তার অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস অটল রাখতো।

তারপর দুর্গামোহন বলতো, 'বাঁড়ে হাত দিয়েই আমি টের পাই, জমবে কি না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এই যন্ত্রটা বড় পুরোনো। নয়নের মা বড় পছন্দ করতো একে। প্রায় বুড়িয়ে গেল বলতে পারেন। অথচ জমাটি আসবার সময় হলে রা বদলায় তক্ষুনি। আর...আর আমার ওপর যেন প্রেতের ভর হয়ে যায়।' এবং এর প্রমাণস্বরূপ হারমোনিয়ামের চাবি টিপেই দুর্গামোহন আমাকে তার অনুভূতি জানিয়ে দিত। আশ্চর্যভাবে মিলে যেত। কারণ খুঁজে পেতাম না তার এই অদ্ভুত জ্ঞানের। একি তারই এক ক্ষমতা? পরে দেখছিলাম, ওই জ্ঞান আমারও আয়ত্তে এসেছিল। কিন্তু দুর্গামোহন ও তুষ্টুরাম দুটি পৃথক মতবাদ, দুটি দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতীক ছিল বাস্তব জীবন সম্পর্কে।

তুষ্টুরাম যেন নিয়তির কোলে আত্মসমর্পণ করে বাঁচছিল। আর দুর্গামোহন? সে একজন সচেতন শ্রমিক। সে বিশ্বাস করতো কর্মফলে। এবং ফল পেতেই সে বুঁদ হয়ে যেত নেশায়। জুয়াড়ি দুর্গামোহন সে নয় তখন। সে এক গানেওলা ওস্তাদ।

নয়নতারা এদের একেবারে বাইরে। তার কিছু আমি বুঝতে পারি নে।

সে আমাদের এ সব আলোচনায় যোগ দিত না। তাল-লয়-মাত্রা নিয়ে তর্ক করত না। কেবল ওই তুষ্টুরামটা বড় বেয়াড়া। দুর্গামোহনের ছড়ির গুঁতো বা লাথি না-খাওয়া অব্দি আঙুল গুনে মাত্রার অঙ্ক বোঝাত। এবং এতেও তার মানসিক গঠনটা ধরা পড়েছিল আমার কাছে। নিয়তির সবকিছু নির্ধারিত বলে কোনো হিসেবের ভুল-চুক থাকা উচিত নয়। ভুল হলেই সে ক্ষুব্ধ।

দুর্গামোহন বলেছে, 'ভুল টুল হবেই। মাত্রাজ্ঞান আমাদের জন্মগত হতে পারে, দুনিয়াটা আসলে যে বড় ঝামেলার জায়গা। কেবলই ভুল হচ্ছে—কেবলই ভুল আর ভুল...'

তুষ্টুরামের পশ্চাদভাগে পাম্পশুর দাগ দেখেছি। আমি বড় দুঃখিত হতাম। আশ্চর্য লাগত যত, তত উদ্ভট। এই 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো' বাঘ-সজারু-সাপ ক্লাউন নটী আর দর্শকের উল্লাস, সবই তো এক বাইরের চাপানো আলখেল্লা—যা কারুকার্যময়। এ তো আরোপিত। অভিনীত। আসল সত্য ওই 'ভাগ্যের ঘর' আর জুয়াড়ি দুর্গামোহন। টাকা আর পাশার ছক। গুটি। মদের পাত্র। বেশ্যা নয়নতারা।

তখন তুষ্টুরাম জনান্তিকে ভেংচি কেটেছে। 'বাঈজির দল খুলছিল দুগ্গাবাবু। ভুলতে পারে না সেটা।' বলতে বলতে খোঁচা মেরেছে বাঘটার গায়ে। 'লে দিকি ওসমান চাচা, একবার হাঁকরে ওঠ দিকি। একটু জানান দে আসল কথাটা! জুয়াচুরি ফাঁস করে দে দিকি চাচাজান!'

ওসমান খাঁ গর্জন করেছে।

তুষ্টুরাম হা হা হা হা হেসে কুঁজো হয়ে যেত। 'দেখলেন, দেখলেন স্যার?'

আমি বলতাম, 'ভুলে যাচ্ছো কেন তুষ্টুরাম, দুর্গাবাবু তো আসলে নাচগানের ওস্তাদ ছিলেন।'

তুষ্টুরাম ক্লাউনের মুখে ভেংচি কাটত। 'ওস্তাদ, না ফোস্তাদ! লয়-তাল জ্ঞান নেই, ব্যাটা বেজন্মা।'

এবং চকবাজারের পরিচিত পটভূমি আমার চোখের সুমুখে আস্তে-আস্তে এমনি করে বদলে গিয়েছিল।

লজ্জা-সংকোচ ভয়-দ্বিধা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ক্রমান্বয়ে। চকবাজারের মানুষের মুখগুলি আমি আড়ালে রাখার চেষ্টা করতাম। শেষ রাতে চুপি-চুপি ঘরে ফিরতাম। রাত্রির খাওয়াটা এখানেই চুকে যেত। অনেক রোদের আলোয় জেগে আবার বেরিয়ে আসতাম তাঁবুতে। দুপুরের খাওয়াও ক্রমে দুর্গামোহনের তাগিদে এখানে হতে থাকল। বাবার কাছ থেকে, তাঁর স্নেহ-শাসন-ইচ্ছা-কামনার অধীনতা থেকে আমি দূরে চলে আসছিলাম এমনি করে। বাবা ঘোর ঔদাসীন্যে মগ্ন ছিলেন। তখন বাবাকে মনে হ'ত বড় স্থূল, অতীব নির্বুদ্ধিতার প্রতীক, খুবই জড়পিণ্ড—যা আমার জীবনে নিতান্ত একটি পরিত্যক্ত মাইলস্টোন ছাড়া কিছু নয়। কী ভাবছিলেন তিনি? কেন তাঁর ওই ঘোরতর নির্লিপ্ততা? আমার কান্না পেয়েছে। বাবা, আমি পথ হারিয়ে এ কোন দুর্গম দেশে চলেছি, ঘন অরণ্য, মায়াময় বৃক্ষ-ফুল-ছায়া, আলেয়া! ছেলেবেলায় একবার সার্কাসের তাঁবুতে বাবার সঙ্গ হারিয়ে চিৎকার করে ডেকেছিলাম, 'বাবা, বাবা, কোথায় তুমি?'

'এই যে খোকা, এখানে।'

বাবার হাতে আমার হাত মিশেছিল।

আজ আমি হারিয়ে যাওয়া ভীত নিঃসঙ্গ হাত বাড়িয়ে আছি। বাবার সেই দীর্ঘ সবল যুবক হাত এখন লোল শিথিল ক্লান্ত। সে গুটিয়ে গেছে নিজের স্ব-খাত গভীরে।

এইগুলি ঘটেছে আমার সেই হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠা চেতনার ঘোরে। তাঁকে সত্যই অন্বেষণ করছিলাম। তিনি নিঃশব্দ ও গুহাহিত ছিলেন।

তারপর একদিন তিনি শেষরাতে আমার পায়ের শব্দে বিছানায় উঠে বসলেন। 'আমার ইচ্ছা, তুমি আর এখানে এসো না আনন্দ।'

খোকা না বলে 'আনন্দ' বলায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

'তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ। নিজের জীবনের ভালোমন্দ নির্বাচন করার অধিকার হয়েছে।'

একটা চিহ্ন অঙ্কিত করেছেন কবে, আমার অলক্ষ্যে। এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে পরিচিত অভিমান ছিল না। যথার্থভাবে অনুভব করছিলাম আত্মিক অখণ্ডতার বৃহৎ পাথরে, উচ্চ চূড়ার ওপর সূক্ষ্ম ফাটলটা এতদিন বিশাল হয়ে গেছে। আমি স্খলিত হতে পারি বিপুলবেগে নীচের দিকে। ঘূর্ণমাণ জলস্রোতে কিংবা অন্য মালভূমিতে অন্ধকারে, কোনো গুহামুখে আমার পতনশীল চিৎকারে কারুর কিছু যায় আসে না।

'কোনোদিনও যেন তোমার মুখ না দেখি। তুমি চলে যেও আনন্দ।'

সবেগে ঘুরে দ্রুত বাইরে চলে এসেছিলাম। সকল অভিমান রুদ্ধ পুঞ্জীপূত ক্রোধের রূপ নিয়েছিল। যখন বিদীর্ণ হ'ল, আমার চোখে জল। কেন বাবা, আমাকে ছেলেবেলার মতো আঘাত করলেন না? চুলের ঝুঁটি ধরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন না তাঁর পৃথিবীতে?

সে কি তাঁর দুর্বলতা? তাঁর মনের সব ভালোর আদলে গড়ে ওঠা নন্দ, হঠাৎ এত ভিন্নরূপ হয়ে গেছে যে তাকে আর আহ্বান নিরর্থক?

কিন্তু আর ফেরার পথ ছিল না। সংশয় সব ঢেকে ফেলেছিল। দুর্গামোহনের পার্টি, না বাবার ঘর? বাবা আর আমাকে কতখানি সুখি করতে পারেন? আমার মনের ছাঁচে যে সুখের আদল, তা ওই ঘরে ছিল না আর। বাবা যথার্থ বলেছেন—আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছি।

হাইরোডে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। শেষ রাতের আবছা আলোয় তাঁবুটা ধূসর পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছিল। তার গহ্বরে গভীর বিশাল মায়ারাজ্য; রাজা, নর্তকী ও বিদূষক। বন্য প্রাণী। অগ্নিময় লৌহবলয়। গুরুভার দীর্ঘ ত্রিশূল। তার অন্তরালে বিস্তৃত ছকের ওপর চিহ্নিত অস্থিখণ্ডগুলি ছড়িয়ে পড়ে বারবার। পানপাত্র ফেনিল হয়। লালসা জেগে ওঠে।

আজই দুর্গামোহনের পার্টির শেষ খেলার দিন।

তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলাম। পর্দা তুলে চলতে থাকলাম। দর্শকশূন্য প্রশস্ত চত্বর পেরিয়ে মঞ্চে উঠলাম। মঞ্চের উপর নগ্ন শরীরে লোকগুলি ঘুমিয়ে আছে। তাদের অতিক্রম করলাম সন্তর্পণে। বাঘের খাঁচার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। সে শুয়ে ছিল। ঘুমোচ্ছিল শরীর ছড়িয়ে। মুখটা ওপাশের কাঠের দেওয়ালে সংলগ্ন ছিল। আমি সজারুটাকে দেখলাম কোণের দিকে গুটিসুটি বসে থাকতে। সাপটা তারের জালের আড়ালে চুপচাপ শুয়ে আছে।

ফের আমি ঘুমন্ত লোক ও জন্তুগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। খণ্ড-খণ্ড মাংস কিম্ভূত আকৃতিতে বিক্ষিপ্ত। এদের আত্মা কি কোনো স্বপ্নে অন্তর্লীন? এরা কত নিশ্চিন্ত। এই পরিব্যাপ্ত ঘুম ও স্বপ্নের জগৎ থেকে হতাশ হয়ে বেরিয়ে গেলাম। নয়নতারার তাঁবুতে গিয়ে যা দেখলাম—তা আমার অকল্পনীয় ছিল।

তুষ্টুরাম ক্লাউনের নগ্ন বুকের কাছে মাথা রেখে নয়নতারা শুয়ে আছে। তুষ্টুরামের একটি হাত তার গলার নীচে। কানের পাশে পেন্টের চিহ্ন নিয়ে সে ঘুমোচ্ছে। সেও বড় নিশ্চিন্ত।

তাঁবুতে প্রবেশ করার পর আগাগোড়া এইসব বাস্তবোচিত আরাম ও দৃশ্যাবলী আমাকে কোনো সান্ত্বনা দিচ্ছিল না। বিক্ষিপ্ত পায়ে এগিয়ে শিরীষ গাছের নীচে দুর্গামোহনের ঘুমও আমি দেখলাম। সে প্রকাণ্ড হাঁ করে আছে। নাক ডাকছে শব্দ করে। অনেক সময় ধরে তার মুখ নিরীক্ষণ করলাম। বয়সের ভাঁজ আকীর্ণ তার প্রকাণ্ড মুখমণ্ডলে। এই ঘুম তাকেও বাস্তব করেছে। তার রোমশ ভ্রূদুটি, দীর্ঘ স্থূল ও সূক্ষ্মাগ্র নাক, প্রশস্ত কপাল এখন এ ঘুমের সংশ্লিষ্ট কিছু। কিন্তু তার পুরু হাতের তালু, আঙুলের লোম, লালপাথর বসানো আংটি, বাদামি চামড়ার কৌটো, হাড়ের গুটি, প্রতীকচিহ্ন, ছক এ সবকিছুর সঙ্গে জড়িত হয়ে নেই। সে এখন ভিন্ন সত্তা। ঘনীভূত দৃঢ় ও কঠোর বাস্তব।

হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নিদ্রাহীন চোখদুটি জ্বালা করছিল। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, একসময় পিঠে মৃদু স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠেছিলাম।

নয়নতারা। ধূসর আলোয় তার মুখের রেখা বড় অস্পষ্ট।

'নন্দবাবু!'

আমার দুচোখে জল এসে গিয়েছিল। যেন বা প্রকৃত উদ্ধার অলৌকিকতার আকাশ থেকে ডানা মেলে এসে কবে আমার হাত ধরবে এই আশায় আমি বেঁচেছিলাম এতদিন—

অথচ তারপর যাকে সম্মুখে দেখলাম এতক্ষণে, সে তুষ্টুরাম ক্লাউনের বৌ মাত্র। নতুন করে এ আবিষ্কার আমাকে কাতর করেছিল। নয়নতারাকে স্পর্শ করতে দেখে তাই আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি। কই, কোথায় সে অলৌকিক উদ্ধার, যে বহ্নিময়ী নারী, পাশার গুটিতে যার প্রতীকচিহ্ন খোদিত? এ যে এক বহুস্পৃষ্ট মাংসখণ্ড—অসংখ্য দাঁতের দাগ তার ভাঁজে ভাঁজে!

ফের নয়নতারা বলেছিল, 'নন্দবাবু, এত ভোরে যে।'

হঠাৎ ব্যাকুলভাবে তার হাত চেপে ধরলাম, 'নয়ন, আমি যদি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই, রাগ করবে না তো?'

নয়নতারার চোখদুটি বড় হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। সে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যেন। তারপর ভাবশেলহীন মুখে হাসল একটু। 'আমার ভালো লাগবে নন্দবাবু। কিন্তু...' বাধা দিয়ে বললাম, 'কোন কিন্তু নেই। আমি স্থির করে ফেলেছি সব। এ ছাড়া আমার যাওয়ার পথ নেই।' নয়নতারা আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকল।

পেছন ফিরে দেখি কখন দুর্গামোহন উঠে বসেছে। তেমনি নিঃশব্দে প্রচণ্ড হাসছে দুলে দুলে।

৪

'অদ্য শেষ রজনী!' তাঁবুর দরজার উপর উঁচু বাঁশের মাচায় দাঁড়িয়ে তুষ্টুরাম ক্লাউন চিৎকার করে বলছিল, 'আসুন আসুন, দেখে যান, অদ্য শেষ রজনী! বাঘ-সজারু-সাপ ঔর সবসে বড়িয়া খেল...আপনার আঁখো কা তারা...' তার ছুঁচলো লাল টুপির শীর্ষে একটা কাগজের ফুল ক্ষিপ্রভাবে সঞ্চারিত হচ্ছিল তার পরিধানে ঘন নীল রঙের আঁটো ফুলপ্যান্ট—পা দুটি কীভাবে ঢুকিয়েছে কে জানে। খাটো লাল কোর্তায় ছবি ছোপানো। দুহাতে কালো দস্তানা। পায়ে কিম্ভূত গঠনের নাগরা জুতো।

ব্যান্ডের বাজনা থামিয়ে মধ্যে মধ্যে সে এইরূপ ঘোষণা করছিল। নয়নতারার তাঁবুতে বাক্সে হেলান দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে আমি বসেছিলাম। নয়নতারা সাজছিল। এই সজ্জায় তার নিষ্ঠার চিহ্নগুলি লক্ষ্য করছিলাম। কাঁটাতারের বেড়ায় ওপাশে প্রত্যাশী কিছু দর্শকের ভীড়। পার্টির লোকেরা তাদের বার-বার তাড়া করছিল। তবু তারা বেহায়ার মতো ফের ভীড় করছিল। নিষ্পলক চোখে নয়নতারার দিকে তাকাচ্ছিল। সেই জনতার দিকে চেয়ে আমি কেমন অভিভূত হচ্ছিলাম। অপ্রমেয় ক্ষুধা নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এবং মুক্তির হাওয়া আমার গায়ে, এই ঔৎসুক্য, হল্লা, নটী, মঞ্চ আমার নতুন পৃথিবী, বাইরে ওই অপেক্ষামান মুখগুলি এইভাবে চেয়ে থাকবে সারা জীবন, গভীরতর অবিনশ্বর ক্ষুধা বেঁচে থাকবে...ভাবতে ভাবতে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

'আসুন, আসুন! দেখে যান, নিয়ে যান। শেষ খেলা...খেল খতম।'

তুষ্টুরামের কর্কশ চিৎকার করাতের মতো সব ভাবাবেগ ছিন্ন করছে।

'ভাই রে...দুদিনের দুনিয়াদারি...আঁখ খুললে আছি, বন্ধ করলে নেই। তখন মুসলমান যাচ্ছে আল্লাতালার কাছে, হিন্দু যাচ্ছে পরমাত্মা ভগবানের কাছে। লেকিন আল্লা পুছলেন

বল, কী দেখে এলি, কী লিয়ে এলি দুনিয়া থেকে! ভগবান ভি পুছলেন, কী সেরা চীজ দেখেছিস সংসারে...তো কী বলবেন বলুন দেখি মেরে দোস্ত? আমি বলি,...জবাব তো তৈরি।' এক মুহূর্ত থেমেছে তুষ্টুরাম। ফের হাতে তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠেছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার...দেখেছি, ঔর লিয়ে ভি এসেছি। এই দেখুন, আমার দিলের দিকে তাকান...এক আচ্ছা সে আচ্ছা নাচনা-গাহনা ঔর দেখনা চীজ... নয়নতারা!' হা হা হা হাসছে 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো'র ক্লাউন। ভ্রূ আঁকতে আঁকতে হঠাৎ থেমে গেল নয়নতারা। আয়নায় কিছু দেখছিল সে।

'বন্ধুগণ, লোহার চাকাটা ঘুরছে—তার অন্দরে চল্লিশটে ছুরির ফলা, ফলায় নাকড়া ভি জড়িয়ে দিলে, তারপর আগুন জ্বাললে...আর একটা নাদান আদমী, আপনাদের পায়ের ধুলো কুড়িয়ে তার জন্মো...সে কী করলে? না, হাওয়ায় ভেসে তার অন্দরটা পার হয়ে গেল। আগুনের আঁচ লাগল না, ছুরি ভি বিঁধল না।'

গর্জন করে উঠল তুষ্টুরাম। 'কেন, কেন লাগল না আগুন, ছুরি কেন বিঁধল না? না, চাকার ওপারে খাড়া আছে নয়নতারা।'

বিপজ্জনক ত্রিশূলের খেলা বর্ণনা করার পরও তুষ্টুরাম ফের নয়নতারার উল্লেখ করছে। তার আজকের ঘোষণায় নয়নতারা অতিশয় প্রকট। এমন করে কোনো দিন বিজ্ঞপ্তি পাঠ করেনি সে।

'ওসনান খাঁ বনের রাজা, আমিনা সাপিনী বনের রাণী। ঔর বুঢ়ুয়া? ওই সজারু? কী বলুন তো দাদা? আরে...উও তো একটা কেলাউন আছে! লেকিন তার আঁখ থেকে আঁসু নিকলাচ্ছে। কেন? বহু দুঃখে? ভুল, ভুল কথা ভাই রে!...'

'নয়নতারা' দিয়ে তার কথা শেষ হ'ল। ব্যান্ড বেজে উঠল সশব্দে। ভিড় বাড়ছিল একটু করে। হল্লা শুরু হচ্ছিল। নয়নতারা শুধু চেয়ে ছিল আয়নার দিকে। কপালের অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাটা দাগটা সাদা সফেদাবিন্দু দিয়ে লুপ্ত করে আলপনা আঁকছিল সে। এঁকে বলেছিল, 'চন্দ্রকলা। নবমী, না দশমী?'

প্রশ্ন করেছিলাম, 'ওই দাগটা কিসের?'

নয়নতারা মুখ তুলেছিল। এবার সে নটী। সে এবার সম্পূর্ণতা পেয়েছে। তার চোখে অন্য রঙ। হাসিতে লীলা-মৃগের ক্ষিপ্র সঞ্চরণ। তার রক্তিম অধরোষ্ঠে স্মিত সংরাগের বিভ্রমণ।

'যদি না বলি?'

'তোমার খুশি।'

হঠাৎ নয়নতারা আমার পাশ ঘেঁষে এলো। 'আপনি তো আর পর নন। পার্টির লোক। বললেই বা ক্ষতি কী?'

হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে ধকধক করে উঠল। আমি নিজেকে সংযত রাখছিলাম।

'শুনবেন?'

'ইচ্ছে হলে বলতে পারো।'

'হাসবেন না তো?'

'হাসবো কেন?'

কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো নয়নতারা। তার নিশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছিলাম। সফেদা-মিনা-কুমকুমের গন্ধের সঙ্গে অন্য একটা গন্ধ ছিল। আমার কাছে খুবই নতুন সে গন্ধ। আমার রক্তে আগুন ধরে যাচ্ছিল। নয়নতারা ফিসফিস করে বলল, 'পুরুষের দাঁতের দাগ।'

হেসে উঠলাম। 'যাও! ফাজলেমি হচ্ছে।'

নয়নতারাও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল।

দুর্গামোহন আজ প্যান্ট কোট পরেছিল। শেষ রজনীতে একটা স্থায়ী স্বাক্ষর চকবাজারে রেখে যাবার ইচ্ছে তাকে যেন পেয়ে বসেছে। তুষ্টুরাম বলেছিল, 'ওইটেই রেওয়াজ। সবখানে শেষ রাতটা জমিয়ে দিতে হয়।' একটা ছোট নাটকও অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল সে রাতে। রাজা গেলেন শিকারে, সঙ্গে কোটাল। ঘোর অরণ্যে পথ হারিয়ে পাথরের পুরী দেখলেন চোখের সুমুখে। সে পুরীর তোরণদ্বারে বিকটমূর্তি রাক্ষস। তাকে নিধন করতে ছুটে এলো পাথরপুরীর রাণী—বাঘের পিঠে জগদ্ধাত্রী...যেন হাতে মায়াদণ্ড...মোহিনী মায়ায় তার বশীভূত স্থাবর ও জঙ্গম। রাজা ও কোটাল পাথর হয়ে গেল তার জাদুদণ্ডের স্পর্শে। (এইখানে তুষ্টুরামের কোটাল বেশে পাথর হয়ে গড়িয়ে পড়ার এক রহস্য কাণ্ড রয়েছে।) তারপর?

তারপর এলো বালক রাজপুত্র পিতার উদ্ধারে। বাঘ থাবা তুলে গজরাচ্ছে পথ রোধ করে। সজারু ক্ষিপ্ত কাঁটার পালক নেড়ে তেড়ে আসছে। সাপিনী অগ্রসর হচ্ছে ধীর গতিতে।

তখন রাজপুত্র তার মোহন বাঁশিতে ফুঁ দিল। বশীভূত হ'ল অরণ্যের শ্বাপদকুল। মায়াবিনী রাণী এলেন সুমুখে। চোখে বাৎসল্যের অশ্রুজল।

মুক্তি পেয়েছে রাজা ও কোটাল। রাজধানীতে ফিরে আসে। সঙ্গে পাথরপুরীর মোহিনী রানী ও অরণ্যচরগণ।

রাজপুত্র বাঁশির সুরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

নেপথ্যে আমিই বাঁশি বাজাব। ডিব্বু শুধু ঠোঁটে একটা বাঁশি ধরে রাখবে।

ডিব্বুকে স্টেজে নামাতে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তুষ্টুরাম ও নয়নতারাও। কিন্তু দুর্গামোহনের মনের কথা টের পাওয়া যায় না। কখন মনে মনে এই নাটকটা বানিয়েছে সে। সংলাপও রচনা করেছে। তারপর দুপুরে একদফা রিহার্সাল দেওয়া হয়েছে। একেবারে শেষদিকে এটা অভিনীত হবে। তখন দুর্গামোহন ও ডিব্বু সেজে নেবে। তুষ্টুরামের সাজবার দরকার নেই। হয়তো নয়নতারা বেশভূষা একটু পালটে নেবে। দু-কাঁধে রঙিন নাইলনের ওড়না—দুটি প্রান্ত ফুলের মতো ফুটে আছে। মাথায় মুকুট তার।

তুষ্টুরাম যখন আগুনের চাকার খেলা দেখাচ্ছিল, পার্টির একজন এসে ডাকল আমাকে, 'বাঁশীবাবুকে খোঁজ করছে ওখানে।'

'কাকে?'

'আপনাকে। ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।'

বাঁশীবাবু! ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে লোকটার অনুসরণ করলাম। তারপর দেখলাম ত্রিলোচনকে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গরিলার মতো দুলছে। আঙুলের শব্দ করে বাজনা

বাজাচ্ছে। আলো-আঁধারি পরিবেশে তার এ মূর্তি দেখে একটু হাসি পাচ্ছিল। দুর্গামোহনের আরেক শিকার যার জন্য আর কোনো মমতাও আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই কেবল আছে খানিক করুণা।

'ত্রিলোচন?' আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম। তার মুখে তীব্র মদের গন্ধ।

ত্রিলোচন হাসছিল। 'খুব মজায় আছ গো নন্দবাবু। চেলাদের একেবারে ভুলে গেছ দেখছি!'

'ফাজলেমি করো না তো। কাজ আছে আমার।'

'কাজ? কী কাজ তোমার নয়নবালা নাচবে, নন্দবালা বাঁশিতে ফুঁ দেবে...তুরু, তুতুর তুরু...' বাঁশি বাজানোর ভঙ্গী করল সে। 'কোথায়, না শিরীষ তলায়। কেন, না চিরাধিকে... এদিকে আয়ানশালা ভেরেণ্ডা ভাজছে...'

'ত্রিলোচন, তোমার মাতলামি শোনার সময় আমার নেই।'

বুকে দুহাতে চাপড় মারল ত্রিলোচন। 'কুছ পরোয়া নেই। কপাল তো পকেটে নে ঘুরছি রে বাবা। এই দ্যাখ না...' পকেটে হাত ভরে এক গোছা নোট বের করল সে।

তাঁকে ঝাকুনি দিয়ে বললাম, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ত্রিলোচন? এরা চলে গেলে তুমি খাবে কী? টাকাগুলো সব জুয়া খেলে শেষ করে ফেললে!'

'কই, অ্যাদ্দিন সে কথা বলো নি!' ত্রিলোচন চোখ মুছল। সত্যি সত্যি কাঁদছিল সে। মাতালের কাণ্ড। 'আমার ঘরখানা পড়ে পড়ে কাঁদছে, তুমি এদিকে মৌজ করছো। তখন তো বলো নি, ও ত্রিলোচনদা, আমরা ঠিকসে আছি। যে কে সেই। একচুল নড়ি নি...' স্থিরভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ত্রিলোচন।

'কী বলতে চাও তুমি?'

'এট্টুখানি প্রার্থনা নন্দ, এট্টু ছোট্ট কথা। আরজি মঞ্জুর করুন হুজুর।' হাত জোড় করেছিল সে। আমি স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। 'নয়নমণিকে দুটো কথা বলব।'

'কী কথা?'

'আমি একবার বাজাবো, সে নাচবে।'

স্টেজের ও-দিক থেকে ডাক এলো, বাঁশিবাবু, মালিকবাবু ডাকছেন।'

চলে আসছিলাম। হাত ধরে সজোরে টানল ত্রিলোচন। 'নেমকহারামি কচ্ছো নন্দবাবু। খবরদার!'

তার স্পর্ধা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে। ধাক্কা দিতেই সে মাটিতে আছাড় খেল। কুৎসিত গাল দিয়ে উঠল। পার্টির সেই লোকটি তার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চলেছে। আমি দ্রুত সরে এলাম।

সারা তাঁবু লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। উত্তেজিত জনতার উল্লাসধ্বনি মাতিয়ে দিচ্ছিল আমাদের।

একেই তুষ্টুরাম বলে 'মানুষমদ'। চুমুকে চুমুকে পান করে হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। এক সময় শো শেষ হয়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে সে নাটিকার অভিনয় দেখল সমবেত দর্শক। তারপর দুর্গামোহন তাড়াতাড়ি বেশ বদলে নিয়ে স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছিল। জোড় হাতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে তার বিদায় ভাষণ দিয়েছিল। উচ্ছ্বসিত করতালি দিয়ে তাকে বিদায়সংবর্ধনা

জ্ঞাপন করছিল তারা। স্পষ্ট দেখছিলাম, দুর্গামোহনের মুখ বারবার রক্তোজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আশ্চর্য, এই দুর্গামোহন এবার এগিয়ে নরকের দুয়ার খুলে দেবে। নিয়তির হাত ধরে তাকে টেনে প্রবেশ করবে ভিন্ন মঞ্চে অন্যরূপ ভূমিকায় :

আজ শেষ রজনী। মুসাফিরের জীবন। ফের গাঁটরি তুলে যাত্রা করবে অন্য দেশে। এদিকে সে মানুষের মুখে ছুঁড়ে দেবে মুঠো মুঠো হাসি ও আনন্দের চূর্ণিত পুষ্পপরাগ। অন্যদিকে দেবে আরেক উপহার। সর্বহারার কান্না। ভুলের মায়াজালে আবদ্ধ শবদেহগুলির হাহাকার।

নয়নতারাকে কেন্দ্র করে এই আলো অন্ধকারময় মায়াচক্র ঘূর্ণমান রেখেছে দুর্গামোহন।

ভাগ্যের ঘরে শেষ খেলা চলছিল।

উৎকট হাসি ও হল্লা শুনতে পাচ্ছিলাম। শুনতে শুনতে তুষ্টুরাম, আমি ও ডিব্বু পাশাপাশি বসে খাওয়া শেষ করেছিলাম একসময়। তারপর ডিব্বুকে শুইয়ে তুষ্টুরাম অভ্যাসমতো উবু হয়ে সিগ্রেট টানছিল। দাঁত খুঁটছিল।

নয়নতারার আসতে কিছু দেরী হবে। আজ একটি মাত্র শো। তাই রাত বেশি হয় নি। দুটো বাজলে তাঁবু গোটাতে হবে এমতো নির্দেশ রয়েছে। দুটো লরিও সময়মতো এসে পৌচেছে। দিনের দিকে লোক পাঠিয়েছিল দুর্গামোহন। চকবাজার থেকে এবার অন্য কোথাও যাত্রা।

'কোথায় সে জায়গাটা?' আমি প্রশ্ন করলাম তুষ্টুরামকে। তুষ্টুরাম মাথা নাড়ল। জানে না। কোনোদিনই হয়তো দুর্গামোহন গন্তব্য স্থান কাউকেও জানায় না। প্রয়োজনও নেই জানানোর। তবে বিকেলের দিকে কে বলছিল, কোথায় একটা মেলা বসেছে। শ্যামচাঁদ পুজোর মেলা।

'তুষ্টুরাম!' ফের আমি ডেকেছিলাম।

'বলুন।'

'আমার যাবার কথা শুনছো। তাই না?'

তুষ্টুরাম মাথা দোলাল।

'তুমি কী বলো?'

তুষ্টুরাম মুখ তুলে চেয়ে থাকল আমার দিকে। ভাবলেশহীন।

'বলবে না কিছু?'

'কী বলবো, বলুন?'

'আমার যাওয়া কি ঠিক হবে?'

একটু হাসল সে। 'আমাকে সে কথা পুছলেন কেন? আপনার মালিক তো আপনি নিজে।'

'তুমি এই লাইনে অনেকদিন আছ।'

তুষ্টুরাম পা ছড়িয়ে মাটিতে বসল। 'আমি বললেও তো আপনি শুনবেন না। নতুন করে পুছে কী লাভ!'

জবাব দেবার মতো কিছু ছিল না। তবু আমি বললাম, 'তুমি রাগ করবে না তো?'

কথাটা বলা ঠিক হয় নি। তুষ্টুরাম যেন চমকে উঠল। 'কেন নন্দবাবু। এ কথা বলছেন কেন?'

মরিয়া হয়ে বললাম, 'তুমি হয়তো ভাববে...'

'কী ভাববো?' তুষ্টুরাম ক্লাউনের হাসি হেসে উঠল।

চুপ করে গেলাম। নিজের দুর্বলতা যেন নিজের কাছেও হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেছে। নয়নতারাকে দেখে আমি মোহগ্রস্থ হয়েছি—অঘোষিত এ ঘোষণায় ক্লাউন তুষ্টুরাম হা হা করে হাসছে। কান অব্দি গরম হয়ে গেল। নতমুখে ঘামছিলাম।

তুষ্টুরাম একই ভাবে হাসতে হাসতে বলল, 'নয়নতারা কি আমার, যে আমি রাগ করবো নন্দবাবু?'

রাগে-দুঃখে কাঠ হয়ে গেছি সঙ্গে-সঙ্গে। 'তুষ্টুরাম, তুমি কী ভেবেছ আমাকে?'

'কিছু না।'

'কখনো তুমি ও সব কুৎসিত কথা বলবে না। জানো, আমি একজন শিক্ষিত লোক? ভদ্রবংশে আমার জন্ম?' আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিলাম।

তুষ্টুরাম আমার হাত ধরল এসে। 'আরে বাপরে বাপ! আপনি দেখছি দুর্গাবাবুর ছোট ভাই একেবারে! চুপ করুন স্যার, চুপ করুন। রাতদুপুরে চেল্লাচেল্লি করলে পেটের ভাতভি হজম হবে না, নিঁদভি আসবে না।'

শিরীষগাছের নীচে আমার বিছানা পাতা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বারবার ভাবছিলাম, এখনই ছুটে বাড়ির দিকে চলে যাই। বাবার পা দুটি ধরে ক্ষমাভিক্ষা করি। এই পরিপূর্ণ আদিম নগ্নতার পৃথিবীতে আমার জন্যে কোনো আশ্বাস থাকতে পারে না!

তারপর একসময় সত্যি-সত্যিই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। দারুণ ভয়ে আমার গা কাঁপছিল এতক্ষণে! তুষ্টুরাম যদি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় কোনোদিন হত্যা করে ফেলে!

আমাকে সত্যই কি সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছে? নানা তুচ্ছ ঘটনা আমার মনে পড়েছিল। সেগুলি বিরাট আকার ধারণ করে অতর্কিতে কোনোদিন আক্রান্ত হবার গুরুতর ভয় সৃষ্টি করছিল। তুষ্টুরামের সঙ্গে আমার পরিচয়ের মুহূর্ত থেকে বর্তমান সময় অব্দি প্রতিটি ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার আমার স্নায়ুকে অস্থির করে তুলছিল।

পা বাড়াতেই ভাগ্যের ঘর থেকে ত্রিলোচনের চিৎকার শুনলাম। 'ঠক, জোচ্চোর, বদমাস! দে, ফিরে দে আমার টাকা...' একটা হল্লার শব্দ তার চিৎকার ঢাকল। কে তাকে ঠেলে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে থেকে তার তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো। 'হায়, হায়... আমার সর্বস্ব মেরে দিলে বাবা গো...'

নেশা ছুটে গিয়েছে হয়তো। সে হাইরোডের পিচ্ছিল পীচের চত্বরে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। আমার ইচ্ছে করল এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ি ভাগ্যের ঘরে। আগুন জ্বেলে দিই। দুর্গামোহনের গলা টিপে ধরি। এবং এ-সময় বাঘটা হাঁ করে উঠল। নয়নতারার খিলখিল হাসিও শুনতে পেলাম। কে প্রমত্তকণ্ঠে জড়িয়ে-জড়িয়ে গান গাইলে...তুমি আমার নয়নের তারা...লে! এই লে খুকি, যা আছে সব লে! কলজেটা শুদ্ধু উপড়ে লে...বেঁচে যাই...ব্যস...

তারপর উদভ্রান্ত হাসি হা হা হা হা...

পাশার গুটি খড়খড় করে নড়ে উঠে শেষ দান চালা হয়েছে। রাজমুকুটে শূন্য। ড্রাগনের দুই। এস্কাবনে তিন। রুহিতন-চিড়িতন-হরতন এক এক এক।

ভাগ্যের ঘরে যারা বসেছিল, কেউ মুখ তুলে দেখল না আমাকে। দুর্গামোহন মাঝখানে বসে নিঃশব্দে হাসছে। নয়নতারা ছকের ওপর ঝুঁকে আছে কনুইয়ে শরীর ভর করে। হ্যাসাগের আলোয় তার পেন্ট-রাঙা মুখ নরকের মশালে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা কোনো মুখের মতো। দেহগুলি পেছনে চক্রকারে বিরাট ছায়া ফেলেছে কাপড়ের দেয়ালে। বাতাসে কাঁপছে ছায়াগুলি। নীল সেলোফিনের মোহময় দ্যুতির প্রান্তে।

সেই কম্পমান ছায়ায় দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করলাম, চকবাজারের খেলা সেদিন আমার হাত দিয়ে শুরু, আমার পরাজয় দিয়ে সূচনা তার। আজ শেষ হচ্ছে এতক্ষণে। এই শেষলগ্নেও কি পরাজয় বরণ করে নেব?

আস্তে আস্তে সরে এলাম। আমি ক্রমশ খেলার গভীরতর স্তরে পৌঁছে গেছি। চরম অব্দি অপেক্ষা করতেই হবে। আমি হার মানবো না। না। না। না।

৫

বিস্তৃত আমবাগানের প্রান্তে আমাদের তাঁবু পড়েছিল। চৈত্রের ঘন নীল আকাশের নীচে বিরাট ময়দানের উপর এই মেলাটা আমার চোখের পুরোনো পর্দা সরিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল পৃথক এক মায়াজগতের মতো। যখন প্রবেশ করেছি, তখনই বদলে গেছি। মানুষের ছোট ছোট হাসি আনন্দ কণ্ঠস্বর বৃহত্তর ঐক্যে বিধৃত হয়ে যে রূপ পায়, তা এমনি করে কোনোদিন অনুভব করি নি।

মানুষ, মানুষ, মানুষ।

যেদিকে দেখি মানুষের মুখ। যেদিকে কান পাতি মানুষের স্মিত কণ্ঠস্বর। খেলার বাঁশি বেজে চলেছিল বিরতিবিহীন। শোভাযাত্রার ঘূর্ণিতে ছিল উজ্জ্বল সমারোহ। চুমুকে চুমুকে পান করেছিলাম। অনভ্যাসের ক্লান্তি ও আড়ষ্টতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। দায়হীন বন্ধনহীন প্রীতিময় এ জগৎ। মানুষ যখন এখানে পা দেয়, তখন সে সব প্রাত্যহিকতার উর্ধ্বে।

গ্রামটা ঠিক গ্রাম নয়। ঠিক শহরও নয়। কলকারখানাও দু-চারটে রয়েছে। ইলেকট্রিক আলো আছে। প্রচুর ইটের বাড়ির আনাচে-কানাচে মাটির বাড়ির সংখ্যা কম নয়। দুর্গামোহন সঠিক জায়গাটি খুঁজে বের করে। পুরোপুরি শহর হয়ে ওঠা জনপদ তার অপছন্দ। 'কিছু গ্রামের গন্ধ কিছুটা শহরের', দুর্গামোহন বলে, 'সেখানেই আমার পসার জমে ভালো।' পসার জমতে দেরি হয় নি।

খেতে বসে তুষ্টুরাম বলেছে, 'পাত দেখেই বুঝতে পারি এটা। দু-এক পদ বাড়িয়ে দ্যান মালিকবাবু। ওদিকে হাতটা বেশ দরাজ। নইলে কে কবে কেটে পড়তো ঠিক নেই।'

চকবাজারে দুর্গামোহনকে আলাদা খেতে দেখেছি! এখানে সে আমাদের সঙ্গে খাচ্ছিল। নয়নকে কুটনোবাটনায় লাগিয়ে কোনো সময় সে নিজেই রান্নায় বসে। মোড়ায় স্থূল দেহ রেখে ভ্রূ কুঁচকে মাছ ভাজতে দেখলে মনটা নরম হয়ে যায়। আহা, লোকটি বড় ভালো।

এবং তারপর দুর্গামোহনকে পরিবেশন করতেও দেখি। আমার পাতে বৃহৎ এক টুকরো মাছ দিয়ে বলে, 'লজ্জা করবে না নন্দ। তুমি আমার ছোট ভাই।' ডিব্বুকে বলে 'ওরে শালা, বেশি বেশি খেয়ে চট করে বেড়ে ওঠ দিকি।' বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকতাম মুখের দিকে। একি সেই জুয়াড়ি!

সে আবার বলত, 'এই আমার সংসার ভাই। এর চেয়ে বড়ো সংসার কোথায় আর পাবো! ওইটে আমার ভাই, ও হচ্ছে মেয়ে, ওটা নাতি। আর তুষ্টু? জানো নন্দ, ব্যাটা কী সম্পর্কটা বানিয়েছে আমার সঙ্গে? জামাই ঘরজামাই!' প্রচণ্ড হাসিতে ধকধক করে তার বিরাট শরীর কাঁপছে।

অথচ ঠিক সেই রাতে তুচ্ছ কারণে তুষ্টুরামের মুখে লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল দুর্গামোহন। আমি ছুটে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

দুর্গামোহন বাঘের মতো গরগর করে বলেছিল, 'খবরদার নন্দ, এ সময় কক্ষনো সামনে এসো না। কী বলতে কী বলে বসবো, দুঃখ পাবে।'

আমি টের পেয়েছি, এদের জীবনের রীতিনীতি ঠিক আমার জানাশোনা পছন্দের বাইরে। এবং তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারলে আমার টেকা কঠিন হবে এখানে।

একদিন ওসমান খাঁ হঠাৎ ক্ষেপে গেল যেন।

চরম মুহূর্তে স্টেজে কিছুতেই নামছিল না সে। ঘাড় বেঁকিয়ে গরগর করছিল। গর্জন করে উঠেছিল নাক তুলে। দুর্গামোহন একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গম্ভীরমুখে অপেক্ষা করছিল।

স্টেজে তখন পর্দা পড়ে আছে। পর্দার বাইরে দর্শকেরা ক্ষুব্ধভাবে চিৎকার করছিল। এই খেলাটি দেখার জন্যেই তারা হয়তো এত উদ্দীপনা নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করে।

একটু আগে খেলার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই সে উদ্দীপনা তখন প্রখরতম। স্টেজের পর্দাটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ঢিল ছুঁড়ছিল দর্শকেরা। অশ্লীল খিস্তি করছিল বারবার।

নয়নতারার খুব কাছ ঘেঁষে আমি উইংসে বসেছিলাম। দেখলাম দুর্গামোহন ওসমান খাঁর শেকলটা তুষ্টুরামের হাত থেকে কেড়ে নিল। তারপর ছড়ির গুঁতো মেরে সজোরে টানতে থাকল। তুষ্টুরাম হাত জোড় করে চাপা গলায় নিষেধ করছিল তাকে।

নয়নতারা হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরল দৃঢ়ভাবে। তার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম সে হাসছে সকৌতুকে। দারুণ উৎকণ্ঠার সময় তার এ হাসি বিরক্তির উদ্রেক করে। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'এমন করছে কেন বাঘটা?'

'তার ইচ্ছে।'

'ইচ্ছে?' আমাকেও হাসতে হ'ল। 'কিন্তু এমন ইচ্ছে কি কোনোদিন ছিল? নাকি আজ নতুন?'

'নতুন।'

নয়নতারা আমার জানুর উপর তার শরীরের কিছু অংশ হেলিয়ে রাখল। আমার বুকে তার খোঁপার স্পর্শ। তার হঠকারিতায় আমি বিব্রত।

তুষ্টুরাম এতক্ষণে মুখ ফেরাল। এদিকে উইংসে কিছু অন্ধকার। অন্ধকারে তার দৃষ্টিপাত সাপের স্পর্শের মতো হিম হয়ে আমার ওপর পড়েছে।

উঠে দাঁড়ালাম তৎক্ষণাৎ। এগিয়ে গেলাম স্টেজের মাঝখানে। তুষ্টুরাম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে দুর্গামোহনকে সাহায্য করছে।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো ওসমান খাঁ। সে একটানা গরগর করছিল। এবং তার ওই গর্জন আরও ক্ষিপ্ত করছিল জনতাকে।

সজারু ও সাপটা টেনে বের করে তুষ্টুরাম ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়ল। নয়নতারা ততক্ষণে প্রস্তুত। তার বুকের ওপর আমিনা, দু হাতে দু'টি শেকলে ওসমান খাঁ আর বুদ্বুয়া।

তারপর বাঁশি বেজে উঠেছে। মন্ত্রমোহিত জনতা রুদ্ধশ্বাসে একটি আদিম শিল্পবিলাসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে।

ঘুঙুরের ধ্বনি, নটীদেহের তরঙ্গভঙ্গ, বাঁশির সুর। মধ্যে মধ্যে ওসমান খাঁ বিকট গর্জন সব আবেশ ছিন্ন করে।

সজারুর কাঁটাপালকগুলি খট-খট সড়-সড় করে কেঁপে কেঁপে খাড়া হয়। সাপের মুণ্ডুটা ঝুলে পড়ে নয়নতারার বুকের মাঝখান হতে। তখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার স্বর্ণহার।

এখানে অন্ধকারে তুষ্টুরামের মুখ দেখি না। দুর্গামোহনের বিরাট শরীর তাকে আড়াল করেছে।

পর্দা পড়ল।

তুষ্টুরাম দ্রুত ছুটে গেল স্টেজে। আমিনা সাপিনী নয়নতারার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। দু'হাতে খোলবার চেষ্টা করছে সে। দুর্গামোহনও লাফিয়ে অগ্রসর হ'ল। সজারুটা নিজ বিবরে প্রবেশ করেছে। ওসমান খাঁও এখন শান্ত। সে লেজ গুটিয়ে ঢুকে গেল।

আমিনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তুষ্টুরাম যখন খাঁচার দিকে চলেছে, নয়নতারা হাঁফাচ্ছিল। তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলাম বাইরে। বললাম 'একটুখানি শুয়ে পড়ো দিকি। খোলামেলায় থাকলে সেরে যাবে।' আমার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল। তেষ্টা পেয়েছিল খুবই। নয়নতারা শুলে একটুকরো পিচবোর্ড খুঁজে আনলাম তার তাঁবু থেকে। হাওয়া দিতে থাকলাম। দুর্গামোহন স্টেজে ম্যাজিক দেখাচ্ছে ওদিকে।

অনেকসময় ধরে শিথিলভাবে শুয়ে থাকল নয়নতারা। চোখদুটি বুঁজে রাখল। তারপর একসময় তাকাল।

হ্যাসাগের আলোটা একটু দূরে রয়েছে। আধো-আলোয় তার অর্ধস্ফুট ক্লান্ত ভীত মুখখানি করুণা ও মমতায় কাতর করে। আমি তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লাম, 'নয়ন, নয়ন!'

সে সাড়া দিল। মৃদু হাসি তার ঠোঁটের কোণে।

'কেমন বোধ করছো এখন?'

'ভালো।'

'আমিনাও আজ অমন করল কেন?'

'তারও ইচ্ছে।'

'কেন?'

আমাদের ওপর ছায়া। সংযতভাবে বসলাম। না তুষ্টুরাম নয়। সে এখন স্টেজে। সেই ছারপোকার গানটা গাইছে। ভীষণ হাসির শব্দ তার থেকে ভেসে আসছে। মিলিত কণ্ঠের ওই প্রকাণ্ড অট্টহাসি আমাদের এই নিভৃত ও তুচ্ছ সান্নিধ্যকে ব্যঙ্গ করছে যেন।

ডিব্বু এসে ডাকল 'মা!'

নয়নতারা হুড়মুড় করে উঠে বসল। 'কী রে সোনা?'

'কী হয়েছিল তোমার?' ডিব্বু তার কাঁধে হাত রাখল। তার মৃদু কণ্ঠস্বরে গভীর উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট।

নয়নতারা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'কিছু না তো!'

'তুমি নাকি মরে যাচ্ছিলে?'

'কে বললে?'

'চাপাটিদা।'

প্রশ্ন করলাম 'চাপাটিদাটা কে রে ডিব্বু?'

নয়নতারা বলল 'যে তোমার নাম রেখেছে বাঁশিবাবু।'

তোমার! আমি একটুও বিস্মিত হই নি। বিকেলে স্কুলের প্রাঙ্গণ থেকে যখন চাঁপাফুল তুলে এনে তার হাতে দিয়েছিলাম, তখনি একবার 'তুমি' বলেছিল নয়নতারা। এ-মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সে কথা। মনে পড়তেই তার খোঁপার দিকে তাকালাম। ফুলগুলি সেখানে রেখেছে সে।

ডিব্বু বলল, 'আজ ওরা রেগে আছে, আমি জানতাম।'

'সে কী রে!' নয়নতারা বিস্মিতভাবে তার মুখটা লক্ষ্য কবল। আমিও।

'তুষ্টুকা সন্ধে থেকে খোঁচাচ্ছিল। বলছিল....' ডিব্বু থামল।

'কী বলছিল?'

'কী জানি, কী সব কথা। আমি বুঝতে পারি না।' ডিব্বু হাতের চেটোয় নয়নতারা আঁচলের একটা প্রান্ত ঘষতে থাকল। 'তুষ্টুকাও রেগে আছে খুব।'

'ভারি আমার রাগ? কে ধারে!' নয়নতারা উঠে দাঁড়িয়ে বেশবাসটা ঠিক করে নিল। 'তুই শো গে যা ডিব্বু।'

ডিব্বু চলে গেলে বললাম, 'একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবে না তো নয়ন?'

'কী কথা?' মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল সে।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে আমি বললাম 'তুষ্টু হয়তো তোমার আমার মেলামেশাটা পছন্দ করে না।'

মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকল নয়নতারা। তাঁবুর দরজার পর্দায় হাত রেখে বলল 'তুমি পছন্দ করো তো? তা হলেই চলবে।'

রাতের কাণ্ডটা নিয়ে দুর্গামোহন একটা কিছু করে বসবে, এ ভয় আমার ছিল। সকালে ডিব্বুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। যখন ফিরে আসছি, পথে চাপাটির সঙ্গে দেখা। বাজার করে ফিরছিল সে। বড় বড় দাঁত বের করে হাসল। 'কী গো বাঁশিবাবু, ফুল আনতে গিয়েছিলেন বুঝি?

'তার মানে?'

চাপাটি পাশে পাশে চলতে থাকল। ওই ফুলফুল করে ফ্যাকড়া বেঁধেছে যে। তুষ্টুদা নয়নদিকে চোখ রাঙাচ্ছিল। কেউ তো কম যায় না। শেষটা চড় মেরে বসল নয়নদির গালে।'

'তুষ্টুরাম?' থমকে দাঁড়িয়েছি।

চাপাটি বলল, 'তা' পরে মালিকবাবু তুষ্টুকে অ্যায়সা মার মারলে এখন হাঁ করে পড়ে আছে দেখুন গে।'

দ্রুত তাঁবুতে ফিরে এসেছিলাম। দেখলাম নয়নতারা নিবিষ্ট মনে বসে সায়া সেলাই করছে। দুর্গামোহনকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। তুষ্টুরাম আমগাছের নীচে চুপচাপ শুয়ে আছে।

চাপাটি আমার গায়ে একটু খোঁচা মেরে তাকে দেখিয়ে চলে গেল। এই খোঁচাটায় কিছু অশ্লীলতা প্রচ্ছন্ন ছিল হয়তো। আমি চারপাশে লক্ষ্য করলাম, পার্টির লোকেরা আমার দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে। একটা গুরুতর দুষ্কর্ম ধরা পড়ার পর যেমন সংকোচে দীনতায় আড়ষ্ট হতে হয়, সেরূপ একটা অস্বস্তি আমাকে পীড়িত করছিল। এই লোকগুলির চোখে আমি আর চকবাজারের সেই আনন্দ হয়ে নেই। এখন আমি ভাগ্যঘরের মাতাল জুয়াড়িদের একজন—যারা পাশার ছকে নয়নতারাকেই জিতে নিতে চায়।

দুর্গামোহন ফিরল খানিক পরে। তার মুখ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে থমথম করছে। আমি অজ্ঞাত ত্রাসে গুটিয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে নিজের তাঁবুতে ঢুকলাম। আমার চলে যাবার সময় বুঝি এসে গেছে। এত দ্রুত সব ফুরিয়ে যাবে ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল।

শরীর গুরুভার, চোখে ঘুমের আচ্ছন্নতা, এক সময় কে স্পর্শ করল এসে। চোখ মেলে দেখি নয়নতারা। 'কী গো বাঁশিবালেবাবু, খাবে না?' হাসছিল সে।

উঠে বসলাম। চৈত্রের দুপুরে আমবাগানের নীচে ঘন ছায়ার বিস্তার। পাখির ডাক পাতার অন্তরালে। ওখানে উজ্জ্বল রৌদ্রে নির্জন মেলাটা ঝিমোচ্ছে স্তব্ধভাবে। গুটিকয় কুকুর বাতাসে ধাবমান উচ্ছিষ্ট শালপাতার পেছনে ছুটোছুটি করছে। মন্থর দুপুরের স্তব্ধতা ভেদ করে ওসমান খাঁ একবার গর্জন করে উঠল।

'তোমার আবার কী হ'ল?' নয়নতারা প্রশ্ন করল।

'নয়ন।'

'উঁ! খোঁপা খুলে বেণী থেকে চুলগুলি উন্মোচিত করছিল নয়নতারা! বিবর্ণ চাঁপাফুলগুলি ঝরে পড়ছিল আমার শয্যায়।

'এ বড় অন্যায় হচ্ছে। আমি চলে যাবো, সেই ভালো হবে।'

'কেন?'

'তুষ্টু একটা ভুল ধারণা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে।'

'ভুল?' চকবাজারে প্রথম যে পাথরের নয়নতারাকে দেখেছিলাম, এ মুখ তারই। 'নন্দ, তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো তো ভুল।'

আমার মুখ খুলে দিল তার এই স্পষ্ট প্রশ্ন। ক্ষিপ্তভাবে বললাম, 'তুমি যদি অন্য কিছু ভেবে থাকো, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি তোমার প্রেমে পড়ি নি নয়নতারা।'

নয়নতারা একটুও হাসল না। বলল, 'লোকে তো তা সত্যি বলে মানে!'

'মানুক যা খুশি তারা। আমি ভালোবাসি যাকে, সে অন্য মেয়ে।' এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে ভাবাবেগে একটা জটিল তত্ত্বের অবতারণা করতেও পরাঙ্মুখ হচ্ছিলাম না।

নয়নতারা বলল, 'সে কি আকাশ থেকে নেমে আসে নন্দ?'

'হ্যাঁ। সে আমার মনের সৃষ্টি।'

নয়নতারা আমার কথা ঠিক বুঝছে কি না টের পাচ্ছিলাম না। একসময় সে উঠে দাঁড়াল। বলল 'আমি একজনই নন্দ। তবু লোকে ভুল বোঝে। তুমি যাকে ভালোবাসো, তাকে আমিও চিনি। কিন্তু সে মিথ্যে। ভীষণ একটা মিথ্যে। ওই হতভাগাও একই রোগে ভুগছে। এত পেয়েও সে বলে, কিছু পাই নি।'

নয়নতারার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তার চোখ ছলছল করছিল। 'নন্দ, ও একটা নেশার পেছনে ছুটেছে। তুমিও। আমার দুঃখ হয় নন্দ তুমি শিক্ষিত মানুষ।'

মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম যেন। আমার ইচ্ছে করছিল মদের গেলাস থেমে চুমুক দিয়ে সবটুকু মদ পান করে আমি শান্ত হই। কিংবা একটা প্রচ্ছন্ন মঞ্চে এসবই ছিল একটি ছোট্ট নাটিকা। আমরা দুটিতে ভূমিকা গ্রহণ করেছি। নয়ন, চকবাজারে ত্রিলোচনের ঘরে বসে যখন গান গাইতাম, দেয়ালে ঝোলানো মেয়েদের ছবিগুলি দেখতে পেতাম। দেখতে দেখতে আমার মনের দেয়ালেও একজন এসে দাঁড়িয়েছিল। সে আমার খুবই চেনা।....'

চাপাটি এসে ডাকল। 'বাঁশিবাবু, মালিকবাবুর তলব হয়েছে গো।'

দুর্গামোহন স্নান করে এসে মোড়ায় বসেছিল। লুঙ্গি পরে খালি গায়ে একটা ভেজা তোয়ালে জড়িয়ে রেখেছিল। আমাকে দেখে বলল, নন্দও কি ওসমান খাঁর মতো খেপলে?'

'না। ঘুম পেয়েছিল।'

'যাও। স্নান করে এসো গে।'

দুর্গামোহন যেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল, ঠিক সেদিকেই গুটিগুটি পা ফেলে চললাম। বশীভূত জন্তুর মতো।

ভেবেছিলাম এ-রাতে খেলা ভালো জমবে না।

কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে ভুষ্টু-কথিত সেই 'বাকবাদিনী' নাচের মঞ্চে আবির্ভূত হ'ল। নয়নতারাকে এত বিমোহিনী কোনো রাতে দেখি নি। দেখি নি এত প্রগলভা উচ্ছলিতা উচ্ছ্বসিতা। তার দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ-বিভ্রম ছিল। তার অঙ্গসঞ্চালনে লীলামৃগয়ার পথে উত্তরণের ইঙ্গিত ছিল। হাসিতে শতবসন্তের রক্তিমতা ছিল উজ্জ্বল হয়ে।

পরপর দু'খানি ডুয়েট গাইলাম আমরা।

তারপর অত্যন্ত হঠাৎ ভুষ্টুরাম উন্মোচিত মঞ্চে একটা নাটকের অবতারণা করে বসল।

গান শেষ হবার আগে সে মঞ্চে ঢুকে চিৎকার করে বলল 'বাস, বাস। দেখুন, দেখুন এখানে কী হ'ল তবে। ওই একটা জওয়ান স্টেজে আসলো একটা জওয়ানী ভী আসলো। তারপর গাহনা হ'ল, নাচনা হ'ল। বসন্তবাহার রাগে আগুন জ্বালায়ে দিল আপনাদের দিলে। লেকিন, আমি এখন আসলাম। আমি কী করলো? আমি তো একটা গাদ্ধা আছি। গাদ্ধা কী করে? গাদ্ধাভী গানা করে। কী গান? না দুঃখুর গান। কেন দুঃখু? গত জন্মোতে ওটা আমার বহু ছিল ভাইরে....আমি গাদ্ধা হবো বলে আমাকে ছেড়ে দিলে.....আমার লেজে লাথি ভি মারলে.... লেকিন এটা আমার দোষ? বলুন তো আপনারা.....'

দর্শকেরা হাসিতে ভেঙে পড়ছে। হাততালি দিচ্ছে প্রচণ্ড শব্দে। আমি ও নয়নতারা স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি মঞ্চে। 'বন্ধুগণ!' গলা ঝেড়ে নিয়ে ফের শুরু করল ভুষ্টুরাম। 'আজ গাদ্ধাটা আপনাদের সামনে হাজির আছে। কথায় বলে দশ যেখানে ভগবানও

সেখানে। আপনারা দশ ভগবান। আপনারা জজের জজ.... সবসে বড়া জজ আছেন। বিচার তো করেন....'

ঈষৎ স্তব্ধতা তাঁবুর মধ্যে। তুষ্টুরামের কণ্ঠস্বর বারবার ভাঙাচোরা হয়ে যাচ্ছে। আমরা স্তম্ভিত।

'না। আপনারা পারবেন না। এ বিচার আমি নিজের হাতে করবো। কেমন করে দেখুন...'

অনেকদিন একটা নরম কাঠের বোর্ড দেখেছি স্টেজের নীচে পড়ে থাকতে। আগে নাকি ওটা নিয়ে একটা মারাত্মক খেলা দেখাত তুষ্টুরাম। দুর্গামোহন এই খেলাটা পছন্দ করত না একেবারে। কালক্রমে ওটা তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। অন্তত আমি কোনোদিন দেখি নি এই খেলা।

সেই বোর্ডটা ক্ষিপ্রহাতে স্টেজে তুলে এনে দাঁড় করাল তুষ্টুরাম। তারপর ফের সে উইংসের ভেতর থেকে একটা ছোট বাক্স এনে রাখল। বাক্সের ভেতর এক ডজনের বেশি টিনের ছুরি। ছুরিগুলি তুলে নিয়ে নয়নতারার হাত ধরে টানল সে। নয়নতারা ইতস্তত করছিল। চাপাস্বরে তুষ্টুরাম বলল 'আহা, দাঁড়াও না ওখানে। ভয় কেন?'

নয়নতারা আমার দিকে একবার তাকাল। তার চোখে ভয়ের চিহ্ন ছিল।

বোর্ডে পিঠ রেখে দাঁড়াতেই আমার হাত ধরে টানল তুষ্টুরাম। তার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে বলল 'চোখদুটো আচ্ছাসে বাঁধুন স্যার।'

চোখ বেঁধে দিলে তুষ্টুরাম জনতাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি তাহলে ওকে সাজা দিচ্ছি। আপনারা আঁখ খোলা রাখুন। আমার আঁখ বন্ধ রাখলাম। দেখুন, দেখুন....'

নয়নতারা পুতুলের মতো বোর্ডের এককোণে আঙুলের শব্দ করে দ্রুত হাত সরিয়ে নিল। অব্যর্থ লক্ষ্যে তুষ্টুরামের ছুরি সেখানে বিঁধেছে।

অতি শীঘ্র নয়নতারাকে ঘিরে ছুরিগুলি প্রতিমার চালচিত্রের মতো একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি পরিমণ্ডল রচনা করল। হাতে একটি মাত্র ছুরি অবশিষ্ট ছিল। তুষ্টুরাম ভীষণ জোরে হা হা করে হেসে উঠল এতক্ষণে। 'সবগুলো ফস্কে গেছে। ঔর একঠো হাতে রয়েছে। এ যদি ভুল করে, আমি একে আমার দিলে বিঁধিয়ে দেবো। কী বলেন আপনারা?'

কোনো প্রত্যুত্তর এলো না দর্শকদের মধ্য হতে। সকলে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে।

নয়নতারা কি মূর্ছা গেছে? চোখ বুঁজে রয়েছে তার। নিস্পন্দ হয়ে গেছে শরীর। আঙুলে শেষ শব্দ করছে না। তুষ্টুরাম ছুরিটা নাড়াচাড়া করছে।

নয়নতারার কোনো সাড়া নেই। তুষ্টু ছুরি তুলল। একটু পিছিয়ে গেল। তারপর হুড়মুড় করে দুর্গামোহন প্রবেশ করল মঞ্চে। ছুরিটা কেড়ে নিয়ে তার পশ্চাদ্দেশে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সজোরে লাথি মারল। তুষ্টুরাম ক্লাউনোচিত হাসছে।

দুর্গামোহন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'বন্ধুগণ, রাজা বেঁচে থাকতে প্রজার হাতে বিচারের ভার দেওয়া যায় কি? আমি সেই রাজা। ও ব্যাটা আমার ভাঁড়। ভাঁড়ের কাজ হচ্ছে ভাঁড়ামি করা।'

দর্শকেরা তুষ্টুরামের দশা দেখে হাসছিল।

দুর্গামোহন নয়নতারার হাত ধরে টেনে আনল মঞ্চের পুরোভাগে। আমার হাতে তার হাত মিলিয়ে দিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে রাজার বিচার।'

নাটক, না বাস্তব? দর্শকেরা অশ্লীলভাবে চিৎকার করে উঠল। উলুধ্বনি দিল কারা। কান পেতে শুনি, নয়নতারা গান ধরেছে এগারোর পর্দায়। মঞ্চ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলাম। আমার মাথা ঘুরছিল। মূর্ছার তরঙ্গ উঠছিল স্নায়ুদেশে।

ঘন অন্ধকারে আমবাগানের নীচে দাঁড়িয়ে আমি সব পূর্বাপর সাজিয়ে দেখছিলাম। আমার প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিল, হঠাৎ কখন তুষ্টুরাম সেই অ-নিক্ষিপ্ত ক্ষুধার্ত ছুরি হাতে ছুটে আসবে এখানে। তবু দাঁড়িয়ে থাকলাম। যেন আত্মগোপনের উপযুক্ত স্থান খুঁজছিলাম। আর সেই দুর্গম অন্ধকারের শেষপ্রান্তে বাঘটা থেকে থেকে ডেকে উঠছিল।

৬

ক'দিন পরে।

এ মেলার লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল। নতুন করে মেয়াদ না বাড়িয়ে নিলে শো বন্ধ রাখতে হয়। দুর্গামোহন খুব ভোরে শহরের দিকে চলে গিয়েছিল। সঙ্গে নিয়েছিল তুষ্টুরাম আর ডিব্বুকে। এবং যাবার সময় সকলকে বলে গিয়েছিল, বাঁশিবাবুর নির্দেশ যেন তারা মেনে চলে, তার অবর্তমানে বাঁশিবাবুই তাদের মালিক।

তারপর নয়নতারাকে বলেছিল, 'বেচারির কোনো অসুবিধে হয় না যেন। একটু দেখিস নয়ন।'

এ কথা বলার আবশ্যকতা কী, আমি জানতাম না। হয়তো নয়নতারাও না। রোদ উজ্জ্বল হয়ে উঠলে শুনি চাপাটি আমার নাম বদলে 'ছোটবাবু' করে দিয়েছে।

দুর্গামোহনের কারচুপিটা ধরা পড়েছিল পরে। সে আমায় একটু নিশ্চিন্তে সুযোগ করে দিয়েছে যেন। নয়নতারার সঙ্গে নিভৃতে ইচ্ছেমতো মেলামেশার সুযোগ। সে রাতের সেই কাণ্ডের পর নয়নতারাও ঈষৎ ঝিমিয়ে যাচ্ছিল। নাচগানের খুব একটা জমাটি আসছিল না। তুষ্টুরাম নেহাৎ কাজের কথা ছাড়া আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছিল না। আবহাওয়াটা কিছু মন্দা চলছিল। নয়নতারার আকর্ষণে যত নতুন ও আনকোরা লোক জুয়োয় বসবে, তত লাভ, তবু দর্শকদের আমরা কিছু টের পেতে দিই নি। মধ্যে-মধ্যে কেবল তুষ্টুরাম তার সঙের ছলে সব জানিয়ে দেবার তালে থেকেছে যেন। আর দুর্গামোহনের লাথি খেয়ে 'অঁক' করে বসে পড়েছে। লোকটাকে সে এত ভয় পায় কেন, আমি বুঝতে পারি নি।

নয়নতারা বলল, 'নন্দ, বাবুর কাণ্ডটা দেখছো?'

মাথা নেড়েছিলাম। 'দেখেছি।'

'লোকটা বুড়িয়ে যাচ্ছে তবু যেন নাবালক থেকে গেল।'

'কেন, নয়ন?'

'তোমায়-আমায় ভাব থাকলে কি সুযোগের পথ চেয়ে বসে থাকতে হয়? সুযোগ ঠিকই জুটে যায়।'

সকৌতুকে বললাম, 'ভাব নেই বলতে চাও?'

'তা আর নেই!' নয়ন হাসল। 'ভাবে ডুবে রয়েছি।'

এ সময় তাকে প্রগল্‌ভা ও চতুরা অভিনেত্রীর মতো দেখাচ্ছিল। গানের নয়নতারা এ নয়। কিংবা তুষ্টুরাম ক্লাউনের বাহুর নীচে মাথা যে-মেয়েটি শুয়ে থাকে, সেও ঠিক এ না। এ যেন ওই পাশার প্রান্তবর্তী বেশ্যাটা।

নাকি অ-ধরাকে যখন হাতের কাছে ধরা ছোঁয়ায় পেয়ে যাই, মনে হয় এ তো একটা বানানো পুতুল, সে কই? তবু আমরা দুর্গামোহনের অলিখিত নির্দেশ পালনে তৎপর হয়েছিলাম। তাঁবুর ভেতর কানামাছি খেলছিলাম। পরস্পর কাতুকুতু দিচ্ছিলাম। লুটোপুটি করছিলাম ছেলেমানুষের মতো। তারপর একসময় হারমোনিয়াম বের করে একটার পর একটা গান গেয়েছিলাম পালাক্রমে।

চাপাটি এসে বলেছিল, 'ছোটবাবু নাইবার সময় হ'ল।'

'ও নন্দ চলো—ওই দিঘিতে নেয়ে আসি দুজনে।'

'বেশ তো। চলো।'

অনেকদিন বন্ধ অন্ধকারে আঁকুপাঁকু করার পর হঠাৎ মুক্তির আলো হাওয়া গায়ে লেগেছে। কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। তুষ্টুরামের প্রতি একটুও ভয় অবশিষ্ট ছিল না। দুর্গামোহন আমার ঈশ্বর হয়ে মাথার উপর বিরাজ করছে। সেই ঈশ্বর আজ বলেছে, তোমাকে ছুটি দিলাম নন্দ— ভালোবাসার ছুটি।

চৈত্রের দুপুরে আমবাগানের ছায়ার বন্ধনহীন পাখির মতো ভেসে চলছিলাম।

'ও নন্দ, আমাকে ধরতে পারো?'

বিস্তৃত ছায়ার কেন্দ্রে সে মাঝে-মাঝে চোখের আড়ালে লুকিয়ে যেতে চাইছে। 'এই তো ধরেছি।'

শেষ প্রান্তে থেমে নয়নতারা বলল, 'এইটুকু অব্দি বেশ ভালো। নদীর স্রোতে ভেসে চলার মতো। কিন্তু ঘাটে ভিড়লেই কপালে চোট খেতে হয়।'

'তুমি খেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। এই যে'—কপালের দাগটা দেখাল সে।

'কে মেরেছিল?'

সকৌতুকে হেসে উঠল নয়নতারা। আমার ভালোবাসার পুরুষ। সে বলতো পাশার ছকে যাবে না, মদ খাবে না, কারুর গায়ে গা দেবে না'....দম নিয়ে ফের বলতে থাকল, ...'ঢলাঢলি করবে না, হাসবে না.....'

উচ্ছ্বসিত হাসিতে টলে টলে পড়ছিল সে।

একটু পরে আবার বলল, 'আচ্ছা নন্দ, তুমি তো অনেক লেখা পড়া জানো। বলো তো, আমার ভাগ্যের মালিক আমি, না ওই শয়তান জুয়াড়িটা?'

'নয়ন!' অস্ফুটভাবে চিৎকার করলাম। 'সে তোমার বাবার মতো। তোমাকে সে-ই মানুষ করেছে।'

আমবাগান এখানে শেষ হয়েছে। একপাশে কিছু চষা জমি—অন্যপাশে বনঝোপ আগাছায় ভরা নির্জন একটা মাঠ। আমার কথা শুনে নয়ন একটুখানি দাঁড়াল। ফের চলতে থাকল। সে কিছু বলছিল বিড়-বিড় করে।

বললাম—'ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? দিঘি তো এদিকে।'

জবাব না দিয়ে আরো খানিক চলে একটা হেলে পড়া গাছের নীচে ধুপ করে বসে পড়ল। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, নয়নের চোখ দুটি একটু ভেজা-ভেজা। 'কী

হয়েছে তোমার?' বিস্মিতভাবে না বলে পারলাম না এ কথা। সত্যি বলতে কি, আজ ছুটির দিনের মাধুর্যটিকে নিটোল রাখতে চেয়েছি—তখন হঠাৎ নয়নের এই দুঃখোচ্ছ্বাস বিরক্তির উদ্রেক করে।

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারছিল। বলল—'আজ আমারও ছুটির দিন, নন্দ। ইচ্ছা করে যা খুশি বলি, যা খুশি করি. ..অনেক দিনের জমানো কথা, অনেক না-করা কাজ.....'

নয়নের মুখ একটু লালচে দেখাচ্ছিল। কিন্তু গাঢ় ছায়ায় ডুবে থেকে তার শরীর যেন স্মৃতির শীতল জলে উত্তাপ নাশ করছে—সেই আরামে তার চোখ দুটি স্থির।

মুখোমুখি বসলাম। হাসিমুখে বললাম—'তোমার সব কথা ও কাজের পাশে আমি তাহলে সাক্ষী রইলুম, কী বলো? তুমি বলবে আমি শুনবো তুমি করবে আমি দেখবো।'

নয়ন একটু ঝুঁকে এলো আমার দিকে। ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আমায় পাহারা দিতে তোমাকে বলে গেছে বাবু না নন্দ?' তারপর সে হাসতে থাকল। 'যদি পালিয়ে টালিয়ে যাই.....'

'কী যে বলো!'

'বাবু আমার জন্যে একজন করে পুরুষ পাহারাদের রাখে, আমি বেশ বুঝি।'

'না। দুর্গাদা তোমাকে মেয়ের মতো স্নেহ করেন। মানুষও তো করেছেন তোমাকে।'

'মানুষ!'

ঘৃণা না ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গ না কৌতুক—অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল নয়ন। ফের বলল— 'অনেককেই বাবু এমনি করে মানুষ করেছে। ওই রঘু, কেষ্ট, চাপাটি—কে নয় নন্দ? তোমাকে কি মানুষ করছে না?'

হেসে বললাম—'তা করছে বইকি। 'তুষ্টুরামকেও হয়তো—'

'তাঁবুতে ভাগ্যের ঘরে যেখানে যত মানুষ এসে জড় হয়, সকলকেই ওই লোকটা ভগবানের মতো কোল দেয় আর মানুষ করে। আহা, অবতার একজন।' ঈষৎ মাথা দোলাল সে। চোখ বুজিয়ে রাখল কিছুক্ষণ। 'নন্দ, আমি তোমার মতো লেখাপড়া জানি নে-- কিন্তু অনেক ঘুরেছি, তোমার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ দেখেছি জীবনে। আমার মনে হয় কী জানো? আমরা সবাই হয়তো অমনি এক জুয়াড়ি ম্যাজিকওলার হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে বসে আছি। আমি কি ভুল বলছি, নন্দ?' নয়নতারা আমার অলক্ষ্যে দু-এক পাত্র মদ গিলেছে কিনা সন্দেহে আমি ওর একটু কাছ ঘেঁষে সরে গেলাম। ইচ্ছে করলে এ নির্জন বনভূমিতে তাকে চুমু খেতেও পারতাম—হয়তো সে আপত্তি করত না—কিন্তু যেরূপ গভীর আবেশে সে কথা বলছে, প্রায় সদ্য ধ্যানভঙ্গের পর সন্ন্যাসিনীর মতো। সুতরাং একটা পবিত্রতা যেন তাকে ঘিরে রাখছিল। আমি দ্বিধাভরে দু-একবার মদের গন্ধ শোঁকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম মাত্র।

'নন্দ, ওই বজ্জাত পাপী জুয়াড়ি আমার মাকেও নাকি মানুষ করেছিল। মা মরবার সময় আমাকে বলেছিল এ কথা। আমি তখন বারো বছরের মেয়ে....

নির্জন চৈত্রের দুপুরে বনভূমিতে ঘুঘুপাখির ডাক শুনতে শুনতে এক সময় যেন অনেক দূরে পুরোনো দিনের হাসি-কান্নাময় জীবনের প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলাম।

একটি বারো বছরের মেয়ের পায়ে ঘুঙুর বাজছিল ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম। পাশার ছকের মতো চিত্রিত রঙিন সতরঞ্চের ওপর নির্ভুল তালে পা ফেলে ফেলে নাচছিল নয়নতারা। মনোমোহিনী বাঈজীর মেয়ে।

সেদিন এ তাঁবুর জগৎ ছিল না। ছিল না পৃথিবীটা এতখানি ব্যাপকতা নিয়ে। লখনৌ শহরের অন্ধকার এক গলির প্রান্তে প্রাচীন কোঠাবাড়ির নিভৃত ঘরে সেই প্রথম জীবনের দিনগুলি সবে একটি দুটি পাপড়ি উন্মোচিত হচ্ছে— গন্ধ ছড়াচ্ছে চুপিচুপি। ক্ষুধার্ত চোখে শরাবি মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে— ওই ওসমান খাঁ বাঘের মতো।

কিন্তু শাসনের কমতি ছিল না। দুর্গামোহন তখনও পুরো জুয়াড়ি হয়ে ওঠে নি। সে তখন আসলে এক নামজাদা ওস্তাদ—লোকে বলতো ওস্তাদজি। মনোমোহিনীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে তাকে 'মোহন ওস্তাদ'ও বলতো অনেকে। কালক্রমে মোহন ওস্তাদ আর মোহিনী বাঈজী লখনৌয়ের সংগীতসমাজেও হয়তো স্থান করে নিতে পারতো—কিন্তু ওস্তাদেরও ওস্তাদ থাকে। মোহন ওস্তাদের সেই ওস্তাদ—যার নাম নিয়তি—যাকে লোকে বলে ভাগ্য—তার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন—লক্ষ্য ছিল অন্যখানে।

ছেলেবেলা থেকেই দুর্গামোহন জুয়াখেলায় আসক্ত। জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে সে দেশ ছেড়ে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু বন্ধুর অভাব তার কোনো খানেই হয়নি। মুখের গুণে বন্ধু সে পেয়েছে অনেক। জুয়ার নেশা যার রক্তে, অহরহ যার চলাফেরা জুয়াড়িদের ছকের আনাচে-কানাচে তার দোস্ত বন্ধু বলতে কাদের বোঝায়, সে তো জানা কথা। এবং এই বন্ধুদের সঙ্গ ধরেই সে বারবনিতাদের ঘরে পৌছেছিল। নরকের অবশিষ্ট অন্ধকার জগতে সে প্রবেশ করেছিল একদিন।

মনোমোহিনীর সঙ্গে পরিচয় এমনি করে। দুর্গামোহন—তখন মোহন—বলেছিল, 'এত সুন্দর তুমি গাইতে পারো, অথচ এই ভাগাড়ে পচে মরছো কেন মোহিনী!'

কেন? সে মুহূর্তে কথার জবাব দিতে পারে নি মনোমোহিনী। পরে কোনোদিন দিয়েছিল। বলেছিল—'কী করবো তবে? তোমার মতো আমিও যে নিজের জীবনকে নিয়ে জুয়া খেলেছি মোহন। আজও খেলছি। এ খেলার নেশা বড় কঠিন।'.....

দুর্গামোহন জানতে পেরেছিল মোহিনী বাঙালীর মেয়ে। এক মুসলমান ওস্তাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করে তার এই পরিণতি। সে বলেছিল--'তুমি মিথ্যা বলো নি মোহিনী। কিন্তু মনে রেখো দেবতারাও জুয়ো খেলেন। কে না খেলে! তবে কেউ খেলে হাড়ের গুটি নিয়ে পচা পাঁকের পাশে ছক পেতে, কেউ খেলে রাজপুরীতে সোনার গুটিতে। কেউ অন্ধকারে চুপিচুপি--কেউ ঝাড় বাতির আলোয়। আমি তোমায় আলোয় নিয়ে যাবো মোহিনী। তুমি যাবে?'

মোহিনী মোহিতা হয়েছিল। দুর্গামোহনের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে যেন একটি জাদুদণ্ড। তার চোখের দৃষ্টিতে যে আত্মবিশ্বাস, তা মানুষকে উদ্দীপ্ত করে সাহসী করে তোলে। তার মুখের একটি কথায় যেন নিমেষে আগুনের কুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া যায়। সে আরও বলেছিল --'মোহিনী, গান মানুষকে যে ঘরছাড়া করার একটা দারুণ কারচুপি, একথা তুমি আমি যেমন করে বুঝি, আর কেউ বোঝে না। গান যেন বাইরের একটা আলোর দুনিয়া। বুকে হাত দিয়ে বলো তো, তুমি কি চেয়েছিলে যে এই অজানা-অচেনা দেশে এমনি এক অন্ধকার গলিতে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকবে অন্য কারুর জন্যে—যাকে তুমি ঘৃণা করো। চাওনি। চেয়েছিলে অন্য কিছু—সহজ কোনো পাওনা। কেন না, তোমার ভালোবাসা ছিল

সহজ। আকাশের রঙ যেমন নীল—তোমার ভালোবাসাও তোমার রঙ। এ অব্দি হিসেব করে দেখলে কোনো অন্যায় নেই তোমার। অথচ সব সহজকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল তোমরা গান। তুমি যাকে ভালোবাসলে, তাকে আসলে গানের ওস্তাদ বলেই ভালোবাসলে। নয় কি?'

মোহিনী অস্ফুটকণ্ঠে বলেছিল—'কী জানি!'

দুর্গামোহন তার জানুতে থাপ্পড় মেরে বলেছিল—'আলবাৎ! মানুষ ভালোবাসার ব্যাপারে একটা অজুহাত খোঁজে। আমি বলি, শেষে একদিন—ওই অজুহাতটাই তার ভালোবাসার কাল হয়ে ওঠে।'

সত্যি, গান যেন বাইরের এক আলোর দুনিয়া।

সেই দুনিয়ায় নতুন জীবন শুরু হলো মনোমোহিনীর। মোহিনী বাঈজীর রূপ আর কণ্ঠের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। তারপর একদিন দেখা গেল দুর্গামোহন গানের আসরের শেষে হারমোনিয়াম ঠেলে সরিয়ে রেখে পাশার ছক বিছিয়ে দিচ্ছে। হাড়েব গুটি ছড়িয়ে পড়ছে প্রেতের অট্টহাসির মতো নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশে।

মোহিনীর হাতে মদের গেলাস গুঁজে দিয়ে সে ফিসফিস করে বলে উঠল— 'নতুন খেলা শুরু হলো মোহিনী, তোমার মদত ছাড়া সবই ভুল হয়ে যাবে।'

মোহিনী প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিল। সে ভেবেছিল—শহরের অন্যান্য নাম করা বাঈজীদের মতো সেও লক্ষপতি আমীর-ওমরার মুখোমুখি নাচবে-গাইবে—বখশিশ কুড়োবে। কিন্তু মোহন-ওস্তাদ তাকে এ কোন পথে নিয়ে এলো। এ যে সেই বেশ্যা জীবনেরই উলটো পিঠ।

দীর্ঘকাল পরে বারো বছরের মেয়ে নয়নতারাকে নাচ শেখাতে গিয়ে মোহিনী তাই একদিন হঠাৎ যেন নিজের জীবনকেই প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছিল মেয়ের জীবনে। সে তখনই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল ফরাসের ওপর। আর সে মূর্ছা ভাঙে নি।

বারো বছরের নয়নতারা মাতাল জুয়াড়িদের ঠোঁটে মদের পেয়ালা তুলে ধরছে। সে ভাবতো, এই তার কাজ জীবনে। এর জন্যই সংসারে তার জন্ম। বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মতো সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল তার কাছে এই পরিবেশের সুখ-দুঃখগুলি।

কিন্তু শাসন ছিল দুর্গামোহনের। একটা অলিখিত সীমারেখা ছিল কঠোরভাবে দাঁড় করানো। সবসময় তাকে চোখে চোখে রেখেছে দুর্গামোহন। নিভৃতে কারও সঙ্গে মিশতে দেয় নি। বাইরে গেলে, সে নিজে তার সঙ্গে গেছে। আর, ছেলেবেলা থেকেই তো এমনি করে তাকে কোলে বা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো দুর্গামোহন। এমন কি হাঁটু গেড়ে ঘোড়া-ঘোড়াও খেলতো তাকে পিঠে নিয়ে। নয়নতারা কাঁদলে সে গল্প শোনাতো। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করতো না কোনোদিন।

কেন এত স্নেহ শাসন চোখে চোখে রাখা? বুঝি তার মনে ভয় ছিল মোহিনী মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাবে তার হাত থেকে।

সাবালিকা হয়ে নয়নতারার এই সন্দেহটা প্রথম দানা বাঁধে মনে। বয়সের ধর্ম যখন প্রকট হয়েছে ভালো-মন্দ সত্যাসত্য বোধের গভীর ইন্দ্রিয়টা বুঝি দুয়ার খুলেছে নিঃশব্দে। সে টের পাচ্ছিল—দুর্গামোহন তাকে সারাজীবন যেন অবিশ্বাস করেছে।

কাকে এই অবিশ্বাস? নয়ন একটু করে বুঝতে পারছিল। সেও তার নিজের মধ্যিখানে কাকে দেখতে পাচ্ছিল—সে অন্য সুরে কথা বলে চুপি-চুপি। সে বলে অন্য আকাশ অন্য সব পৃথিবীর কথা। দোতলার জানালার পাশে বসে নিঃসীম নীল আকাশের প্রান্তে-প্রান্তে যে বিস্তৃত পৃথিবী—অসংখ্য মানুষ ও জীবনযাত্রা—তাদের সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে নয়নতারা ছটফট করে মরছিল। দুর্গামোহন এসে দেখতে পেত চুপিসারে। নিঃশব্দে পা টিপে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর হঠাৎ বলত— 'কী দেখছিস রে নয়ন?'

ধরা পড়ার অস্বস্তিতে চমকে উঠত নয়নতারা। হুড়মুড় করে বসত ঘুরে সে। আমতা হাসত। 'কিছু না বাবু, কিছু না।'

পিঠে হাত রাখত দুর্গামোহন— 'মন খারাপ করছে নাকি রে?'

নয়ন হেসে ফেলত—'ধ্যেৎ। তা কেন?'

মাথায় গাল রেখে দুর্গামোহন বলত—'খুব একঘেয়ে লাগছে, না রে? আয়, একটু আসব পেতে বসি।' একদিন হঠাৎ আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারে নি নয়নতারা। হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। সে যেন ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছিল 'বাবু'কে। বলতে চেয়েছিল— 'আমাকে আর ভালো লাগে না এ সব.....দোহাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—অন্য কোথাও নিয়ে চলো... '

'তোর মায়ের জন্যে মন খারাপ করছে নয়ন?'

'কী জানি। আমাকে কিছু ভালো লাগে না বাবু।'

'কী ভালো লাগে তোর?' দুর্গামোহন যেন হতাশভাবে ধুপ করে নগ্ন মেঝেয় বসে পড়েছিল। তার নিষ্পলক চোখের দৃষ্টিতে সম্ভবত কোনো অসহায়তা প্রকট হয়েছিল সেদিন। নিরুত্তরা নয়নের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ফের সে প্রশ্ন করেছিল— 'আমি তোর বাবার মতো, লুকোস নে মা।'

'বাবার মতো!' আজ কথাটা ভাবলে হাসি পায় যত, ঘৃণাও জাগে ততখানি। অথচ সেদিন সত্যি-সত্যি বিহ্বল হয়েছিল নয়ন। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুর্গামোহনের বুকে। অবরোধহীন কান্নার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ছিল সে। তবু স্পষ্ট করে বলতে পারে নি কী তার ভালো লাগে।

সোনারওয়ালি গলির সেই পুরোনো ভুতুড়ে কোঠাবাড়িতে সেদিন সন্ধ্যায় আর মজলিশ বসে নি গানের। বন্ধ দরজায় নিষ্ফল কড়া নেড়ে ফিরে গিয়েছিল মাতাল জুয়াড়ি আমীর-ওমরা আর তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা। অশ্লীল চিৎকার করে স্খলিতকণ্ঠে দুর্গামোহনকে শাসিয়েছিল কেউ কেউ। মোহন ওস্তাদের জলসা বন্ধ হলে তাদের জীবনে সকল দরজা বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। উঁকি মেরে দৃশ্যগুলি দেখছিল তবলচি পিয়ারচাঁদ, রাঁধুনি বুড়ি নান্নু মা। তারা দুটিতে এ শহরে অনেকদিনের বাসিন্দা। গলি সোনারওয়ালির হালচাল ও মেজাজ তাদের তাই অজানা ছিল না। দুর্গামোহনকে বলেছিল—'বহত খারাবি হো যায়গি ওস্তাদজি, ইয়ে ঠিক নেহি...'

দুর্গামোহন ধমক দিয়েছিল—'কৌন হ্যায় মেরা জিন্দেগিকা মালিক? উওলোক তো নেহি। হাম আপনা হাতসে জিন্দেগিকা মওকা হাসিল করতা, ঔর কই নেহি।'

'ইয়ে তো ঠিক বাত হ্যায়। লেকিন ওস্তাদজি, ইয়ে মহল্লাকা বহত বদনাম হ্যায়—ইস লিয়ে আপকো সমঝ করনা লাগে.....।'

সমঝ দুর্গামোহনকে কে দিতে পারে। সে সারাজীবন নিজেই নিজের নিয়তি—কালপুরুষের মতো অবিচল সেই লোকটি কী সমঝ করে আসর বন্ধ রাখল, তা আজও জানার কোনো উপায় নেই। এদিকে নয়ন হঠাৎ যেন বদলে গেছে। নান্নু মা বুড়ির কাছে রান্নাশালার বসে বসে গল্প করছে। বাংলাদেশের গল্প— যে গল্প দিনের পর দিন মা তাকে শুনিয়েছিল। বলেছিল—'এখনও মনে আশা ছাড়ি নি আমি। অদৃষ্টে কী আছে জানি নে চেষ্টা তো করবো!' এবং শুনতে শনতে নয়ন বলে উঠতো—'অদৃষ্ট না ছাই। তুমি, দেখে নিও মা, আমি বড় হলে কিন্তু আর এখানে থাকছি নে।' কেন বলতো, তা কি জানে সে? শুধু তার মনে হতো—সেখানে গেলে যেন তাকে আর চোখে-চোখে রাখার মতো কেউ টিকে থাকতে পারে না; কারণ আকাশ ও পৃথিবী সেখানে অন্যরকম—এখানকার মতো এত ছোট্টটি নয়। এত গোলমালে উত্তেজনায় ভরা নয়। বরং শান্ত আর নির্জন। সেখানে বুঝি দুর্গামোহনও অন্যরকম মানুষ হয়ে উঠবে। সেখানে হয়তো অবলীলাক্রমে বাইরে ঘোরাঘুরি চলে— পাহারা দেবার কেউ থাকে না।

মা তাকে সম্ভবত এরূপ ধারণা দিয়েছিল ক্রমে ক্রমে। আর এই গল্প শুনতে শুনতে বুড়ি নান্নু মা বলে উঠেছিল— 'বাংলা মুলুক আচ্ছা হ্যায়—বেটি—সব মুলুকসে আচ্ছা, হাম জানতি হ্যায়। হাম পুরা এক সাল থী উঁহা। মেরি বেটি হ্যায় কলকাত্তামে!'

দুর্গামোহনের মতলব না জেনেও নয়ন বলেছিল—'ব্যাস, তব তো তুমকোভি লেনে পড়েগা মেরি সাথ......' আশ্চর্য, কত রাতে ক্লান্ত শরীরে শয্যায় শুয়ে পড়ার পর অতন্দ্র জেগে নয়ন তার মায়ের দেশের সরল সুন্দর হৃদয়বান মানুষগুলির কথা ভেবেছে। তারপর ভাবতে ভাবতে একসময় স্বপ্নের মধ্যে অবিকল প্রত্যক্ষ করেছে তাদের। খাপছাড়া অদ্ভুত সব দৃশ্য, দেবদেবীদের মতো সুন্দর সব মানুষ, নয়ন তাদের গান শোনাচ্ছে, তারা হাততালি দিচ্ছে,.....

'বেটি নয়নতারা!' হঠাৎ ফিসফিস করে উঠছিল নান্নু মা। 'ওস্তাদজিকো বোলনা নেহি ইয়েঁ বাত ...'

নয়ন হাসি চেপে তাকিয়েছিল বুড়ির দিকে।

'মুলুকমে যানা তো আচ্ছা হ্যায়.....বেটি, লেকিন এক সাচ বাত সমঝ দেতি হ্যায় তুমকো....'

'ক্যা বাত আম্মি?'

'নাচনা গাহনা সব ছোড়কে এক আচ্ছা লেড়কা কা সাথ মিল যাও।'

পরামর্শটা বড় মজার। খিলখিল করে হেসে উঠেছিল নয়ন। নান্নু মা বুড়ি তাকে সাদির কথা সমঝে দিচ্ছিল। সাদি......সাদি কী? তার মা অনেক সময় এই রকম কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যেত। সাদি সম্পর্কে কিছু গোপন সাধ ছিল যেন তার। সোনারওয়ালি গলির এই ছাদে বসে নীচের পথে অনেক সাদির মিছিল সেও দেখেছে। নহবতে সানাইয়ের করুণ মূর্ছনা আপ্লুত করেছে নয়নকে। সাদির দুলহন আর রাজপুরুষবেশী নওশার দৃশ্য তাকে কী যেন গভীর সুখ ও কৌতুহলে আবিষ্ট করেছে। এবং ঠিক তখনই আশেপাশে বা পেছনে দুর্গামোহনের কণ্ঠস্বর— 'ওখানে কী হচ্ছে রে নয়ন? চল, একটুখানি আসর পেতে বসি।' সানাইয়ে পূরবী শেষ হতে-হতে এখানে শুরু হয়েছে ইমন। আলো জ্বলেছে ধূসর ঘরের আচ্ছন্নতায়। বাগেশ্রীতে চলে গেছে মোহন ওস্তাদ। মালকোষের দ্রুত ঝংকারে নয়ন হয়ে উঠেছে চঞ্চল উচ্ছ্বসিত। বঙ্কিমময়ী। তারপর কখন মধ্যযামের নিঃঝুম

পরিবেশে, সব খেলোয়াড় একে-একে চলে গেল, ক্লান্ত নর্তকী নয়ন আবার কান পেতেছে। নওশা দুলহনকে ঘুম পাড়াচ্ছে খাম্বাজ। আবার কখন ভোরের ধূসর আকাশের নীচে ভৈরোঁতে তান দিল দরদী সানাইদার—নয়ন অস্থির, উদভ্রান্ত কাতর। জাগো.....মোহন প্যারে.....জাগো......

সারাটি রাত জেগে ছিল দুলহন। রাজপুরুষ নওশার শিয়রে বসে এখন চুপি চুপি তার কপাল স্পর্শ করে বলছে—জাগো হে সুন্দর ভালোবাসার পুরুষ...।

ভালোবাসা—প্যার—মহব্বত। এগুলি কী? যেন অপার্থিব কোনো সম্পদ—পেতে হলে একটা রক্তক্ষয়ী সাধনার প্রয়োজন।

কিন্তু কে তাকে ভালোবাসবে? কে তাকে বলবে—আমি তোমায় প্যার করি, তুমি আমার মহব্বতের দুলারী। মোহন ওস্তাদের আখড়ায় অনেক তরুণ এসেছে। দুহাতে মুঠো মুঠো টাকা তারা ছুঁড়ে মেরেছে নয়নতারার শরীর লক্ষ্য করে। তাদের একজনও বলতে পারত!

পারে নি। হয়তো মোহন ওস্তাদের ভয়ে।

কিন্তু মানুষের চোখ তো সকল ভয়ের পাহারা এড়িয়ে হৃদয়ে পৌঁছতে পারে। নাঃ, আশা করার মতো কিছু ছিল না। ওরা আসলে হাড়ে হাড়ে রাক্ষুসে ক্ষুধা পোষণ করে—যে ক্ষুধা টাকার, যে ক্ষুধা রক্তমাংসের। এক জোয়ান আমীর তার হাত চেপে ধরেছিল একদিন। দুর্গামোহন তখন জুয়োর ছকে মগ্ন। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল নয়ন। আর সেই অবসরে সে তাকে বলেছিল— 'হাম প্যার মাঙতা...'

ঠাস করে এক চড় কষে মেরেছিল বারো বছরের নয়নতারা। আসরের মধ্য দিয়ে পুরুষদের সঙ্গে অবিরত তার এমনি মেলামেশা। সাহস ও পেকে ওঠার পক্ষে এ অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক ছিল।

বুড়ি নান্নু মা'র পরামর্শ শুনে প্রথমে হাসলেও পরে শিউরে উঠেছিল নয়নতারা। যে সংগুপ্ত আগুনের কণা তার মর্মে জ্বলজ্বল করে যন্ত্রণা দিচ্ছে, তা যেন পরোক্ষে ধরা পড়ে গেছে অন্যের কাছে। নাচনা গাহনা খুব খারাপ কাম, জিন্দেগিকে সে কেবল বেহুঁশ করে রাখে। দুষ্টু ছেলেকে যেমন আফিম দিয়ে ঘুম পাড়ানো। লেকিন, বেহুঁশী তো জিন্দেগিকে সাচ বাত ছুপা রাখে—প্রকাশ হতে দ্যায় না। সাচ বাত হচ্ছে আরো হাজার-হাজার মানুষ যেভাবে ঘরকন্না করছে। সুখেদুঃখে তারাও কি দুর্গামোহনের মতো জিন্দেগির মওকা হাসিল কবছে না? আলবাৎ করছে। বেটি নয়ন, হাজার মরদের শরাবি আঁখোর খোরাক না হয়ে একজনের মুখোমুখি দিনগুজরান ভগবানের ভি হুকুম। ভগবান ঔরতকে বলেছেন একজনের সোপর্দ হয়ে থাকো—সে তোমার জিম্মাদার। আর একমাত্র সে-ই বলার হিম্মত রাখে— 'হাম প্যার মাঙতা.....'

কিন্তু কীভাবে নয়নের পক্ষে তা সম্ভব? দুর্গামোহন যে তার কয়েদখানা।

নান্নু মা বুড়িও তা বোঝে। সে তখন আরও চুপিচুপি বলেছিল— 'ভাগ যাও, ভাগনেকা কোশিশ করো উনহিকা হাত ছোড়কে। বেটি, কয়েদখানাকি কয়েদি বন গেয়ি হো তুম, ইয়ে ঠিক নেহি।'

কয়েদখানার কয়েদি? নয়ন বিমর্ষভাবে সরে এসেছিল। দুর্গামোহন একা আসরের ঘরে বসেছিল অন্ধকারে। সাড়া দিয়ে বলেছিল—'এদিকে শোন একটু।'

'আলো জ্বালো নি কেন বাবু?'

'থাক।'

কাছে যেতেই দুর্গামোহন বলেছিল— 'আমি এখনই সব ছেড়ে দিতে পারি মা, কিন্তু আমার যে অনেক দেনা আছে। কী করি বল দিকি?'

কী করা উচিত, নয়ন কি তা বলতে পারে? এ বড় হাস্যকর প্রশ্ন বাবুর। দীর্ঘ নীরবতার পর সে জবাব দিয়েছিল—'ছাড়তে আমি তো বলি নি।'

মুহূর্তে বদলে গেল দুর্গামোহন। অন্ধকারে খুলে রাখা হারমোনিয়াম এর বেলো বন্ধ করল সে সবগুলি রীডে চাপ দিয়ে। বাঘের মতো গর্জন করে উঠল যন্ত্রটা। 'চালাকি করিস নে নয়ন, আমি বেশ বুঝেছি, তুই কী চাস।'

ক্ষুব্ধ নয়ন বলে উঠল— 'কী চাই আমি?'

'ভালোবাসার পুরুষ।'

'বাবু।'

'হ্যাঁ—তোকে একটা ভালোবাসার পুরুষ দিতে হবে—নইলে তুই আমাকে ডোবাবি।'

জীবনে সেই প্রথম দুর্গামোহন নয়নতারাকে 'একটি ভালোবাসার পুরুষ দেবার' ব্যাপারটা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছিল।

মানুষের অনেক দিকে কিছু বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকে— যা আসলে জেদ ছাড়া কিছু নয়। দুর্গামোহন জুয়াড়ি তার সম্পর্কে ওই একটি ধারণাই পোষণ করে—আজও নয়ন তা দেখেছে। এই তুলনাহীন ভুলের—অন্যের ভুলের গর্তে অসহায়ভাবে পড়ে থাকা যে কী মারাত্মক কেউ কি জানে?

জিন্দেগির মওকা হাসিল করতে গিয়ে সেদিন কিন্তু বিপন্ন হয়ে পড়েছিল দুর্গামোহন। নিজের শক্তি বা অধিকারবোধ সম্পর্কে ধারণায় যেন চিড় খেয়েছিল একবার। ঘরে আলো জ্বলেছিল। পিয়ারচাঁদ তবলচি এসে বসেছিল নিজ জায়গায়। সালোয়ার-ওড়না সেজেগুজে নিপুণা নটী নয়ন হাঁটু দুমড়ে সুমুখে বসে ছিল ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। নিজের হাতে বাইরের দরজা খুলে দিয়ে এসেছিল সে।

'তখন মধ্যরাত।

কিন্তু কেউ আর আসে নি আসরে। হয়তো অন্য কোনো আড্ডায় জমে উঠেছিল তারা। আসলে ওই লোকগুলি মাছি ছাড়া তো কিছু নয়—যেখানে আবর্জনা যত আঠালো, সেখানে এঁটে যেতেই পছন্দ করে। এবং দুর্গামোহনও তখন আস্তে আস্তে একটা প্রকাণ্ড ভুলকে উম্মোচিত হতে দেখেছিল বুঝি। সে নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে নয়নের কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করছিল। তারপর গেলাসের পর গেলাস মদ খাচ্ছিল রাক্ষসের মতো। একসময় সে যথার্থ রাক্ষসের মূর্তিতে লাল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নয়নকে। গর্জে উঠল—'হারামজাদি, আমায় ডাহা ঠকিয়েছে রে প্যারীচাঁদ, বুঝলি? দারুণ জুয়ো খেলেছে শয়তানীটা!'

সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। 'আমার হার হয়ে গেছে এতদিন। ওরে প্যারীচাঁদ, টবে ফুল ফুটিয়ে ভোমরা জোটাচ্ছি ঘরে—কিন্তু মধু না পেলে ব্যাটা ভোমরারা তো চটে লাল হবেই.....'অসংলগ্নকণ্ঠে অশ্লীল চিৎকার করে সে বলতে লাগল—'চালাকি ধরা পড়ে গেছে ওদের কাছে—আর কেউ আসবে না রে প্যারী, কেউ আসবে না। আমারই ভুল হয়ে গেছে শালা. ..কে ওটা—ওই ছুঁড়িটা আমার কে, অ্যাঁ? কেন তার যৌবনের জিম্মাদার

সেজে চুপচাপ বসে আছি রে? বেচবার মাল, চাকু দিয়ে কেটে কেটে বেচবো.....লে লে বাবু ছে-ছে আনা.....চাখবে আর ফের ছুটে আসবে.... লে লে ছোঁড়ারা... লে লে ছে-ছে আনা....'

উদ্দাম কুৎসিত কণ্ঠস্বরে ঘরখানা যেন ভেঙে যাবে মনে হচ্ছিল। নয়ন কাঠ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে।

পরের সন্ধ্যায় ফের আসর বসল।

প্রতি মুহূর্তে নয়ন আশা করছিল বাবু তাকে কারো সঙ্গে নিভৃত ঘরের দিকে চলে যেতে ইঙ্গিত দেবে। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে এই দারুণ আক্রমণের উৎকণ্ঠায় এত ব্যস্ত রাখছিল যে তাল কেটে যাচ্ছিল বারবার। সে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংবরণ করছিল।

সে এক অমানুষিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ। শেষে জয়ী হলো নটী নয়ন। নির্ভুল তালে পা ফেলে অপরূপ নাচল সে। তারপর ক্লান্ত হয়ে বসল ফরাসের ওপর। জুয়ার ছক খুলতে গিয়ে দুর্গামোহন হঠাৎ আড়চোখে এদিকে তাকাতেই নয়নের চোখে চোখ পড়ে গেল তার।

নয়নের চোখে কী ছিল সে মুহূর্তে কে জানে, আড়ষ্টভাবে আড়-মোড়া দিয়ে হাই তুলে দুর্গামোহন বলেছিল— 'আজ ইহাঁসে খেল খতম মেরে দোস্ত ....ফির কালসে শুরু হোগা!'

রুখে দাঁড়িয়েছিল জুয়াড়ি রসিকগুলি। 'নেহি, কভি নেহি! দেখিয়ে না, আজ পকেটকা মেজাজ বহত আচ্ছা.....'পকেটের দিকে তাকায় নি দুর্গামোহন। ওরা কেটে পড়ছে না দেখে অবশেষে সে ছোরা বের করেছিল আচম্বিতে। গুণ্ডার রাজা মোহন ওস্তাদকে সোনারওয়ালি গলির মহল্লার কে না ভয়-সমীহ করে।'

তারপর রাতে নয়ন একা শুয়ে আছে তার ঘরে। বন্ধ দরজায় ডাক এসেছিল— 'নয়ন, মা নয়নমণি!'

'বাবু!' দরজা খুলে দিয়েছিল নয়ন সঙ্গে সঙ্গে।

দুর্গামোহনের হাতে প্রকাণ্ড একটা সুটকেস। সে বলেছিল— 'সব-কিছু নেবার দরকার নেই, তোর সুটকেসে যতগুলো ধরে, ভরে নে। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বো।'

বিস্মিতা নয়ন একটু চিৎকার করেছিল—'সে কী? কোথায়?'

'দেশে। আমাকেও আর ভালো লাগছে না কিছু। আমিও তোর মতো হাঁফিয়ে উঠেছি মা।'

'বাবু...'

'কথা বলার সময় নেই। তাড়াতাড়ি কর।'

যাবার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নয়ন বলেছিল— 'হারমোনিয়ামটা!'

'থাক।'

নয়ন ব্যাকুলকণ্ঠে বলেছিল—'বাবু, দোহাই বাবু, ওটা আমার মায়ের জিনিস....।' সে কাঁদছিল।

স্টেশনের পথে যখন দুটিতে ঘোড়ারগাড়ির খোঁজ করছে—দেখলে হাসি পায়, অত বড় ভারি হারমোনিয়ামটা দুর্গামোহনের মাথায়, হাতে তেমনি প্রকাণ্ড সুটকেস।

পরের রাতে ট্রেন বদলে অন্য ট্রেনে চেপে একেবারে মল্লারপুর।

৭

দুর্গামোহন বলেছিল, 'আমার অনেক দেনা আছে রে নয়ন'—কিন্তু দেশে ফিরে নয়ন দেখেছিল পুঁজিও তার বড় কম নেই। তার মানে, সে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়েছিল পাওনাদারদের হাত থেকে। নয়ন ভেবেছিল—বাবু তার জন্যই বুঝি দেশে চলে এলো। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছিল তার মন। পরে আস্তে আস্তে সে ভুল ভেঙেছিল। কয়েক মাসের নীরবতার পর দুর্গামোহন আবার তার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ইতিমধ্যে নতুন একটা দালানবাড়ি বানিয়েছিল সে। সেই বাড়িতে নিয়মিত গানবাজনার আসর শুরু হয়েছিল। নয়ন ভেবেছিল— 'গানের নেশা যার হাড়ে হাড়ে, সে গান ছেড়ে বাঁচবে কী করে? এবং ততদিনে নয়নেরও যেন মনে হচ্ছিল--ওই একটি পরিচয়চিহ্ন ছাড়া জীবনে তার নিজেরও বাঁচার ব্যাপারটা অর্থহীন হয়ে ওঠে। আসলে সব মানুষের জন্যে হয়তো একটি করে ছাড়পত্র দেওয়া হয় এমনি করে। মোহিনী বাঈজীর নাম লেখা পুরোনো হারমোনিয়ামটা কয়েকটি সুরঝংকারেই নয়নের ভেতর দিকের সেই নটী মেয়েটিকে জাগিয়ে তুলল। তখন নয়ন কী করে! রোমাঞ্চিত দেহে আবেগ বিহ্বল মনে সে দ্রুত পায়ে নূপুর বেঁধেছিল। বলেছিল— 'ও বাবু, একজন আচ্ছা তবলচি চাই যে আমার!'

চতুর দুর্গামোহন হেসে উঠেছিল তার কাণ্ড দেখে। 'বেটি নয়ন, এ যে বাংলাদেশ--লোকে দোষ দেবে!'

নয়ন তীব্র কটাক্ষ হেনে বলেছিল—'দিক দোষ। আমার খুশি—নাচবো, গাইবো....।'

'মা নয়নমণি, তোর বিয়ে দেব ভেবেছিলাম—শ্বশুরপক্ষ শুনলে যে চটে যাবে। বলবে বাঈজী মেয়ে।'

'বাজে কথা রাখো, আমার তবলচি চাই-ই!'

'নয়নতারা, নাচ-গান তো ঘরের জন্যে নয়—এ পরের জন্যে, বাইরের দুনিয়ার জন্যে। কী দাম পাবি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেচে--যদি না সমঝদার দেখনেওয়ালা কেউ না থাকে?'

নয়ন সত্যিসত্যি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই তো! সমঝদার চাই, দেখনেওয়ালা চাই—বখশিশ না দিক, তালের সম-ফাঁকের মাথায় 'কেয়াবাৎ' 'বহুত আচ্ছা' মারহাবা' ধ্বনি উচ্চারিত না হলে দেহকে দেহের অধিক মনে হয় না তো! মনে হয় না জন্মকাল থেকে পাষাণ খণ্ডের মতো যে বোঝা বহন করছি—যার ক্ষুধা আছে তৃষ্ণা আছে— আছে আধিব্যাধির দায়—তার থেকে আমি মুক্ত। এবং নাচের গভীরতম স্তরে পৌঁছে নয়ন যে জ্যোতি যে অপার্থিব অলৌকিক বহ্নিদ্যুতিকে অনুভব করে—তার মধ্যে লীন হয়ে যায় তার সত্তা, তাকে মেলে না তো। সে বিহ্বলভাবে বলেছিল— 'বাবু তা হলে কী হবে!'

কী হবে; তা ঠিক করাই ছিল। দুর্গামোহনের জাদুর কারচুপি আজকের মতো তখন টের পায় নি নয়ন। দুর্গামোহন সব আয়োজন গোপনে সম্পূর্ণ করে শুধু নয়নতারার মনের গতিটা একটু ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল ওই দিকে। তাই সে নিপুণ সাপুড়ের মতো বাঁশি বাজাচ্ছিল যেন। তার মতো করে নয়নকে আর কে চেনে।

ছোট্ট একটা শহর মল্লারপুর। যাকে বলা যায় গ্রামনগরী। আসলে পুরোনোকালের একটা গ্রামীণ বাজার বা হাটতলার পাশ দিয়ে রেলপথ গড়ে উঠালে যা হয়। দিনে দিনে

সেখানে কিছু ছোট কল-কারখানাও গড়ে উঠেছিল। এবং এ সব গ্রামনগরীর যা আবহাওয়া, তাতে আলোয়-আঁধারে মেশা পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাস করা সহজ ও শোভন একান্তভাবে। কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য—মাঝে মাঝে তাও স্বভাবত বাছাই করা মুশকিল এইসব আবহাওয়ায়। ভালোকে মনে হয় মন্দ, মন্দকে ভালো—তাই সবকিছুই দ্বিধাহীন নির্বিকার গতিতে চলে। দুর্গামোহন তার জীবনের নতুন জয়যাত্রা এমনি জায়গা থেকে শুরু করল অবশেষে। নয়ন জানে— সে নটী হয়েই জন্মেছে সংসারে, এ পরিচয় ছাড়া তার অস্তিত্ব মূল্যহীন। দুর্গামোহন জানে সে জুয়াড়ি হয়ে জন্মেছে—জীবন নিয়ে জুয়া খেলা তার কাজ। সে জীবন নিজের হোক বা অন্যের—তার কাছে সবই সমান।

আস্তে আস্তে নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল পুরোনো খেলার মঞ্চ। পাশার ছকের ওপর ছড়িয়ে পড়ছিল প্রতীকচিহ্নখচিত হাড়ের গুটি। ঘুঙুর বাজছিল ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম। মাতাল জুয়াড়িদের হা হা হা হা হাসি। লালসার উদ্দাম আগুন ছড়াচ্ছিল বারবার। আঁচ লাগছিল শরীরে। 'বাবু, অন্য কোথাও চলো, আর ভালো লাগে না এ সব।'

'কেন রে নয়ন, কী হলো তোর?'

'বাবু, এরা সেই লখনৌর লোক—সেই হারামি শরাবি কুত্তারা...'রাতের শেষ যামে সেই কুত্তারা সর্বস্ব হারিয়ে যখন বুক চাপড়াত—অভিশাপ দিত, শিউরে উঠত নয়ন। লখনৌতে এই ব্যাপারটা দেখে নি সে। কারণ, দুর্গামোহন তখন জুয়া খেলতো কিছুটা অভ্যাসে—কিছুটা প্রয়োজনে। তখন তার জীবনধারণের জন্যে জুয়া ছিল একান্ত পথ। আজ সে যথার্থ পেশাদার জুয়াড়ি হয়ে উঠেছে। ছল চাতুরীতে সে হয়ে উঠেছে পাকা ওস্তাদ। কবে কোথায় কোন ম্যাজিক-ওলার কাছে যে ম্যাজিকের খেলাগুলি সে শিখে নিয়েছিল—এতদিনে প্রয়োগ করছে নিপুণভাবে।

নয়নের ভালো না লাগার জন্য নয়—নিজের স্বার্থেই ফের স্থান ত্যাগ করল দুর্গামোহন। বাড়ির জিম্মাদার রাখল দূরসম্পর্কের এক পিসিকে। দারোয়ানও রেখে এলো একজন।

এবার কলকাতা।

আসর জমে উঠতে দেরি হয়নি। যৌবনের নটী নয়নকে দেখে বহ্নিমুগ্ধ পতঙ্গের অভাব এখানে হলো না।

একদিন নয়নের মা মোহিনীকে বলেছিল দুর্গামোহন— 'মানুষ ভালোবাসার ব্যাপারে একটা অজুহাত খোঁজে।' এই ভালোবাসা কথাটার মানে শুধু পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের সম্পর্কেই সীমিত নয়—এর একটা গভীর দিক রয়েছে। যা আমি ভালোবাসি, যা আমার কাছে শ্রেয় ও প্রেয়—তার জন্যে সত্যি সত্যি একটা অজুহাত—একটা উপলক্ষ্যের সিঁড়িতে পা রাখতেই হয় সংসারে। কে সহজ করে স্পষ্ট করে মুখোমুখি বলতে পারে নিজের শ্রেয় ও প্রেয়কে—'আমি চাই।' চাইতে জানাও কি কম কঠিন চাওয়ার চেয়ে। তাই যত ছল, যত চাতুরী—যত সেতু খোঁজবার পালা অজানা অন্ধকারে।

বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছিল—এক...দুই.....তিন.... চার ...পাঁচ। কত বিমুগ্ধ মানুষ ওই সহজ কথা বলার জন্যে জুয়োর জটিল মায়া সেতু অতিক্রম করতে চাচ্ছিল। কেউ কেউ পেরিয়েছিল সেতুটা, তবু পায় নি। কেউ মধ্যপথে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আবার

কোনো ভিতু প্রেমিক সেতুপথের ভয়ংকর জটিল অন্ধকারকে দেখে নিঃশব্দে সরে গিয়েছিল। তারা সকলেই বুক চাপড়ে অশ্রুপাত করেছে। উন্মাদ হয়ে গেছে কেউ। পথে পথে ঘুরেছে সারাজীবন উলঙ্গ শরীরে—বিড়বিড় করে কী সব বলেছে, হেসেছে—কেঁদেছে।

কান পেতে শুনলে হয়তো শোনা যেত তারা উচ্চারণ করছে নটী নয়নতারার নাম। অথচ মানুষ তাদের দেখে আঙুল তুলে বলেছে— 'ওই সেই জুয়াড়িটা না? খুব পয়সাওলা লোক ছিল ওটা—কিন্তু জুয়ো খেলে আজ সর্বস্বান্ত!' ঘৃণায় থু থু ফেলেছে সকলে।

কেউ কি জানতো ওরা এক নটীকে শরীরী পেতে গিয়ে একটা অবলম্বনে পা রেখেছিল আর ওস্তাদ দুর্গামোহন তার মায়াদণ্ডের সঞ্চালনে তাদের হঠাৎ আঘাত হেনে বসেছে, সরিয়ে নিয়েছে পাটাতনটা? একপ্রান্তে নয়নতারা— উর্বশীর মায়াবিভ্রম। অন্যপাশে নরকের গভীর গহ্বর। মধ্যখানে পাশার ছকের সেতু বানিয়ে উপবিষ্ট প্রহরীর ন্যায় ওস্তাদ জুয়াড়ি জাদুওলা দুর্গামোহন। সে নিরন্তর তার স্বভাবসুলভ ঘোর নিঃশব্দ অট্টহাসি হেসেছে। বলেছে— 'আসুন, আসুন দেখে যান নিয়ে যান.... আপনার আঁখো কা তারা....আপনার জিন্দেগির রোশনি...'

এক .....দুই .. ..তিন .... চাব......পাঁচ.....গাছের পাতা থেকে শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ার মতো ঝরে গেল বছরগুলি।

পাঁচ বছর পরে একদিন মধু বোসের গলিতে বেপথু কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে এলো রতন মাস্টার। প্রথম আলাপেই আসর মাত। দুর্গামোহন তীক্ষ্ণদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর প্রশ্ন করেছিল— 'সেদিন গ্রেট এশিয়ান সার্কাসে আপনার খেলা দেখেছিলাম যেন....?'

রতন মাস্টার ঘাড় নেড়েছিল। নয়ন অবাক। স্বপ্ন না সত্য! মাঝে মাঝে কোনোদিন দুর্গামোহন তাকে বাইরে নিয়ে যেত সিনেমা বা কোনো গানের জলসায়—কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—খেলোয়াড়ি খুঁজে নিয়ে আসা। নয়ন সঙ্গে থাকলে বরং 'নয়া কাপ্তান'রা একপকেট মেজাজ নিয়ে আড্ডায় হাজির হয় পিছু পিছু। গাড়ি রেখে আসে সদরপথের মোড়ে কোনোখানে। বিলিতি মদের বোতল পকেটে পুরে শিস দিতে দিতে নয়নকে আড়চোখে দেখে। খানিক পরেই মায়ার খেলা শুরু। বসন্তবাহার রাগের ঝংকারে তাল দিয়ে নয়নের পায়ের ঘুঙুর আর জুয়োর হাড়ের ঘুটি বাজতে থাকে ফরাসের ওপর। পাক্কা খলিফাকে ক্লান্ত করে তোলে দ্রুতসঞ্চালিত দুটি উদ্দাম চরণপাত। দুর্গামোহন বলে—'নয়ন, ওরে নয়ন—ব্যস, ব্যস, বহুত আচ্ছা বেটি। একবার এদিকে আয় ...সব যে উপোসি ঠোঁটে হাঁ করে ধুঁকে মরছে....'

রতন মাস্টার ময়দানে সেদিন খেলা দেখাচ্ছিল। নয়ন মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। উঁচু লোহার শিকে ঘেরা গোলাকার মঞ্চ থেকে সে যখন একটা প্রকাণ্ড সিংহকে টেনে খোলা জায়গায় নিয়ে এলো—নয়ন ভয়ে চোখ বুজেছিল। উঃ মাগো। ও কি মানুষ না দেবতা? বুনো জানোয়ারের গলার শিকল ধরে দাঁড়িয়ে আছে উজ্জ্বল লাল আঁটো পোশাকে তেমনি ধবধবে সুশ্রী মুখখানি। সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা তাকে বীরের অধিক মহিমা দিয়েছে। ভয়াল রাক্ষুসে জন্তুটা সোনালি কেশর ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করছে, আর সে পিঠে হাত বুলিয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে। সত্যি বলতে কী, একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে যেন নয়নের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকল। সিংহটাও স্থিরভাবে নয়নকে লক্ষ্য করে নিঃশব্দ

হ'ল কয়েক মুহূর্ত। ভয়ে ভয়ে দুর্গামোহনের দিকে পাশ ফিরতেই নয়ন দেখল— বাবুও তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে।

নয়ন থতমত খেয়ে বলে উঠেছিল— 'খুব ভালো খেলা বাবু।'

ফিসফিস করে বলেছিল দুর্গামোহন, 'খেলোয়াড়টা আরো ভালো, না রে নয়ন?'

লজ্জা পায় নি নয়ন। এমন করে কত কথাই না তাকে বলে দুর্গামোহন। এ তো তুচ্ছ—একটা কথার কথা মাত্র। সে একটু হেসে বলেছিল— 'ডেকে নাও না তোমার দলে, জমবে ভালো।'

'আমার দলে বাঘ-সিঙ্গি তো নেই...যত কুত্তা'....নিঃশব্দে দারুণ হেসেছিল দুর্গামোহন। 'বাঘ-সিঙ্গির চেয়ে কুত্তা সামলানো বড় কঠিন।'

নয়ন আর কথা বলে নি। সে এবার দেখছিল—বিকট মুখব্যাদান করেছে সিংহটা আর রতন মাস্টার তার মুখে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। অস্ফুট আর্তনাদ করে দুর্গামোহনের হাতটা আঁকড়ে ধরেছিল সে।

এক সময় রতন মাস্টার নিরাপদ সিংহের মুখ থেকে মাথাটা বের করে নিয়েছিল। ব্যান্ডের বাজনা বাজছিল উদ্দাম আনন্দের কলরোলে। হাততালির শব্দ হচ্ছিল চারপাশে। নয়ন অস্ফুটকণ্ঠে বলেছিল—'আহা।'

আসলে একটা দারুণ মমতায় সে কাতর ততক্ষণে। রতন মাস্টার বেঁচে গেছে যেন—এটুকুই তার বড় সুখ। তবু কাঁটার মতো মনের কোথায় একটু ব্যথাবোধ— 'অত সুন্দর তুমি কেন জানোয়ারের মুখে নিজেকে সঁপে দাও বলো তো?' তার মনে হচ্ছিল—ওই ওস্তাদ খেলোয়াড়ের বাঁচাটা যেন বড় সংশয়ের আলো-আঁধারিতে আচ্ছন্ন। ঠিক তার নিজের মতো। জুয়াড়ি এক রাজধিরাজের রাজসভায় উর্বশী নটীর যে জীবন—যেন সিংহের মুখবিবরে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে থাকা। মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে দেখে—বেঁচে আছি তা হলে!' এবং এই 'বেঁচে আছি'র জগৎ থেকে সে প্রত্যক্ষ করে বাইরের পৃথিবীতে কোথাও সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি—লখনৌর পথে দেখা শোভাযাত্রার মাঝখানে সাদির নওশা আর দুলহনের জন্যে সানাইটা নিরন্তর বেজে চলেছে—বিভাস থেকে পূরবী,—পূরবী থেকে ভৈরোঁ। বলছে-- 'জাগো মোহন প্যারে...'

দুর্গামোহন হাঁ করে তাঁবুটা দেখছিল শুধু। কোনো খেলাই যেন তার চোখে পড়ছিল না। সে কিছু ভাবছিল তাঁবুর ছাদের দিকে তাকিয়ে। কেবল যাবার সময় নিজের মনে একবার মন্তব্য করেছিল—'জব্বর ওস্তাদ ঔর বঢ়িয়া খেল।'

তাই সেদিন সেই রতন মাস্টারকে নিজের আখড়ায় দেখে দুর্গামোহন যেমন বিস্মিত—তেমনি নয়ন। নয়ন আনন্দে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাত তুলে নমস্কার করে ফেলল।

রতন বলল— 'যাকে একবার দেখি, জীবনে আর ভুলি না। সেদিন আমিও আপনাকে দেখেছিলাম।'

নয়ন ঘাড় নেড়ে হাসল। তার দেহ-মন ধন্য হওয়ার সুখে আপ্লুত ততক্ষণে।

দুর্গামোহন বলল—' শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়। আমি জানতাম, আপনি আসবেন।'

নয়ন বলল— 'ইস, অন্তর্যামী কি না!'

দুর্গামোহন জবাব দিল— 'আলবাৎ।'

নয়ন ব্যঙ্গে কটাক্ষ হানল— 'তা তো ঠিকই। জন্তু-জানোয়ার নিয়ে যারা ঘর করে, তারা গন্ধ শুঁকে কোথায় জন্তু আছে তা টের পায়।'

ব্যঙ্গটা গায়ে মাখল না দুর্গামোহন। হয়তো সে নয়নের প্রগলভতা দেখে বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ করছিল না সে—বিস্ময় বা বিরক্তি। বরং অশ্লীল ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল— 'আমি কিন্তু অন্যরকম ভাবছি। বাঘ গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাঘিনীর ডেরায় হাজির একেবারে'—বলেই সেই বিকট অদ্ভুত মার্কামারা হাসি।

নয়ন মুখ ফিরিয়ে বসে থাকল চুপচাপ। এবার তার অস্বস্তি হচ্ছিল। কীভাবে রতন মাস্টারকে অভ্যর্তনা করবে ভেবে পাচ্ছিল না যেন। দুর্গামোহন হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে হঠাৎ তান দিল ভৈরবীতে। সুরের জাদু জড়িয়ে পড়ল ধীর মৃদু সুদূরগামী. .বহুত দিন হুয়ে.....

তেরে ইন্তেজারসে....

এ জিন্দেগি নহি গুজরতি.....

ঘুরে ঘুরে প্রথম কলিতে সঞ্চালিত হচ্ছিল কণ্ঠস্বর। জীবন কাটে না—যে না এলে জীবনও চলতে ভুলে যায়, সে এলে আমার কী হবে, কী হবে...! যখন সুমুখে এসে দাঁড়াবে—হায়, আমি কি তাকে বলতে পারবো, তোমার অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন?...

.....বরং এও ভালো যে জিন্দেগি নহি গুজরতি....

জীবনে সেই একবার নেচেছিল নয়নতারা—সে নাচ তার নিজের জন্যে— যা হয়তো কোনোদিন কোনো ওস্তাদ শেখাতে পারতো না তাকে। দুর্গামোহনের কণ্ঠ থেকে গান তুলে নিয়েছিল নিজের কণ্ঠে। ব্যাকুল সুরের পাখায় 'জিন্দেগি নহি গুজরতির বেদনা সঞ্চারিত হচ্ছিল ঘরের ছোট্ট আকাশটুকুতে। রতন মদের গ্লাস ঠোঁটে তুলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছিল বারবার। এই নটী মেয়েটি যেন কাকে কী গূঢ় কথা শোনাতে চায়—যা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না।

আসরের এক ফাঁকে সে বলেছিল— 'অপূর্ব, অদ্ভুত! কিন্তু এ জাদুর খেলোয়াড়ি ঘরের ছোট্ট সতরঞ্চে শোভা পায় না ওস্তাদজি, একে বাইরে নিয়ে চলুন।'

দুর্গামোহন বলেছিল—'এ তো সার্কাস নয় মাস্টার, এ বুনো জানোয়ারও নয়—একদম জাহান্নামের আগুন!' বলতে বলতে হাসছিল সে। 'বাইরে ছড়ালে দুনিয়া নরকের সমান হু হু করে জ্বলে উঠবে!'

'আপনি সবসে বড়া খেলোয়াড়—ওস্তাদের ওস্তাদ, আপনার হাতে ম্যাজিকওয়ার্ল্ড। তাছাড়া যা আপনার হাতে সৃষ্টি, তা সামাল দিতেও আপনি পারবেন। পারবেন না?'

'হয়তো পারবো। কিন্তু কী দরকার?'

রতন সে মুহূর্তে কোনো জবাব দেয় নি। জুয়োয় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল সে। মধ্যরাতে একেবারে ফতুর হয়ে টলতে টলতে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, নয়ন চুপিচুপি তাকে অনুসরণ করেছিল। বাবু তখন অন্য খেলোয়াড় সামলাচ্ছে।

'মাস্টার!'

রতন চমকে উঠেছিল। 'আপনি!'

'একটা কথা বলতে এলাম....' নয়নের পা কাঁপছিল।

'কী কথা?'

'আপনি আর এখানে আসবেন না। ঈশ্বরের দিব্যি...'

'কেন বলুন তো মিস নয়নতারা?'

'বাবু আপনাকে ভিখিরি করে দেবে—ও একটা শয়তান। ওকে চেনেন না!'

'ভিখিরি! আমি তো কবে থেকেই ভিখিরি বনে আছি। রতন অস্ফুট কণ্ঠে হেসেছিল। 'তাছাড়া কালই কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি মিস নয়নতারা, আজ রাত্রেই আমাদের সাজগোজ শুরু হবে। আজ শো বন্ধ ছিল বলে এদিকে আসবার ফুরসত পেলাম। আপনি ভাববেন না কিছু—জীবনে এমন কত ঘটে যাচ্ছে...'

নয়ন দু-পা এগিয়ে গিয়েছিল। 'এ আড্ডার খোঁজ পেয়েছিলেন কী করে?'

'খোঁজ?' রতন বলেছিল—'আপনার বাবুরই সাঙ্গ-পাঙ্গরা দিয়েছিল খোঁজ। ওই দেখুন ওই চায়ের দোকানে এখনও দুটিতে বসে রয়েছে মনে হচ্ছে। ওরাই না? আচ্ছা, আসি তাহলে।'

রঘু আর কেষ্টাকে বসে থাকতে দেখেছিল নয়ন। ওদের কাজই এইটে—ওরা বলে 'ডিউটি'। যোগ্য কাপ্তান দেখলে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দেয়। তারপর যথাস্থানে বসে ফের লক্ষ্য রাখে।

পাছে রঘু-কেষ্টা তাকে দেখে ফেলে, তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল নয়ন। কিন্তু এক অদ্ভুত শূন্যতার মধ্যখানে সে তলিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে তার মাথা ঘুরে উঠেছিল। কোনোরকমে ঘরে ঢুকে শয্যায় শরীর মেলে দিয়েছিল সে।

দুর্গামোহনের ডাক শোনা যাচ্ছিল ওদিকে— 'কই রে নয়ন, নয়নমণি এবার আয় একটু.......'

'দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাস পার্টি' সতি সত্যি পরদিন তাঁবু তুলে চলে গেল।

সারাটি দিন অস্থিরভাবে নয়ন ছাদের ওপর পায়চারি করছিল। এমনি বসন্তকাল সেদিন। বাইরের পৃথিবীতে তার শ্রেয় ও প্রেয় চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে—এমনি একটি গভীর বিষাদে সে বাইরের পৃথিবীকে দেখছিল।

দুর্গামোহন এসে বলছিল—'কী হয়েছে রে তোর? এত বেলা হলো ছাদে রয়েছিল যে?'

'কিছু না বাবু।'

'লুকোস নে নয়ন, তোর মন খারাপ করছে।'

'বা রে! সে কেন?'

'তুই রতন মাস্টারের কথা ভাবছিস।'

দুর্গামোহন যেন সত্যই অন্তর্যামী। ভয়ে বিস্ময়ে কাঠপুতুল বনে গেল নয়ন। বাবু কি তাকে মারবে? অবশ্য জীবনে খুব কমই সে গায়ে হাত তুলেছে—ভয়ই দেখিয়েছে বরং। কিন্তু আজ যেন নয়ন একটা বড় রকমের অপরাধে অপরাধী। এ অপরাধ তার স্পষ্টতার। কেন সে একটা অজুহাত খুঁজল না তার ভালোবাসাব জন্য?

নয়ন হঠাৎ যেন বেপরোয়া হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। 'বেশ—যদি ভাবি তো তোমার কী আসে যায়?'

দুর্গামোহন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এত সাহস নয়ন পেল কোথায়? একসময় আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল সে।

নয়ন ক্রমশ সাহস পাচ্ছিল যেন। যতবার ভাবছি—অন্তত সে জানুক বা না জানুক, এই প্রথম একটি লোককে সে দীর্ঘলালিত তার ক্ষুধার্ত ভালোবাসার জন্য বেছে নিতে পেরেছে এই গর্ব তার রক্তে উষ্ণতার সঞ্চার করছে। এবং প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে—যত ক্ষতিকরই হোক কিংবা যত ধ্বংসমুখর এ-হঠকারিতা—এতদিনে সে একটা বিরাট রুদ্ধ জলপ্রপাতকে মুক্তি দিয়েছে, এর তৃপ্তি তার মর্মকে করেছে স্নিগ্ধ ও পবিত্র। হোক এটা একটা জুয়াখেলা—এতে হেরেই সুখ। অন্তত নিজের জীবনের সারটুকু একবারের জন্যেও বাজি ধরতে পেরেছিলাম—এ গর্ব তো হেলাফেলার নয়।

কিন্তু কে যে হারে বা জেতে, সে বিচার করার সাধ্য কতটুকু মানুষের? ক'দিন পরেই রূপকণ্ঠীর মেলার ঠিকানা দিয়ে লেখা একটি চিঠি হাজির নয়নের হাতে।

দুর্গামোহনই নিয়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে। 'ওরে নয়ন, নয়নমণি রে, বাস মার দিয়া কেল্লা!' তার উল্লাস আর হই-চই দেখে, শিশুর মতো সরল মুখভঙ্গী দেখে কে বলবে, ওই দুর্গামোহন একটা ঘাগী শয়তান জুয়াড়ি!

রতন লিখেছে ঃ 'মিস নয়নতারা আমি জানি কেন সেদিন আপনি আমাকে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু যখন থেকে বোঝবার জানবার বয়স পেয়েছি, তখনই দেখেছি যে আমার মাথা সবসময় একটা সিংহের মুখে ঢোকানো। মুশকিল কী জানেন! বাইরের ওই সিংহটা বনের—তাই মাথা বের করার সুযোগটা পাওয়া সহজ। কিন্তু আসল সিংহ— সে হচ্ছে মনের। তাই তার মুখে সেই যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছি, আর বেরোল না। এই করেই তো বেঁচে আছি। ....কিন্তু তবু মন কেমন করে উঠেছিল আপনার কথা শুনে। হায়, এমনি কেউ একদিন সাবধান করতো আমাকে—তাহলে এই নিষ্ঠুর অপমানজনক ভবঘুরের জীবন কাটাতে আসতাম না!..... বাইরে থেকে হয়তো ভেবেছে—ওই বুনো জানোয়ারটা বশ মানিয়ে খেলা দেখাই, মানুষের হাততালি পাই, কত সম্মান কত যশ! তাঁবুর যে জগতে আমি বাস করছি, তার ভেতরটা যদি দেখতেন! প্রতিমুহূর্তে চাকরের—না, চাকরের হলে তা সম্মানজনক বলা যায়, এই জানোয়ারের জীবনধারণ—অসাবধান হলেই চাবুক, গঞ্জনা, লাঞ্জনা! সামান্য কিছু মাইনে পাই, হযতো জুতো সেলাই করলে তারও বেশি পেতাম। অথচ ছেড়ে আসতে পারি নে। ওই যে বলেছি— মনের সিংহ গিলে বসে আছে মগজটা। এ-নেশার তুলনা নেই মিস নয়নতারা—হয়তো আপনিও এ নেশায় বেঁচে আছেন। মনে হয় এই নেশার জগৎ ছেড়ে গেলে কোথাও দাঁড়ানোর মাটি নেই—কোথাও পৃথিবী আমার জন্য একবিন্দু স্থান রাখে নি—কোনো সমাজ কোনো মানুষ আপন বলে টেনে নেবার নেই। একটি চিহ্ন ছাড়া বেঁচে থাকা বড় কঠিন এই পৃথিবীতে। এই বর্তমান চিহ্ন—যা অনেক রক্ত খরচ করে জোগাড় করেছি—তাকে মুছে ফেলাও তো যায় না! এ যে রক্তে-মাংসে ওতপ্রোত হয়ে গেছে এতদিনে! বলুন তো, আমার উদ্ধার কোথায়! শুধু আমারই বা কেন—আমার মতো আরো অনেক যারা—এমনি একটি বিশেষ নেশার জগতে জীবন কাটাচ্ছে, তাদের?....তবু আমি আপনার কথা ভাবছি। হৃদয় দিয়ে অনুভব

করছি। আমরা দু'জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছাড়া কিছু নই। ....ভাবতে ভালো লাগে, যদি এই কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে অন্য আরেক কয়েদখানাকে ভালোবাসতে পারতাম। দুজনেই যদি!'

মায়ের কাছে কিছু বাংলা লেখাপড়া শিখেছিল নয়ন। যা শিখেছিল, তা প্রয়োজনে আরও শাণিত হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে। তার মা পুরোনো খাতা খুলে তাকে সংগীতশাস্ত্রের নানান তাল-ছন্দ-রাগরাগিণী বুঝিয়ে দিত। শেষে দুর্গামোহনও এ-ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিল। কিন্তু লেখাপড়া কতটুকু দিতে পারে মানুষকে? জ্ঞান বুদ্ধি বা বোঝা-জানার জন্য বুঝি মানুষের আরেক গভীর ইন্দ্রিয় থাকে অপেক্ষায়। কেউ তাকে জাগিয়ে দিতে পারে, কেউ পারে না। নয়ন জাগিয়েছিল একটু করে। সে চিঠির প্রতিটি শব্দ অনুভব করছিল গভীরতর অর্থের ভারে থর থর অবেগমন্থর। চিঠি শেষ করে সে যখন জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে, নিঃশব্দে জল ঝরছিল তার চোখে। দুর্গামোহনকে তার লজ্জা করছিল না। দুর্গামোহন সকৌতুকে তার হাবভাব লক্ষ্য করছিল ততক্ষণ। শেষে বলেছিল—'বুঝেছিস, কী লিখেছে ও?'

নয়ন জবাব দেয় নি।

'ছোঁড়াটা তোর প্রেমে পড়েছে, বুঝলি? এখন সে চায় তোকে বিয়ে করে সংসার পাততে।' হাসতে হাসতে সরে গিয়েছিল দুর্গামোহন।

ঘৃণায় দুঃখে ক্রোধে ক্ষিপ্ত নয়ন বিড়বিড় করে গাল দিয়েছিল— 'শয়তান, স্বার্থপর, পাপী, জানোয়ার।'

কিন্তু দুর্গামোহন যেন ঈশ্বরেরই এক প্রতিবিম্ব। পরদিন সকালে নয়নকে বলেছিল—'তৈরি হয়ে নে দিকি, বেরোতে হবে।'

'কোথায়?'

'রূপকণ্ঠীর মেলায়।'

চমকে উঠেছিল নয়ন। তামাশা নয় তো? 'কেন, সেখানে কী?'

পরে রঘুনাথ আর কেষ্টা সবটা স্পষ্ট করেছিল তার কাছে। বাবু— মস্তো একটা তাঁবু কিনেছে। লোকজন সংগ্রহ করেছে। নাচগান ম্যাজিক পার্টি নিয়ে মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াবে দেশ থেকে দেশে। রঘু চুপি চুপি বলেছিল—'এক জায়গায় আসর বেঁধে বাবুর পোষাচ্ছে না আসলে। নিত্যি এত পয়সাওলা খেলোয়াড় পাবে কোথায়? এদিকে পুলিশের শাসানি দিনে দিনে বাড়ছে। কবে নাকি দেয় লালবাজারের ওদিকে ঠেলে...।'

নাকি তাকে 'ভালোবাসার পুরুষ' দিতে যাচ্ছিল দুর্গামোহন? হয়তো ভেবেছিল—আর সামলানো যাবে না এ মেয়েকে। যৌবন কানায় কানায় টলমল করছে যার।

কে জানে কী মনে ছিল দুর্গামোহনের—তার মনের কথা তার ঈশ্বরও কি বোঝে? রঘুর কথাই ঠিক। মেলাগুলোতে নাকি জুয়াড়িরা সরকারি পাসও পায়—রঘু বলছিল। বলছিল— 'জুয়োও চলবে পেছনে—সামনে নয়নদির বায়োস্কোপ।'

রূপকণ্ঠীতে তাঁবুর মায়াজগৎ সৃষ্টি করল দুর্গামোহন।

'মোহিনী ভ্যারাইটি শো পার্টি।' মোহিনী কেন? নয়ন নতুন ঝকঝকে সাইনবোর্ডটার ওপর তার মাকে খুঁজছিল।

তারপর একদিন রতন মাস্টার নয়নের ছোট তাঁবুটার সুমুখে দাঁড়িয়ে তখন সেই অপরূপ হাসি ঠোঁট নিয়ে হাত তুলে নমস্কার করল, 'মিস নয়নতারা, কেমন আছেন? চিঠি পেয়েছিলেন তো?'

নিঃসংকোচে সে নয়নের তাঁবুতে তক্তপোশে গড়িয়ে পড়ল। ফের বলল ঃ 'গত রাতে যখন সিংহটার মুখে মাথা ঢুকিয়েছি—ভয়ে ভয়ে একবার চোখ খুলেছিলাম। কী মুশকিল ওর প্রকাণ্ড আলজিভটার ঠিক ওপরে আপনি দারুণ নাচছেন। কী অবাক. .এমন কেন হয় কে জানে? বিশ্বাস করুন ....।'

৮

ঈশ্বর তাঁর পৃথিবীকে যতখানি দিয়েছেন—ততখানি দিতে চায় মানুষ তার সংসারকে। কিন্তু মানুষ তো জানে না যে সে জন্মান্ধ—ঈশ্বরের মতো মুক্তদৃষ্টি না। তাই ঈশ্বরের দেওয়ার মধ্যে শুধু বাছাই করা জিনিসগুলি— আর মানুষের দান নির্বিচার। সৎ অসৎ ভালো মন্দ আলো কালোর ভেদাভেদহীন—যা কুড়িয়ে পায় সবই দেওয়া। তার পাপ দিয়ে মনে হয়—'পুণ্য দিলাম'। পুণ্য দিয়ে সে বলে—'হায়, পাপ দিয়ে বসেছি।' আসলে এ সংশয় মানুষের নিত্য অনাস্থার—সে যে দু'চোখেই অন্ধ।

তাই ভুল একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব—বিধাতার নয়।

কত পুরুষ—কত রূপবান গুণী যুবক এসেছে মিস নয়নতারা আসরে। তৃষ্ণা ছিল তাদের আকণ্ঠ। তারা নিজ নিজ সংসারকে কিছু দিতে চেয়েছিল বলে এইরূপ আসা-যাওয়া। নটী নয়নের কাছে হাত পেতেছিল তারা।

মানুষেব মতো নিঃস্ব কেউ তো নয়। সে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ভিখিরি। তাই যে রূপে রূপবান যে গুণে গুণী ছিল সেই তৃষ্ণার্তেরা তার কোনো মূল্য পায়নি নয়নের কাছে। নয়ন জানতো—ভেতরের উলঙ্গ মানুষটিই আসল, যে জন্মান্ধ জাতভিখারি। ওই রূপ আর গুণ বাইরের চাপানো একটা পোশাক আশাক মাত্র।

দুর্গামোহন তার জাদুযষ্ঠির আঘাতে সেই আদত নগ্ন সর্বহারা মানুষটিকে নিষ্কাশিত করে নয়নকে বলেছে—'দ্যাখ রে বেটি এ হচ্ছে এই। ব্যস, ঔর কুছ ভি নহি।'

নয়ন চকিত ভিতু চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে শুধু।

তবু মন বলে একটা অলৌকিক আছে দেহের মধ্যখানে আর তার আছে একটা তৃষ্ণা—এটা তো কোনোমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সেই তৃষ্ণা যেন মনকে দৃষ্টি দেয়। জন্মান্ধ মানুষ সে দৃষ্টির অনুভবে বাঁচবার সত্য খোঁজে ঈশ্বরের পৃথিবীতে। এ আমাদের লুকানো চোখ। এই তৃষ্ণার চোখ নিয়ে চুপিচুপি খোঁজাখুঁজির পালা আমরণ। এইটে শুধু ঐশ্বরিক নশ্বর জীবনে।

নয়নের মনে তৃষ্ণার হরিণী বেড়ে উঠছিল দিনে দিনে। মায়াময় অরণ্যের ছায়ায় রোদে জোৎস্নায় সে কোনো অলৌকিক আহবানের দিকে কান পেতে ছিল।

কেশর ফুলানো সিংহের গলার শিকল ধরে রতন মাস্টার এসে দাঁড়াল মুখোমুখি। তারপর একদিন রূপকণ্ঠার মেলা থেকে 'দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাস' তাঁবু গুটিয়ে চলে গেল।

নয়ন নিষ্পলক চোখে পথের ওপর তাদের ধাবমান ট্রাকগুলিকে যখন দেখছে, পিঠে মৃদু স্পর্শ তার। ফিরেই অবাক হয়ে গেল সে। রতন মাস্টার মৃদু হেসে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। রুদ্ধশ্বাসে নয়ন বলল— 'তুমি গেলে না?'

'যেতে দিল কই?'

'সে কী!'

'ওস্তাদজি তার ম্যাজিক ওয়ার্ল্ডটা বুলিয়ে দিল গায়ে—কেঁচো করে ফেললেন একেবারে।'

কান্না রোধ করতে পারল না নয়ন। মুখ ফিরিয়ে স্খলিতকণ্ঠে বলল—'এ জুয়োর দলে তুমি কী খেলা দেখাতে এলে মাস্টার?'

রতন তার দু'কাঁধ ধরে মুখটা ঝুঁকিয়ে দিল নয়নতারার কানের পাশে। চাপা গলায় সকৌতুকে বলল—'ভালোবাসার খেলা। প্যার কি খেল সবসে বঢ়িয়া খেল মিস নয়ন!'

সবসে বঢ়িয়া খেল।

কিন্তু যা খেলা—তা শুধু খেলাই। দুর্গামোহন নকল সংসার বানিয়ে ধুলোবালির ঘর বাঁধতে দিয়েছে দুটি উলঙ্গ শিশুকে। তারা সারাবেলা ঘর বাঁধে, ভেঙে ফেলে। আবার বাঁধে—আবার ভাঙে। অকারণ। কারণের সুতো আসলে যে ওই জুয়াড়ি ভাগ্যবিধাতার হাতে।

'মাস্টার, আর আমি পারছি নে...'

'কেন নয়ন?'

'শুধু কি এই?'

'আর কি তবে?'

'আর কি কিছু থাকতে নেই?'

'কী জানি। হয়তো আমি আছি, আর তুমি আছো— এর পর আব কিছু নেই।'

আছে। নয়ন অনুভব করেছে নিরন্তর। সেই যে নান্নু মা বুড়ি বলেছিল—বেহোঁশিমে কৈ ফায়দা নেহি বেটি। বেহোঁশি তো জিন্দেগির সাচ্ বাত্ ছুপা রাখে। হোঁশমে আও—তব তেরি আঁখ খুল যায়গি। দুনিয়া ভি বদল যাতি তব্। নান্নু মা তার অভিজ্ঞ কণ্ঠে আরও বলেছিল—মহব্বত জিন্দেগির সাচ্ বাত্। লেকিন, মহব্বত যবতক্ নেশা হয়ে থাকে, সে ঝুটারও অধিক।

দুর্গামোহন যেন নেপথ্য থেকে ঈশ্বরের মতো দৈবাদেশ জারি করেছে ঃ তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো। তারা সে আদেশ পালন করেছে মাত্র। ভালোবাসার মদে চুমুক দিয়ে বসে আছে দু'জনে।

'দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাসে'র কুশলী খেলোয়াড় রতন ফের আব এক সিংহের মুখে মাথা ঢুকিয়ে খেল দেখাচ্ছিল। ওরা চলে গেলে রতন 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো'র স্টেজে এসে দাঁড়াতো। বলতো ঃ বন্ধুগণ, আমাকে আপনারা চেনেন, আমি দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের ভয়ংকর সিংহটার মুখে মাথা ঢুকিয়ে খেল দেখিয়েছি—আমি সেই মাষ্টার রতন বোস—আজ আমি এই নতুন পার্টিব একজন খেলোয়াড় হয়েছি কেন, এখানে তো সিংহ নেই, বাঘ-ভাল্লুক হাতি-ঘোড়া নেই, রিঙ-স্টাপিজের খেল নেই? একটা কৈয়িফৎ আমাকে দিতেই হবে। আপনারা আমার মা-বাপ ঈশ্বর-ভগবান—আপনাদের কাছে কৈয়িফৎ না দিলে আমার তো মুক্তি নেই বন্ধুগণ.. !'

কৈফিয়ৎ স্পষ্ট কিছু দিত না সে। কিংবা দিতে গিয়ে তোতলামি করতো কাঠগড়ায় অপরাধীর মতো। তারপর একটু কেশে কপালের ঘাম মুছে ফের শুরু করতো ঃ 'ফ্রেণ্ডস' সেই আঠারো বছর বয়স থেকে আপনাদের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। আজ আমি আটাশে পৌঁছেছি। এই দশ বছর জবাবদিহি করতে হয়েছে এমনি করে। চিৎকার করে বলতে হয়েছে ঃ সব মিথ্যা—শুধু পেট সত্য। পেটের জন্য হিংস্র বুনো জানোয়ার নিয়ে জীবন বিপন্ন করে খেল দেখাই। পেটের জন্যে জ্বলন্ত ইস্পাতের ছুরি বসানো চাকা গলিয়ে লাফ দিই। এই পোড়া পেটের জন্যে মালিকের চাবুক খেয়েও আহা-উহু বলি না—ক্লাউন সাজি, শূন্যে ঘুরপাক খাই, দড়ির ওপর দৌড় দিই..... কী না করি! ...কারণ, আমরা খেলোয়াড়। খেলোয়াড়ি না দেখালে দু-মুঠো ভাত জোটে না সংসারে।.....

.....বাট ফ্রেণ্ডস, আই মাস্ট সে, আই অ্যাম এ লায়ার। মিথ্যার দালাল। পেট আমাদের অজুহাত। আসলে আমরা ছন্নছাড়া হা-ঘরের দল। আমাদেব জন্মলগ্নে কপালে লিখে দেওয়া হয়েছে, "তোমাদের কোনো ঘর নেই, কোনো প্রিয়জন নেই রক্তের সম্পর্ক নেই।'

এইসব ঘোষণাব পর সে গুটিকয় খেলা দেখাত। জ্বলন্ত ছুরি উঁচানো চাকা গলিয়ে যাওয়া খেলা। কাঁটাপেরেক বসানো তক্তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ওপরে দুটো লোক ছুটে যাওয়ার খেলা। শেষে কিছু ম্যাজিক। এ সময় দারুণ হাসাতো সে। ক্লাউনের অঙ্গভঙ্গীতেও বড় পটুত্ব ছিল তার।

ক'দিনের মধ্যেই 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো' জনতার ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠল। তিনটে করে শো দিয়েও রেহাই নেই। শেষ শো'র পর ক্লান্ত হযে সে ক্যাম্পখাটে শুয়ে অপেক্ষা করত নয়নের। প্রতি বারেই সে ভাবত নয়ন এসে বসবে তার পাশে। আরও কিছু আশা বুঝি তার ছিল। কিন্তু নয়নের পাত্তা নেই। সে তখন ভাগ্যের ঘরে মদের পাত্র পূর্ণ করছে বসে। খিলখিল করে অকারণ হাসছে। গুনগুনিয়ে গান গাইছে। সে নয়ন অন্য নয়ন। সে একান্তভাবে মিস নয়নতারা। উঁকি মেরে দেখে এসে রতনও মদের বোতল খুলে বসেছে। এক নিঃশ্বাসে সেটা খালি করে শুয়ে থেকেছে খোলা আকাশের নীচে ঘাসের উপর। সূর্যের আলোয় ঘুম ভাঙলে সে দেখেছে, ক্যাম্পখাটে পরিপাটি বিছানা করে কে শুইয়ে রেখেছে। রাগে আক্রোশে সে গুম হয়ে থাকত দুপুর অবধি। কথা বলত না কারোর সঙ্গে। রাগে আক্রোশে সে গুম হয়ে থাকত দুপুর অবধি। কথা বলত না কারোর সঙ্গে। কেবল দুর্গামোহন এসে ডাকলে মুহূর্তে পোষা জানোয়ারের মতো শান্ত হয়ে যেত সে।

একদিন এমনি এক রাতের শেষদিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রতনের।

নেশার আমেজ তখনও কাটে নি। অন্ধকারে সে অনুভব করল তার বুকের ওপর কে শুয়ে আছে। খোঁপাখোলা চুল দু'পাশে উপচে পড়েছে। 'নয়ন, নয়নঃ!' ত্রস্তে ফিসফিস করে উঠেছিল রতন মাস্টার।

নয়ন কোনো কথা বলে নি।

তখন রতন তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাঁবুর সীমানা পেরিয়ে। তারপর বলেছিল— 'ভালোবাসা নিয়ে ছলনা করতে নেই। তুমি দিনের পর দিন তাই করছো আমার সঙ্গে। কেন নয়ন, কেন?'

'ছলনা করলে আজ তোমার কাছে এমনি করে আসতে পারতাম না মাস্টার।'

'এ আসার কোনো অর্থ হয় না।'

'তবে কেমন করে আসবো?'

'চিরকালের মতো আসতে পারো না?'

'সে আবার কেমন?' ঈষৎ কৌতুকে চাপা হেসেছিল। 'বাবাঃ, এইটুকু আসতেই সব রক্ত জমে গেছে—টের পেলে বাবু গলা টিপে মেরে ফেলবে না!'

'তোমার এত ভয়!' রতন ক্ষুব্ধভাবে বলেছিল। 'কেন ওই জুয়াড়িটাকে এত ভয় করো তুমি?'

'তুমিও কি নিজের মালিককে ভয় করতে না?'

'না। তাই আমি পালিয়ে এসেছি দল ছেড়ে।'

'কিন্তু আমি....আমি যে মেয়েমানুষ মাস্টার!'

'মেয়েমানুষ হলে বুঝি সাহস থাকতে নেই? নয়ন, এতখানি যখন এগোতে পেরেছো, আরো পারবে। তুমি শুধু একবার বলো, আমার কথা শুনবে, দেখি ওই শয়তান জুয়াড়িটা আমার কী করে। আমি ওর মুখে লাথি মেরে তোমাকে নিয়ে চলে যাবো। অনেক বুনো জানোয়ার শায়েস্তা করেছি, এ তো একটা মানুষ!'

নয়ন একটু চুপ করে থেকে বলেছিল— 'প্রথম যখন এলে, তুমি এমন কথা তো বলো নি। তুমি বলেছিলে—আমরা কাছাকাছি রইলাম, এই থাকাই শেষ। এরপর আর কিছু থাকতে নেই।'

রতন ব্যাকুলভাবে বলেছিল—'আছে। দিনে দিনে বুঝেছি তা—ওই লাক-রুমের নরকে যে—তুমি, তাকে যখনই দেখেছি, মনে হয়েছে, আরো বড় পাওয়া ছিল—আমি বড্ড ঠকে গেছি।'

'মাস্টার, ওই বেশ্যাটাকে পেলেই তুমি খুশি হবে, তাই না? বেশ তো, আমি তোমার মুখে মদ তুলে দেবো, জড়িয়ে ধরবো—তুমি লাক-রুমে যেয়ো...

রতন কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে হঠাৎ চলতে শুরু করেছিল। অনেকখানি পথ উন্মত্তভাবে অতিক্রম করে একবার বুঝি মনে হয়েছিল—নাঃ, এও বড় হার হয়ে গেল তার। সে ফের ফিরে আসছিল তখন। আর তখনই দেখল—নয়ন, সেই নয়নতারাও তাকে অনুসরণ করছে। ছুটে আসছে শেষরাতের ধূসর আলোর পথে। ধুলোয় নগ্ন পা ফেলে দৌড়চ্ছে সে। রতনেব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নয়ন। রুদ্ধশ্বাসে বলেছিল—'আমিও যেতে চাই রতন, আমিও।'

সুমুখে মুক্ত অন্য আকাশ, ভিন্ন পৃথিবীর দরজা খোলা হয়ে যাচ্ছে। দুটিতে সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এদিকে ততক্ষণে দুর্গামোহনের তাঁবুতে সাড়া পড়ে গেছে। দুর্গামোহন পাগল হয়ে হন্তদন্ত ছুটে এসেছিল স্টেশনে। রঘু গিয়েছিল থানায়। কেষ্টা মেঠো পথে নদীর ঘাটের দিকে।

দুর্গামোহনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল রতন মাস্টাব। প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুঁষি মেরেছিল চোয়ালে। আছাড় খেয়ে পড়েছিল দুর্গামোহন জুয়াড়ি। পরমুহূর্তেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল—'নয়ন, মা নয়নমণি, তুই গেলে আমি কী নিয়ে বাঁচবো?'

আশ্চর্য, নয়নের বুকের ভেতর কোথাও দীর্ঘদিনের সঞ্চিত মমতা হঠাৎ গলতে শুরু করেছিল যেন। ওই সেই মোহন ওস্তাদ, তাকে সোনারওয়ালি গলির এক পুরোনো ঘরেব মেঝের কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, তাকে পিঠে চাপিয়ে ঘোড়া সেজেছে হাঁটু গেড়ে।

নয়ন একটু মুখ ভার করলে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—যেন আকাশের চাঁদও মুঠোয় উপড়ে এনে দেবে। কী তাকে দেয় নি দুর্গামোহন? বাবার স্নেহ, আদর, মমতা। কত সাধ্যসাধনায় দিনের পর দিন নাচ-গান লেখাপড়া শিখিয়েছে। সুমুখে বসে খাইয়েছে নিজের হাতে। বাজারের সবচেয়ে সেরা জিনিস সেরা উপঢৌকন তার সুমুখে হাজির করে বলেছে—'এই নে মা নয়নমণি, তোর জন্যে আনলাম। বেশ মানাবে তোকে।' একটু মাথা ধরলে কাতর চোখে পাশে বসে মাথা টিপে দিয়েছে। একবার দারুণ টাইফয়েডে ভুগছিল নয়ন। দুর্গামোহন অশ্রু সজলকণ্ঠে বলেছিল—'ঈশ্বর, আমি পাপী, মহাপাপী মানুষ। কিন্তু যদি কিছু পুণ্য করে থাকি, আমি তার বদলে আমার নয়নমণির আয়ু চাই।'

তার সব পুণ্যের বিনিময়ে পাওয়া আয়ু নিয়ে নয়ন কিশোরী থেকে যৌবনবতী হ'ল। আর সেই পুণ্যত্যাগী দুর্গামোহন আজ আবার মাথার চুল আঁকড়ে ধরে কান্নাকাটি করছে—'হে ঈশ্বর, ওর মনের মতি-গতি ফেরাও প্রভু। ওকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ো না।'

রতন হাসছিল মৃদুমৃদু তার কাণ্ড দেখে। এ-জুয়ায় সে জিতে গেছে—সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে দুর্গামোহনের। দুর্গামোহন যা বাজি ধরেছিল, তা সে খুইয়ে বসেছে। ভণ্ড শয়তান। মুখে থুথু ফেলতে ইচ্ছে করছিল তার। এমনি করে কত মানুষ তার হাত সব খুইয়ে চুল ছেঁড়ে। হাহাকার করে।

না, নয়ন হলফ করে বলতে পারে, দুর্গামোহন অভিনয় করছিল না। কারণ, কোনো প্রয়োজন তো ছিল না অভিনয়ের। সে ন্যায়ত ধর্মত—সব দিক দিয়ে নয়নের অভিভাবক। তাছাড়া, সে তার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারত—রতন একা কতক্ষণ বুঝতে সক্ষম হ'ত তার সঙ্গে?

আর দুর্গামোহন কি জানত না, নয়ন তাকে কতখানি ভয় করে?

সুতরাং এ কান্না নিতান্ত সবখোয়ানো জুয়াড়ির কান্না ছাড়া কিছু নয়। হাতের জিনিস আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে অবশ্য মানুষ কাঁদে—কিন্তু জাত-জুয়াড়ির কান্নার কারণ আরো গভীর। এই জাত-জুয়াড়িরা যে শুধু মানুষের জীবনকেই বাজি ধরে বসে।

নয়নের পা কাঁপছিল, সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে। এত ভোরে নির্জন হয়ে আছে স্টেশনটা।

'নয়ন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জুয়া ছেড়ে দেবো। তোকে নিয়ে মল্লারপুরে ফিরে যাবো।' উঠে এসে নয়নের হাত ধরেছিল দুর্গামোহন। 'মা, তোকে এতটুকু থেকে মানুষ করেছি, আমাকে একব্বারের জন্যে বিশ্বাস কর।'

আর স্থির থাকতে পারে নি নয়ন। বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে সে-ও কেঁদে উঠেছিল।

'এ পাপের পথ আমি ছেড়ে দিলাম। আজ থেকে আমি সংসারী হলাম নয়ন।'

রতন স্তম্ভিত ততক্ষণে। হয়তো সে নয়নের ওপর ঘৃণায় বিদ্বেষে কাতর হয়ে উঠেছে মনে মনে। হয়তো ভাবছে, দুর্গামোহন তার ওস্তাদের মার শেষ হাতের খেল দেখিয়ে দিল এমনি করে।

তার মুখ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। সে একবার মুখ তুলে নয়নের মুখটা দেখার চেষ্টা করছিল। নয়ন দুর্গামোহনের সঙ্গে চলতে থাকলে সে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হ'ল।

নয়ন আর একবারের জন্যেও পেছন ফেরে নি। খানিক চলে সে দেখল রঘু আর কেষ্টা এগিয়ে আসছে। দুর্গামোহন একটা রিকশো দাঁড় করিয়ে বলল—'রঘু, তুই মাকে

নিয়ে যা। কেষ্টা, তুই আমার সঙ্গে আয়।' বুক কেঁপে উঠল নয়নের। বাবু রতনকে মারবে না তো! ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখল, সত্যি দুর্গামোহন কেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। নয়ন পাগলের মতো বিড়বিড় করছিল— 'আমার কী! কী দোষ আমার..... ওকে যা খুশি করুক ....ও কে?'

সারা দুপুর নয়ন ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল সেদিন। অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখেছিল। যে সিংহটার মুখে রতন মাথা ঢুকিয়েছিল—সে যেন গলা থেকে মুণ্ডুটা দাঁতে ছিঁড়ে ফেলেছে। কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে—প্রকাণ্ড রক্তাক্ত জিভ হলুদ দাঁতেও রক্তের ছোপ—সেই ভয়ংকর আগ্রাসী সিংহ সোনালি কেশর ফুলিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রচণ্ড গর্জন করছে সে। আর সেই গর্জনের ব্যাপকতায় পুরিয়ায় তান ধরেছে সানাই। কী আশ্চর্য!

নাঃ, সিংহের ডাক নয়। ঢাক বাজছে তাঁবুর সুমুখে। বসন্তের রক্তিম বিকেলে মুহূর্তের জন্যে যেন পৃথিবীটা ভিন্ন স্মৃতির গন্ধে আপ্লুত সহসা। সত্যি পুরিয়ায় আকুল তান ধরেছে সানাইদার। কোনো বিয়ের মিছিল চলেছে বুঝি পাশের পথে। তারপর দুর্গামোহনের ব্যান্ডপার্টিও যোগ দিল ঝলমলে পোশাক পরে। বিস্মিতা নয়ন দ্রুত উঠে এসে ময়দানে দাঁড়াল। এবং তখনই দেখতে পেল রতনকে।

রতন তাঁবুর শেষ প্রান্তে একটা পিপুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর চাপাটি তাকে প্রচণ্ড হাত-পা নেড়ে কী বোঝাচ্ছে। অস্ফুট হাসছিল নয়ন। ঘৃণা না, দুঃখ না—বরং একটা আশ্চর্য প্রসন্নতা দীর্ঘ স্বপ্নসংকুল ঘুমের পর ক্লান্ত স্নায়ুতে নিবিড়তর হচ্ছিল। স্বপ্নের উত্তেজনায় তার মস্তিষ্কের যে কোষগুলি জাগার পরও আড়ষ্ট হয়ে ছিল, হঠাৎ এইসব অদ্ভুত দৃশ্যের দোলায় তারা পরিচ্ছন্ন হতে পারছিল। প্রশান্ত হচ্ছিল ক্রমান্বয়ে।

এ কি সুখ না দুঃখ। এ অনুভূতির কোনো প্রকৃতি বুঝি মেলে না। খানিক পরে কেষ্টা একগাল হেসে বলল— 'আসতে কি চায় মাস্টার, একরকম কোলে তুলে নিয়ে এলো বাবু। তাও হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করছিল বাচ্চা ছেলের মতো। বাবু বললে—অপমান করেছ, তাকে কী হয়েছে—আমরা ঘরছাড়া মানুষ, ওসব ব্যাপার মনে রাখি না! তারপর, তুমি আমার ছেলের মতো....'

রঘু এসে বলল, 'ও নয়নদি, বাবু তোমায় শিগ্রি সাজতে বললে।'

নয়ন বলল, 'কেন, আজ থেকে শো বন্ধ না?'

'তা জানি নে বাপু। বললে, সাজতে বল গে, বললুম। শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছে।'

'আমি সাজবো না, বল গে যা।'

'বেশ, বলছি।' রঘু গোমড়া মুখে চলে গেল।

একটু পরেই দুর্গামোহন এলো। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, হাতে একটা ময়ূরমুখো ছড়ি।

'কই রে নয়ন, এখন সাজগোজ করলি নে? তোরা আমাকে পাগল করে ছাড়বি দেখছি।'

নয়ন চুপ করে থাকল। আবার কোনো নতুন খেলা শুরু হবে তা হলে।

দুর্গামোহন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল— 'হতচ্ছাড়ি মেয়েটা দু'ঘা না খেয়ে ছাড়বে না আজ। ওরে বাছাঁ, একটু চোখ-টোখ খুলে দ্যাখ দিকি— ওই রঘু কেষ্টা চাপাটি ভুপতি লক্ষ্মণ সব কেমন সেজেগুজে ফিটফাট....ছি...ছি— তোর একটুও আক্কেল নেই.....'

রঘু কেষ্টারা ততক্ষণে সত্যিসত্যি সেজেগুজে ফিটফাট। প্যান্টশার্ট পরে ঘোরাফেরা করছে। তাঁবুর ও-পাশে কী যেন বানাচ্ছে সব বাঁশ পুঁতে। রঙিন কাগজের ফুল জড়ো হয়ে আছে তক্তপোশের ওপর।

পুরিয়ায় তান তখনও শেষ হয় নি। দ্রুততর আলাপে দারুণ আকুলতা। বসন্তের রক্তরোদ উজ্জ্বলতর হচ্ছে বেলাশেষের মুখোমুখি। দুর্গামোহন গজগজ করছিল একটানা— 'হা-ঘরেদের আবার বিয়ে! না মা, না বাবা, না সমাজ-সংসার! আকাশ থেকে খসে পড়া সব। দুত্তেরি!'

নয়ন এবার এতক্ষণে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল— 'বিয়ে, কার বিয়ে?'

'তোর।'

'কার হাতে আমাকে তুলে দেবে তুমি?' এ চিৎকার ছিল বিপন্ন মেয়ে-মানুষের। কিন্তু চোখে তার জল ছিল না—ছিল প্রচণ্ড জ্বালা। ক্ষিপ্তা নয়ন বাঘিনীর মতো ফুঁসে উঠেছিল— 'না, না, না!'

বরবেশী রতন এসে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডাকল—'নয়ন, লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। দেরি করো না!'

দুর্গামোহন বলে, 'পুরুষ মরে একবার, কাপুরুষ মরে হাজারবার। এই হাজারবার মরার ঘা খেয়ে খেয়ে সে কুত্তার মতো ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকে।' রতন বোস হয়তো আসলে কাপুরুষ,—সিংহের মুখে মাথা ঢুকিয়েও যে বাঁচার কথা ভাবতোই, দেখতো, তার আলজিভের ওপর নয়নতারার নাচ।

এই যে ঘরছাড়া যাযাবর মানুষগুলি, তাদেরও এমনি করে বিয়ে হয়, ছেলেপুলের জন্ম হয়। জলজ গাছের মতো তারা ভাসতে ভাসতে যায়—কিন্তু মূলও থাকে এমনি করে। মূল ছাড়া সংসারে কে বাঁচতে পারে? মূল একটা থাকেই কোথাও—দৃশ্য বা অদৃশ্য—নানা রূপে।

কাপুরুষ রতন বরবেশে যেন নতুন করে মরলো। মরে আবার বাঁচলো। ছোট্ট তাঁবুতে বাসর সাজানো হয়েছিল একটা। এদিকে রূপকণ্ঠীতে খবর রটতে দেরি হয় নি। ওদিকে মেলার লোকজন তো রয়েছেই। সবখানে একটা কৌতূহল। যাযাবর ইরানিদেরও এমনি করে বিয়ে হয়, বাজি পোড়ে, ফুলশয্যার রাত আসে—কে না দেখেছে। মেয়েরা এসেছিল দলে দলে। অদ্ভুত রকমের বিস্ময় নিয়ে নয়নতারাকে দেখে যাচ্ছিল তারা। রতনকেও দেখছিল। ফাজিল মেয়েও কম ছিল না দলে। 'ও জামাইবাবু, ওই বুঝি তোমার নতুন সিঙ্গি!'

'মেয়ে সিঙ্গি রে, মেয়ে সিঙ্গি।'

'সেটা বুঝি পুরুষ ছিল?'

এক প্রৌঢ়াও এলো ভিড় ঠেলে। আঃ থাম দিকি তোরা। বলি, ওগো কনে বউ, তোমার ঘোমটা কোথায়? মরণ! এ-যুগের মেয়ে তো...

'মা থাকলে কত খুশি হ'ত, আহা!'

'বাবা তো রয়েছে।'

'অমন বাবার মুখে আগুন! মেয়ের নাচ বিক্রি করে খাচ্ছে...'

'চুপ কর তো বাপু! আজ ওদের শুভরাত্রি—কুকথা বলতে নেই।'

উলুধ্বনি দিয়ে চলে গেল একদল। আবার অন্যদল এলো। 'বাঃ, কী মানিয়েছে!'

'হ্যাঁগা, তোমরা কী জাত?'

'জাত নিয়ে ধুয়ে খাবে। আকাশের তলে ঘর যাদের—তাদের আবার জাতবেজাত...'

'কিন্তু দ্যাখ নীরু,মেয়েটির মুখ যেন কতকটা সেই....কী নাম যেন, ঢপের দলে সেবার দেখেছিলুম.... কী নাম ছিল রে?'

দুর্গামোহন ছড়ি হাতে তেড়ে এসেছিল। কী দেখছো সব এখানে, অ্যাঁ? ভাগো,ভাগ্...'

''কেন বাবা? এমন দিনে ওদের দেখবে না তো দেখবে তোমার খেলার আসরে? কী মানুষ তুমি বলো তো? আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শি থাকলে কাকে ঠেকাতে?' সেই প্রৌঢ়া চোখমুখ লাল করে উঠে গেল।

তারপর রঘু আর কেষ্টা লাঠি হাতে দাঁড়াতেই সব ফাঁকা। রাত নেমেছে। মেলা তখন আলোয় আলোয় উজ্জ্বল। কোলাহলে টলমল করে কাঁপছে। খেলার বাঁশি বাজছে। ম্যাজিক পার্টির ওদিকে জয়ঢাক আর ভেঁপু বাজছে। এখানে হ্যাসাগের আলোর পাশে 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো'র প্রকাণ্ড ধূসব তাঁবুটা প্রায় নিস্তব্ধ। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে তার শীর্ষে। বসন্তের মরশুমি হাওয়া গায়ে লাগে। কী ফুলের গন্ধ আসে ভেসে। সামনেব আলোটা কে সরিয়ে নিয়ে গেল। বাসর-তাঁবুতে হারিকেন দিয়ে গেল চাপাটি। মুখ টিপে নিঃশব্দে সে হাসছে।

এর নাম সাদি। এরই জন্যে লখনৌর গলিপথে একদিন সানাই বাজছিল সারাটি রাত। ভোরের আগে সে তান দিয়েছিল—জাগো মোহন প্যারে,জাগো...

'নয়ন, আমি কি ভুল করলাম?'

'কেন ভুল?' হঠাৎ ফণা-তোলা সাপের মতো সোজা হয়ে মুখ তুলে বলল নয়ন। এ-বলার একটা প্রচণ্ড বিশ্বাসের আমেজ ছিল। 'না, তুমি কোনো ভুল করো নি।'

'কিন্তু বাবু যদি ফের তোমায়...' বলতে গিয়ে থেমেছিল রতন।

'উনি তো প্রতিজ্ঞা করেছেন—আর জুয়ো খেলবেন না।'

'যদি সে প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলেন?'

নয়ন ঘাড় নেড়েছিল। 'অসম্ভব। আমি জানি, উনি এককথার মানুষ। তুমি ক'দিন দেখেছো আর?'

'কিন্তু.....'

'কিন্তু কী?'

'নয়ন--আমি ঘর চেয়েছি, সংসার চেয়েছি। অন্য মানুষ যেমন করে বাঁচে, তেমনি করে।'

'আমিও কি তা চাই নে?'

রতন এতক্ষণ হেসে ছিল—'তবু কী মজা দ্যাখো না, অভ্যাস এত হাড়ে-হাড়ে দানা বেঁধে আছে--মনে হচ্ছে স্টেজে ঘন্টা পড়ল--আমার পালা। সিংহটা উঠে দাঁড়িয়েছে খাঁচার ভেতর....'

নয়নও হাসছিল এ-কথা শুনে। 'শুধু কি তোমার? জানো,কতবার আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছি এ-সব নাচগানের লাইন, বাবুও অমত করেন নি, অথচ আমার সব ফাঁকা মনে হয়েছে। ক'দিন পরেই পা সুড়সুড় গলা গুনগুন...'ভীষণ হাসছিল বলতে বলতে।

'তোমার বাবুরও তো তাই। একই রোগ হাড়ে হাড়ে।'

নয়ন হাই তুলে বলেছিল— 'মরুক গে ও-সব কথা। যা হবার হবে। ভেবে লাভ নেই। এসো, ঘুম পাচ্ছে আমার।'

বস্তুত তারা যে রোগাক্রান্ত,টের পাচ্ছিল একটু করে। এবং ক্রমান্বয়ে যেন ভিতরে ভিতরে একটা আপসের বোঝাপড়া ঢুকে যাচ্ছিল। মল্লারপুরে ফিরে এলো দুর্গামোহন। তার কথা রাখল। তাঁবু আর খেলার জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরে ভরে দিল। নতুন সংসার পাতার হাবভাব তার আচরণে। কেবল মধ্যে মধ্যে নয়ন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত। দেখত দুর্গামোহন তার ওপরের ঘরে একা একা দুপুর রাত অব্দি পাশার ছকের ওপর গুটি চলেছে। মুখের হাসি নির্জন ঘরে যেন ছড়িয়ে পড়ছে হাড়ের গুটির শব্দ হা-হা-হা....। কত রাতে উঁকি মেরে সে দেখেছে, বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছে দুর্গামোহন আর লাল চোখে ছকের দিকে তাকিয়ে আছে। একপাশে স্তূপীকৃত খুচরো পয়সা আর একগোছা নোট। নিজের সঙ্গে নিজেই জুয়ো খেলছে সে। তারপর একসময় বালিশে কাত হয়ে গুনগুন করে তার প্রিয় রাগিণী টোড়ি ভাঁজছে— লখনৌর সেই মোহন ওস্তাদ যেন আবার ফিরে আসতে চাচ্ছে তার অস্তিত্বে— সেই গভীর সকাতর আহ্বান সুরে।

নয়ন আরো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল দিনে দিনে।

দুর্গামোহন একা বেরিয়ে যায় সন্ধ্যায়—কোনোদিন ফেরে গভীর রাতে, কোনোদিন ফেরে না। রঘুকে প্রশ্ন করলে বলে—'বাবু, বাইরে গেছে। বলে গেছে—আজ ও বেলা ফিরবে।'

নয়নের চোখে জল আসত। 'কেন, আমি কি পর হয়ে গেছি? বলে যেতেও মুখে বাধে?'

রতন বলত—'নয়ন, একটা কথার জবাব দেবে?'

'জবাব দেবো না কেন? ও সব হেঁয়ালি ছাড়ো তো।'

'জুয়োখেলা বা মদ ছাড়া বাবুর আর কোনো নেশা আছে জানো?'

'অ্যাঁ!' ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো চোখেচোখে তাকিয়ে ছিল নয়ন। রতনের কথা সে বুঝতে পারছিল না।

'উনি আমাদের গুরুজন। তবু বলা ছাড়া উপায় নেই...'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'বাবু কোনো মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছেন হয়তো।'

'মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে!' নয়ন হাতমুখ নেড়ে প্রতিবাদ করেছিল। 'আমার মা মরে গেলে কোনোদিন কোথাও বাবুকে ও পথে পা বাড়াতে দেখি নি। সেই বারো বছর বয়স থেকে আমি দেখছি। ওটা ঠিক নয়—ভুল সন্দেহ তোমার।'

'তবে কি ফের জুয়ো খেলতে যান?'

নয়ন নীরবে চোখেচোখে তাকিয়ে ছিল। হয়তো তাই। শিউরে উঠেছিল সে। আর তো কোনো নিয়মিত রোজগার নেই। সম্পত্তির মধ্যে শুধু এই বাড়িটা আর কিছু জমানো টাকা। তাতে এতগুলি লোক পুষছে। অনেকের মাইনেও দিতে হয়। ছাড়িয়ে দিতে বলেছিল নয়ন। দুর্গামোহন বলেছিল—'বড় মায়া হয় রে। অনেকদিনের সঙ্গী—ছেড়ে দিলে কোথায় যাবে? কী খাবে?'

'হ্যাঁ—পাপের সঙ্গী তো। ছাড়তে পারা কঠিন!'

দুর্গামোহন একটু হেসেছিল। তা ঠিকই বলেছিস বাছা।'

তা হলে ছাড়বে না ওদের?

'ওরা যদি নিজে থেকে বিদায় না নেয়, আমি কী করি বল তো!'

চেষ্টা করেছিল নয়ন। রঘু আর কেষ্টা কোনো জবাব দেয়নি। মুখ গোমড়া করে সরে গিয়েছিল। সে বেলা খেতেও আসে নি। শেষে ডেকে সাধাসাধি করে আনতে হ'ল। আর ভূপতি তো কেঁদে একাকার। চাপাটি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্বিকার থাকল। তখন বয়সে সেই সবচেয়ে ছোট, নেহাৎ বাচ্চা—তাতে অনাথ। যাবেই বা কোথায়? ওদিকে দারোয়ান অনন্ত ট্যারচা তাকিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল—'বর্ষা পড়লে বাবুর মেজাজ এমন না হয়ে পারে না। আবার পুজোপাব্বন, মেলা টেলা আসুক। দেখবে, বাড়িঘর ফেলে দে ছুট হিল্লি-দিল্লী। তখন পাহারা দেয় কে? যে চোর-চোট্টার দেশ, চৌকাঠ জানালা খুলে সব ঝাঁঝরা করে ফেলবে না?'

ফের জুয়োয় বসলে জমানো টাকা শেষ হতে কতক্ষণ। কারণ, নিজের আসরে 'ভাগ্যের ঘরে' যে লোকটি সম্রাট—সে বাইরে অন্যের আসরে তো সাধারণ মানুষ মাত্র। তখন তো নয়ন-নটী পাশে নেই যে তুলাদণ্ডের ভার তার দিকে ঝুঁকিয়ে দেবে একটি বিলোল কটাক্ষে। নয়ন পাশে থাকলে প্রতিমুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে খেলোয়াড়রা। এ খেলার চেয়ে তখন নয়নের চোখের ছকে আগুনের গুঁটির চাল সামলাতে তারা ব্যস্ত।

শিউরে উঠেছিল নয়ন। রতনকে বলেছিল—'তুমি পুরুষমানুষ, চুপচাপ বসে এ সব দেখবে?'

'কী করতে পারি আমি?'

'বেশ, চুপ করে থাকো।'

রতন ক্ষুব্ধভাবে বলেছিল—'ও, রোজগার করতে বলেছো, তাই না?'

'যদি তাই ভেবে থাকো, বেশ। কিন্তু রোজগার কি কোনোদিনই করতে হবে না তোমাকে?'

'খুব সংসারী হয়ে গেছ দেখছি।'

'সংসার বুঝি ভালো লাগে না তোমার?'

রতন হঠাৎ তার মনের কথা বলে বসেছিল— 'না নয়ন—না। একটুও না। আজ চারটি মাস ধরে এই চুপচাপ বসে থাকা আর ভালো লাগে না আমার।' আশ্চর্য, এতদিন ঠিক উলটো কথাটি সে বলে আসছিল।

'তবে চাকরির চেষ্টা করো কোথাও।'

নয়ন সহজ মনেই এ কথা বলেছিল। কিন্তু রতনের মনে ততদিনে একটা ভিন্ন সুর—যে সুর তার রক্তের গভীরে চিরদিন বিচরণ করেছে। সে বলেছিল--'সংসারের ওইসব মানুষগুলোর মতো কুত্তা হয়ে বেঁচে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগে না। নয়ন, একদিন হাজার হাজার মানুষ আমাকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠেছে—ওই মাস্টার রতন বোস, ওই সে ওস্তাদ খেলোয়াড়--আজ পথের ভিখিরিও আমার দিকে মুখ তুলে চায় না। এ বাঁচার কোনো মানে নেই।'

নয়ন ক্রুদ্ধ হয়েছিল। আর কোনো কথা বলে নি। সে ভেবেছিল— এই নতুন জীবনটা কোনো মাটির ওপর ফলে ফুলে বিকশিত করে তুলবে: কিন্তু তা যেন হবার নয়। কোথাও

তার বোঝবার একটা ভুল ক্রমাগত থেকে যাচ্ছে। ওই দুর্গামোহনকেও সে চিনতে পারে নি, রতনকেও না—এমন কি হয়তো নিজেকেও।

নিজেকেও চেনে নি সে। তার প্রমাণ পেল কিছুদিন পরেই।

৯

আগের রাতে বাড়ি ছিল না দুর্গামোহন। তারপর সারাটি দিন গেল, ফেরার নাম নেই। অথচ রঘুকে বলে গেছে—'ভোরের দিকে ফিরবো, দরজা খুলে দিবি তুই।' আরো বলেছে— 'ফিরতে দেরি হলে রামসহায়ের ওখানে একবার খোঁজ নিস। রামসহায়কে রঘু চেনে। নামজাদা আড়তদার। নানা ব্যাপারে দালালিও সে করে। এখানে তাকে চেনে না এমন কেউ নেই। সন্ধ্যার দিকে উদ্বিগ্নমুখে নয়নকে সব বলল রঘু। 'যাওয়া উচিত ছিল অনেক আগে, ছি ছি, বাবু কী ভাববে।'

নয়ন তেড়ে গিয়েছিল—'নেমকহারাম কোথাকার!'

তখন রঘু বেরিয়ে গিয়েছিল তার স্থূল লাঠিটা নিয়ে। রতন বলেছিল— 'রামসহায় বোধকরি নতুন সঙ্গী আজকাল? ঠিক ধরে ছিলাম তা হলে। ফের নরকের গর্তে ঢুকে গেছেন।'

উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ঘুরছিল নয়ন। কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো। যতদিন দুর্গামোহন নিজের আড্ডায় জুয়ো খেলেছে, ততদিন রঘু আর কেষ্টা তার পাহারায় থেকেছে। কারোর টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল না। কিন্তু সত্যি যদি রামসহায়ের ওখানে জুয়োর আড্ডায় সে গিয়ে থাকে, জুয়াড়িদের রোখ তো জানা কথা—মুহূর্তে ছুরি মেরে বসবে বুকে। নয়ন ভাবছিল—ফিরে এলে অবশ্য স্বভাবমতো সেই একই কৈফিয়ৎ দেবে বাবু। 'বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়। একটা ব্যাবসা-ট্যাবসা কিছু করার তালে আছি রে।'

যা ভেবেছিল তাই।

সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ করে। ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে গিয়েছিল। ঘোরতর আঁধার নেমেছিল পৃথিবীতে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রঘু ফিরে এসেছিল হন্তদন্ত হয়ে। 'নয়নদি, ও নয়নদি সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'কী, কী হয়েছে রে রঘু?'

'তোমার কাছে টাকা আছে?'

'টাকা? টাকা কী হবে?'

'বাবু বললে, শিগ্রি কিছু টাকা দাও—অন্তত শ'দুই কমপক্ষে!'

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে নয়ন বলল—'আমার কাছে টাকা নেই। আর থাকলেও দিতাম না, তোর বাবুকে বল গে যা।'

'তোমার পায়ে পড়ি নয়নদি, দাও। নইলে বাবুকে ওরা ছেড়ে দেবে না।'

'কেন, কী করেছে তোর বাবু?

'খেলায় হেরে গেছে। রামসহায়েরা ওকে পিঠমোড়া দিয়ে সারাদিন বেঁধে রেখেছে—তোমার দিব্যি, বিশ্বাস করো—না হয় নিজের চোখে দেখে এসো গে!'

'কেন?' নয়ন তীব্র ব্যঙ্গে বলে উঠল—'কেন?তোরা তো তার নন্দী-ভৃঙ্গী, হাতে মোটা লাঠি নিয়ে ফিরিস, যা না এবার, পালোয়ানি করে ছাড়িয়ে আন, দেখি! আমাকে কেন?'

'তুমি টাকা না দিলে তাই করতে হবে বইকি।' রঘু মাথায় ফেটা বাঁধতে থাকল। কেষ্টা অনন্ত ভূপতি ইতিমধ্যে ছুটে এসেছে। তারাও রঘুর দেখাদেখি প্রস্তুত হচ্ছিল। কোমরে ভোজালি বেঁধে হাতে রামদা নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তৈরি। রঘু চিৎকার করে বলল— 'রতন মাস্টার, আপনিও বাবুর অনেক নুন খেয়েছেন, মনে রাখবেন!'

রতন বলল—'তোরা কি সত্যি সত্যি খুনখারাপি করতে যাচ্ছিস রঘু? বরং আমি থানায় যাচ্ছি একটু অপেক্ষা কর তোরা। পুলিশ যদি আমাকে ফিরিয়ে দেয়, তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।' রতন বেরিয়ে যাচ্ছিল। হাতে টর্চ নিয়ে ছাতাটা খুলে সিঁড়িতে নামতেই নয়ন ডাকল—'শোনো।'

'বলো।'

'আমি টাকা দিচ্ছি। মিছিমিছি হইচই করলে কেলেঙ্কারিই বাড়বে শুধু।' আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল সে। বাক্স খুলে টাকা বের করল। তারপর বাইরে এলে পরে রঘু হাত বাড়িয়েছে—'কই, দাও শিগ্রি!'

টাকা দিতে গিয়ে হঠাৎ থামল নয়ন। দাঁতে ঠোঁটে কামড়াচ্ছিল সে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে বৃষ্টি-অন্ধকারময় বাইরের পৃথিবীর দিকে চেয়ে সে ভাবছিল। এ টাকা দিয়েও কি শেষ হবে কোনোদিন? দুর্গামোহন আজ হয়তো আসর ছেড়ে উঠে আসবে। কিন্তু এ অপমান কিছুতেই ভুলতে পারবে না সে। সারারাত সে জেগে থাকবে আর মুহূর্তে মুহূর্তে অমানুষিক জেদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। জুয়াখেলার আসরে এই প্রথম নিদারুণ অপমান। হয়তো অন্যপথ না পেয়ে আত্মহত্যা করাও বিচিত্র নয় এ মানুষের পক্ষে।

মানুষ যে আসলে জন্মান্ধ। ঈশ্বরের মতো সংসারকে সে কতকিছু দিতে চায়। জুয়াখেলা যদি পাপ হয়—এই পাপ দিয়ে সে গর্ব করে ভাবে—'পুণ্য দিলাম'। এবং ভেদজ্ঞানহীন বোধহীন দেওযার পর তার গর্ব তাকে নিজের অস্তিত্বের প্রতি আশ্বস্ত করে। তারপর সেই স্বস্তির বোধে কেউ আঘাত দিলে তার সারা সত্তাই যে অর্থহীন হয়ে ওঠে।

'ও পুণ্য নয়—পাপ দিয়েছো তুমি'— এই ধরা পড়ার আঘাত কত মর্মান্তিক, নয়ন সারাজীবন ধরে তা অনুভব করেছে যে!

না, না। নয়ন সে কথা কোনোমতে বলতে পারবে না দুর্গামোহনকে।

সে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। রঘু বলল—'কী হলো নয়নদি?'

নয়ন কঠোরভাবে আদেশের সুরে বলে উঠল—'একটু অপেক্ষা কর তো রঘু, আমি আসছি।' বলে ফের ঘরে ঢুকে গেল সে। আয়নার সুমুখে বসল। ক্ষিপ্রহাতে সাজতে থাকল।

রতন পেছনে দাঁড়িয়ে। আয়নায় তার পাণ্ডু হয়ে ওঠা মুখের প্রতিবিম্ব পড়েছে। সে কোনো কথা বলতে পারল না। নয়নের এই কঠোর ঋজু অথচ ক্ষুরধার ব্যক্তিত্ব সে কোনোদিনই কল্পনা করতে পারে নি। যে নয়ন দুর্গামোহনের চোখের সুমুখে ফণা তোলা দূরে থাক, একটু নড়াচড়া করতেও যেন ভয় পায়।

এক সময় নিপুণ হাতে প্রসাধন শেষ করে অভিসারিকা রঙ্গনটীর মতো চঞ্চল লঘু পা ফেলে বৃষ্টির পথে বেরিয়ে গেল নয়ন। পেছনে টর্চ আর লাঠি হাতে নিয়ে রঘু তাকে অনুসরণ করল। আর রতন একই ভাবে অনেকসময় আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকল। হতবাক, ক্ষুব্ধ।

হতে পারে, সবই দুর্গামোহনের জাদুর কারচুপি, বানানো নাটক একটা— কিন্তু রামসহায়ের ঘরে অনেকদিন পরে নাচতে নাচতে নয়ন যেন একটা দারুণ স্বস্তি অনুভব করছিল। পরিবারে কিছু ঘটে গেলে যেমন বিশ্রী গুমোট স্তব্ধতা—অথচ কার দোষ কেউ জানে না, তেমনি অস্বস্তির পর—কিংবা হঠাৎ কোনোরকমে কুঁকড়ে যাওয়া গ্রন্থিটা খুলে গেলে—যেমন জলে ডুবে থাকার পর মাথা তুলে নিশ্বাস নেবার সুখ, সেই সুখ ছিল এই মজলিশে। রামসহায়ও গানবাজানার বড় সমঝদার। তার ঘরে যন্ত্র ও যন্ত্রীর অভাব ছিল না। অনেক বছর আগে একসময় সে দুর্গামোহনের আড্ডাতেও এসেছে বারকয়েক। ক্রমশ মনে পড়ছিল নয়নের।

দুর্গামোহন রতনকে একদিন বলেছিল—'নয়ন জাহান্নমের আগুন। বাইরে নিয়ে গেলে দুনিয়াটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে।'

রামসহায়ের মজলিশটা জ্বলছিল তেমনি করে।

অথচ নটী মেয়ে তো ঘরের মেয়ে নয়, সে বাইরের। সে বাইরে না এলে তার কী মূল্য? এবং বাইরে এসে সে যখন জ্বলে—সে নরককেই প্রকাশ করে। তখন লালসা ইন্দ্রিয়কে পিচ্ছিল করে। বিন্দু বিন্দু জমে ওঠে। তাকে সামলাতে আরেক গরলও তখন জরুরি হয়ে ওঠে। এইসব কথা দুর্গামোহনই বলতো দিনের পর দিন—যখন তার হুঁশ থাকতো।

নরকের আগুনকে সুমুখে দেখে সে আসরে হাত ধরাধরি করে এলো তার অনুচরগণ। সরগরম হয়ে উঠেছিল রামসহায়ের বাগানবাড়ি সে রাতে। তারপর শেষরাতে বাড়ি ফিরল দুর্গামোহন—সঙ্গে রঘু আর নয়ন। নয়ন ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখল রতন ঘুমোয় নি। তার পক্ষে ঘুমোনো সত্যি অসম্ভব। সে হয়তো মুহূর্তে মুহূর্তে অস্থির হয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেই নিজেকে দংশন করেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণের পর এখন যেন সে ক্লান্ত। নয়নকে শাড়ি বদলাতে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিল দেয়ালের দিকে।

নয়ন পাশে গা ঘেঁষে বসে বলল— 'এখনো জেগে আছো যে? ভাবছিলাম, দরজা খুলবে কি না! যে ঘুম তোমার!'

রতন কথা বলল না।

'ইস, পুরুষের রাগ হয়েছে দেখছি!' ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল নয়ন।

রতন তবু চুপ করে থাকল।

নয়ন দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল রতনকে। রতন এবার ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল—কিন্তু নয়ন নিবিড়ভাবে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষছিল—বলছিল—'বিশ্বাস করো, আমি তোমার, তোমারই আছি। সারাজীবন ধরে তোমারই থাকবো। হাতে তুলে যে সিঁদুর আমার সিঁথিতে দিয়েছো, প্রাণ গেলে আমি কি তার অমর্যাদা করতে পারি?' বিহ্বল কণ্ঠে অপরূপ ভাবাবেগে কথা বলছিল নয়ন। বলছিল— 'উপায় ছিল না আমার। বাবুর অপমান আমি সইতে পারি নে। তবু যদি এটা অপরাধ বলে মনে করো, ক্ষমা চাচ্ছি—আমাকে ক্ষমা করো তুমি....'

একসময় তাকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল রতন। স্খলিত কণ্ঠে বলল— 'দেহ অশুচি হলেও তাকে আমি ঘৃণা করতে পারি নে নয়ন—কারণ ও তো জানোয়ারের আহার। কিন্তু মনের অশুচি আমি সইতে পারি নে—মনেই যে মানুষের সারবস্তু।'

'তুমি জ্ঞানী মানুষ—ভুল করো না গো। মন আমার অশুচি হয় নি....'

'হয়েছে। তোমার মনের সবটুকু তুমি কি বিলিয়ে দাও নি, যতক্ষণ আসরে নাচ-গান করছিলে?'

নয়ন এ কথার জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না।

'যতক্ষণ তুমি বাঈজী সেজে থাকো, ততক্ষণ তুমি হাজার মানুষের; কারুর একার নও। অস্বীকার করতে পারো?'

'আমি অত বুঝি না। শুধু বলো, আমাকে ক্ষমা করেছো কি না?'

'আমার করা না করায় কী যায়-আসে তোমার?'

'তুমি যে আমার স্বামী! আমি তোমার স্ত্রী! এ কথা কি মিথ্যে?'

'স্বামী!' গর্জে উঠেছিল রতন। 'ও তো সাজানো পুতুলের নাম।'

'পুতুলখেলা এ নয়—তুমি অবুঝ হয়ো না....' উঠে গিয়ে পায়ে মাথা খুঁড়ছিল নয়ন।

রতন পা সরিয়ে নিয়ে বলে— 'থাক্। আর সতীপনায় কাজ নেই। ভোর হয়ে এলো। আমি বেরোবো।'

নয়ন দুর্গামোহনকে যত ভয়ই পাক, আসলে সে জন্মনটী। মানুষের চোখের ক্ষুধার আগুনে তার আজীবন সঞ্চরণ। এবং এই থেকে এক আশ্চর্য অহংকার তার হয়তো জন্মে থাকবে। সেই অহংকারে, সেই প্রচ্ছন্ন মর্যাদাবোধে সে তখন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল তীব্রতর। বলেছিল 'সে বোঝা গেছে খুব! অত মুরোদ থাকলে এখানে অন্যের আশ্রয়ে পড়ে থাকতে না নিজের বউকে নিযে। ওঃ, কী পুরুষ, কী তার অসম্মান জ্ঞান!' এলিয়ে পড়া খোঁপা ঠিক করে নিতে নিতে ফের ফুঁসে উঠেছিল—'এত আত্মসম্মানজ্ঞান যার, কেন সে বাঈজী মেয়েকে বিয়ে করেছিল জেনে শুনে?'

এ কথাব জবাব রতন দিতে পারে না। দেওয়া যায় না। শুধু রোখের মাথায় একটা কিছু বলতেই হয়।

সে বলেছিল—'বাঈজী আর বেশ্যা এক নয়?'

'কী বললে?' সাপিনীর মতো ফণা তুলে সুমুখে এসে দাঁড়াল নয়ন। 'বেশ্যা! আমি....'

'তাছাড়া কী?' রতন আরো ক্ষিপ্ত হয়েছে ততক্ষণে। 'তোমার জাত জন্মের কথা আমার জানতে বাকি নেই।'

নয়ন কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এ আঘাত তার জন্মের ওপর—তার মায়ের ওপব। তাতে সে মেয়েমানুষ। চিৎকার করে সে বলেছিল—'তোমারও তো জাতজন্মের ঠিক নেই মাস্টার, তুমি তোমার বাবা-মা'র নাম জানো?'

হইচই শুনে বাড়ির লোকজন বাইরের বারান্দায় হাজির। প্যাণ্টে বেল্ট পরছিল রতন—সেই বেল্টটা সজোরে নয়নের মুখ লক্ষ্য করে সে ছুঁড়ে মারল— আর বকলেসের আংটাটা কপালে কেটে বসল সঙ্গে সঙ্গে। রক্তে মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল নয়নের। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে বসে পড়ল।

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল রঘু কেষ্টারা। ইতিমধ্যে ভারি গলায় দুর্গামোহনকে বলতে শোনা গেল—'তোরা যা দিকি এখান থেকে—হতভাগা আহম্মক যতসব। ওদের স্বামী-স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব বেধেছে—ওরা নিজেরাই মিটিয়ে নেবে— তোদের কী রে?'

হয়তো হাসছিল দুর্গামোহন। সকলেই কেটে পড়েছে গুটিসুটি।

রতন মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেয়েছে এদিকে। নয়নের রক্ত দেখে তার হৃৎপিণ্ড ঝনঝন করে বেজে উঠেছে। সেও দু'হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলো—'নয়ন, ও নয়ন, আমি এ কী করলাম:' যৌবনবতী নটী নয়নের সৌন্দর্যের ওপর কলঙ্কের প্রতীক চিত্র এঁকে সেদিন বুঝি পরস্পরের একটা প্রায়শ্চিত্তের পালা শুরু।

সেই ক্ষত একদিন শুকোলো।

আয়নায় মুখ দেখে নয়ন অপরূপ হেসে উঠলো আবার। কপালে অর্ধচন্দ্র এঁকে দিয়েছে রতন জন্মের মতো। চারপাশে সবুজ পৃথিবীর নিরাবরণ সৌন্দর্য। আকাশ নীলিমায় প্রসন্ন। বাতাসে শিউলিফুলের গন্ধ আসে। রতন আর নয়ন হাত ধরাধরি করে মাঠের দিকে ঘুরে বেড়ায়। ফিরে আসে সন্ধ্যায়। চারপাশে কুয়াশার ঘন নীল দুর্গমতা। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে সেই অপরূপ দুর্গমতাকেই যেন দেখতে পায়।

সেইসময় একদিন বিরস মুখে দুর্গামোহন বাইরে থেকে ফিরে বলল, 'মা নয়ন, তোর কাছে কিছু টাকা আছে রে?'

'টাকা!' চিন্তিত মুখে স্থির দাঁড়িয়ে রইল নয়ন। তার গোপন সঞ্চয় যা কিছু ছিল, কবে নানা প্রয়োজনে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আগে দুর্গামোহন প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা তার হাতে গুঁজে দিত—ক'মাস থেকে তাও বন্ধ ছিল। দেবেই বা কোত্থেকে। আর তো কোনো আয় নেই। মোহিনী মরার সময় মেয়ের হাতে কিছু দিতে পারে নি। কিছু অলংকার তার নাকি ছিল। নয়ন শুনেছিল মাত্র। কোনো পাত্তা পায় নি তার—প্রয়োজনও ছিল না।

দুর্গামোহন যখন ফের তাকে প্রশ্ন করল, নয়ন বলল— 'দেখছি।' কিন্তু কী হবে টাকা?'

'দেনা করে পাটের জন্য দাদন দিয়ে রেখেছিলাম। দর নেমে লোকসান হয়ে গেছে।'

'মিথ্যা বলো না বাবু। তুমি ফের জুয়ো খেলেছো।' নয়ন ভর্ৎসনা করছিল। 'সেদিন না তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করলে!'

আমতা হাসল দুর্গামোহন। 'না—না, তুই বিশ্বাস কর! এ কথা সত্যি রে নয়ন। দেনা শোধ না করলে আর সম্মান থাকবে না।'

'থাকবে কী করে? এত বলছি, এতগুলো লোক রেখে কী হবে—কানেও যায় না তোমার!'

দুর্গামোহন কাঁচু মাচু মুখে মাথার পেছনটা চুলকোচ্ছিল। 'তা হলে মার খাওয়া ছাড়া আর পথ নেই মা।' নয়নের মন মমতায় করুণ হয়ে উঠল। আশ্চর্য, এই সেই কুখ্যাত ওস্তাদ জুয়াড়ি—নিয়তির মতো দুর্বার—বাঘের মতো ক্ষিপ্র আর চতুর সেই ওস্তাদ মোহন—যে ছিল এক অলৌকিক রাজ্যের সার্বভৌম রাজা! আজ যথার্থ কোনো নির্বাসিত রাজার মতো সে পরবাসে মলিন মুখে ভিখারির অধিক। আজ সে মৃত্যুর অন্ধকারে নিজের পরাজয়কে লুকিয়ে ফেলতে চায়।

আত্মধিক্কারে দুঃখে অনুশোচনায় বুক ভেঙে যাচ্ছিল নয়নতারার। সে আস্তে আস্তে বলল— 'বাবু, আমারই জন্যে এ দুর্গতি তোমার। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।'

সৃষ্টি যখন স্রষ্টার বেদনা অনুভব করে, স্রষ্টার তখন অহংকার রাখবার স্থান থাকে না। দুর্গামোহন যেন বিস্মিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকল।

'তুমি ছিলে রাজা, আমি তোমাকে পথের ধুলোয় টেনে নামিয়েছি। আমার পাপের সীমা নেই বাবু।' কাঁপতে কাঁপতে পায়ের কাছে বসে পড়েছিল নয়ন।

একদিন ওই হাতে হাজার হাজার টাকা নিয়ে দুর্গামোহন জাদুর খেল দেখিয়েছে—আজ সেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নয়নের দিকে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। যে হাত আজ শূন্য, রিক্ত, সর্বহারা।

পুণ্য নিয়ে যদি গর্ব করার থাকে, পুণ্যের যদি থাকে শ্রেষ্ঠ ফসল— সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, নীতি, এইসব উজ্জ্বলতা—তা হলে পাপের নেই কেন? পুণ্যের যেমন আলো—পাপের তেমনি অন্ধকার। আলোর রাজ্যে যেমন আছে নানা শ্রেষ্ঠ ফসল—অন্ধকারের রাজ্যেও তো রয়েছে তেমনি শ্রেষ্ঠত্বগুলি। তেমনি পালটা সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, নীতি অহংকার। আলো ও অন্ধকারের দু'টি বিপরীত মূল্যবোধ।

পাপ-পুণ্যের বাইরে না দাঁড়ালে নিরপেক্ষ বিচার কি সম্ভব? পুণ্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে পাপের ফসলগুলিকে হীন মনে করা কি ঠিক? মানুষ কিন্তু তাই করে। কারণ মানুষ যে সংকীর্ণমনা। সীমিত-খণ্ডিত তার সত্তা। পাপের বেতন মৃত্যু—পুণ্যের বেতন জীবন—ঈশ্বরের পুত্র মানুষই বলতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর তা বলেন না। বলা সাজে না তাঁর মুখে। তিনি যে সব আলো-অন্ধকারের উর্দ্ধে। তাঁর কাছে পাপের ফুলও ফুল পুণ্যের ফুলও ফুল।

ঈশ্বরের কোল থেকে সেদিন দুর্গামোহনকে যেন নিরীক্ষণ করছিল নয়নতারা। তারপর সে রতনকে বলেছিল— 'কী গো মাস্টার, তোমার সেই পুরোনো রোগটা বুঝি ভালো হয়ে গেল? আর মাথা সুড়সুড় করছে না? স্টেজে ঘন্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছো না? আলজিভে আমার নাচ দেখার সাধ বুঝি ফুরিয়ে গেল?

রতন অবাক।

নয়ন দুর্গামোহনকে বলেছিল—'বাবু, তাঁবু বের করো।'

'সে কি রে?'

'হ্যাঁ। আবার আমরা বেরুবো।'

'রতন যে রাগ করবে।'

'রাগ করবে কী! উপোস করে তো মরতে চাইবে না। এবার আমরাও বাঘ সিঙ্গি রাখবো দলে। ও তাদের নিয়ে খেলা দেখাবে। তা ছাড়া আর কি করবো বলো তো আমরা?' ভ্রূভঙ্গি করে নয়ন বলেছিল—'না জানি মজুর খাটতে, না জানি মাটি কোপাতে ধান বুনতে। শুধু জানি ওই খেল খেলোয়াড়ি। সংসারে নিজের বিদ্যা ভাঙিয়ে কে না খায়। নইলে পেটে কাপড় বেঁধে পড়ে থাকতে হয় যে।'

আবার গুটানো তাঁবুর জগৎ মুখব্যাদান করে দাঁড়াল। রতন একমাসের মধ্যেই কলকাতা থেকে ফিরে এলো ওই ওসমান খাঁ বাঘ, বুঢ়ুয়া সজারু আর আমিনা সাপিনীকে সংগ্রহ করে। পূর্বপরিচিত কোনো বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে সুলভ দামে এদের কিনে আনল সে। তারপর মেলার মরশুম এলে সে নিজেই তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো' পার্টির নতুন অবদানের কথা ঘোষণা করল।

আবার দেশ থেকে দেশান্তর। মেলা থেকে মেলায়। শহর থেকে গ্রাম। হাজার হাজার মানুষ—চোখে তাদের দারুণ ক্ষুধা। হাজারকণ্ঠের উল্লাস—হাততালি। কানে তালা ধরে যায় বার-বার। কী দুঃখ, এই উমোহময়ল্লাসের জগৎ ফেলে কোথায় নামহীন পরিচয়হীন বিস্মৃতির মধ্যে বাস করছিল তারা দীনহীন বেশে!

তখন ভাগ্যের ঘরে নীলাভ আলো অনির্বাণ জ্বলছে। পাশার ছকের ওপর হাড়েব গুটি ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে হাসছে ওস্তাদের ওস্তাদ রাজার রাজা জুয়াড়ি দুর্গামোহন। তখন হাজার রামসহায় তার করুণার প্রার্থী।

এবং তখন শেষ রাতে সব খোয়ানো মানুষের হাহাকার আর কান্নার ধ্বনি ঢেকে নয়নের খিলখিল হাসি ভেসে উঠেছে বার বার।

১০

তবু নয়নের গা ছমছম করে।

উইংসের পাশে খাঁচার ভেতবে ওসমান খাঁ বাঘটা নীল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নাচতে নাচতে পাশ ফেরে নয়ন। আড়চোখে তাকায়। দেখতে পায় নিষ্পলক ওই দুটি নীল আগুন। তাল কেটে যায়। বুড়ুয়া সজারুর কাঁটার শব্দ ওঠে অন্ধকার থেকে। ওদিকে আমিনা সাপিনী তারের জালে বসে অবিশ্রান্ত মুখ ঘষছে—তার বিরাট তে-কোনা মাথার নীচে লকলক করে কাঁপছে বেগুনি জিভটা। নয়নের মনে হয় অন্ধকারে যারা আছে—যারা ছিল এতদিন—হয়তো এই তাঁবুর জগতের পেছন থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একটা সীমান্তে দাঁড়িয়েছে তারা। অপেক্ষা করছে বাইরের আলোতে আসবার জন্যে।

নয়নের গা ছমছম করে। তাল কেটে যায় বার বার।

তবলচি হাফিজ খলিফা ডেনোয় চাঁটি মেরে সামলে নেয়। দুর্গামোহন নিঃশব্দে ভুরু কুঁচকে নয়নকে ধমকাতে গিয়ে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে জন্তুগুলিকে নিরীক্ষণ করে। হয়তো তারও গা ছমছম করে।

দিনের বেলায় স্টেজে জন্তুদের টেনে বার করে রতন। জন্তুগুলি কী কী খেলা জানে, কী তাদের স্বভাব বা অভ্যাস—সবই সে পকেটবুকে লিখে এনেছিল কোম্পানির কাছ থেকে। একে একে মিলিয়ে নেয় প্রতিদিন। গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করে—নতুন জায়গায় নতুন কী অভ্যাস ওদের গড়ে উঠছে। তারপর নিজের জানা খেলাগুলিতে তালিম দেয়।

'এ বড় সাধনার বস্তু।' রতন দুর্গামোহনকে বলে। কখনও ইংরেজি বলে ওঠে সে। 'গ্রেট এশিয়ান সার্কাস'-এর মাস্টার খেলোয়াড় রতন বোস এই জন্তুগুলি আসবার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছিল। এতদিন যেন বড় সংকোচে সে কালযাপন করেছে। একটা ছোট্ট নাচ-গানের বা ভ্যারাইটি শো পার্টিতে তার মূল্যও ছিল যৎসামান্য। দুর্গামোহন তাই বিস্মিত চোখে চেয়ে বলে—'যন্ত্র ছাড়া যন্ত্রীর রূপ কি জানা যায়?

রঘু কেষ্টা ভূপতি এমনকি চাপাটিটাও সহায়তা করে রতনকে। পার্টির ইজ্জত যে বহুগুণে বেড়েছে, এই গর্বের শরিক তো তারাও। বাইরে বুক ফুলিয়ে বলে—'এ তোমার চার পয়সা টিকিটের ঝুমঝুমির খেল নয়—দস্তুরমতো জন্তু জানোয়ারের দল।'

পাশের ম্যাজিকওয়ালা ছোকরাটা মন্তব্য করেছিল—তবে বনে গেলেই পারো, এখানে কেন?

চাপাটিকে পারা দায়। সে অমনি বিকট হাঁ করে জবাব দিয়েছিল—'মানুষ খেতে।'

ওসমান খাঁকে দু'পা তুলে দাঁড়ানো অভ্যাস করাচ্ছিল রতন। এই চাপাটি তখন সোৎসাহে ছুটে গিয়ে পা'দুটো ধরে তুলে ফ্যালে আর কি! কিন্তু ওসমানেরও একটা পছন্দ অপছন্দ রয়েছে—বনের জন্তু হলে কী হয়। সে অমনি এমন হাঁকরালো—তাঁবু তোলপাড় —চাপাটিও লাফ দিয়ে 'বাপ' বলে স্টেজের নীচে গিয়ে পড়েছিল। নয়ন হেসে বাঁচে না।

রতন ডেকেছিল—'নয়ন, এদিকে এসো তো। প্লিজ হেলপ মি, ডালিং।'

নয়ন চোখ বড় বড় করে আরও দূরে সরে গেল। 'তুমি ইংরেজিই বলো আর উর্দুই বলো—আমি ওদের সাতে পাঁচে নেই। বাব্বা, বুনো জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই।'

'এবার বুনো জানোয়ারের সঙ্গেই ঘর করা হবে কিন্তু।' রতন সকৌতুকে বলল।

'ঘর কি আর করছি না! ওই করেই জীবন গেল আমার।'

'তবে ভয় পাচ্ছো কেন?'

নয়ন কটাক্ষ হেনে নটীপনা করে জবাব দিল—'সে তো রাতের ব্যাপার। দিনে কী?'

'ফাজিল মেয়ে!' মৃদু হেসে ফের জন্তুগুলির প্রতি মনোনিবেশ করতে থাকল রতন। 'ইউ ওসমান খাঁ—ইউ আর অ্যান ওল্ড ম্যান.. অ্যান্ড ইউ মিস আমিনা—ইউ আর এ বিউটিফুল গার্ল...অ্যান্ড হিয়ার ইজ দি ফুলিশ চ্যাপ—এ ক্লাউন—মাস্টার বুদ্বুয়া!'

দুপুর গড়িয়ে গেছে। চাপাটি ডেকে গেছে ক'বার। রতনের হুঁশ নেই। ওদের নিয়ে সে মেতে থেকেছে। এদিকে নয়ন স্নান করে ধবধবে সাদা শাড়ি পরে রোদে চুল শুকোচ্ছে। কপালে উজ্জ্বল লাল মোটা টিপ—সিঁথি পূর্ণ করে সিঁদুরের রেখা। কাঁটাতারের বেড়ার (নতুন দেওয়া হয়েছে ক'দিন থেকে) ওপাশে মেলার দোকান থেকে কারা কোঁচকানো চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। নয়ন জানে—ও তাকানোতে ঘৃণা ঈর্ষা যত—তত লোভ লালসা কাতরতা।

সে একটু হাসলে ওই দৃষ্টিগুলি নিমেষে বদলে যাবে। মানুষের চোখ যে আকাশের মতো। যে ভাবের মেঘ জমাই, সাদা কালো ধূসর নীল লাল হলুদ যেমন রঙ—তেমনি ফোটে পলকে পলকে। কখনও অস্থির—কখনও শান্ত। আবার কখনও ঘন নীল—শূন্য গভীর ভাবহীন! মাঝে মাঝে দুর্গামোহনকে সে যে চোখে তাকাতে দ্যাখে।

সে রাতে একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখল।

ঘন গহন দুর্গম এক অরণ্যের মধ্য দিয়ে 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো' পার্টি চলেছে। কিংবা সে একা। কিংবা যেন সঙ্গে রতন আর দুর্গামোহন চারপাশে অসংখ্য জানোয়ার—সাপ বাঘ সজারু সিংহ। যেদিকে চলে দেখতে পায় একই দৃশ্য। অথচ তাদের আক্রমণ করছে না কেউ। ...তারপর দেখল দুর্গামোহনকে। দুর্গামোহন না অন্য কিছু...অদ্ভুত একটা সত্তা... বাঘের চেয়ে ভয়ানক—ছুটে পালাতে গিয়ে পা ওঠে না...'বাবু, বাবু তুমি অমন করছো কেন...' আক্ষেপে দুঃখে অভিমানে সে কেঁদে উঠেছে...

রতন ডাকছিল—'নয়ন, নয়ন কী হ'ল?'

জেগে উঠে দেখল তাঁবুর দরজার বাইরে শেষরাতের আকাশে দেখা যাচ্ছে জ্বলজ্বল করছে একটি নক্ষত্র।

'স্বপ্ন দেখছিলে?'
'হ্যাঁ।'
'কী স্বপ্ন?'
'মনে নেই।' স্বপ্নটা বলতে লজ্জা করছে তার।

কিন্তু যা অন্ধকারের বস্তু—আলোয় আনলে তাকে যত কুৎসিতই দেখাক, গা ছমছম আর থাকে না একসময়। নইলে গেরস্থ ঘরের মেয়ে-বউ একদিন বেশ্যা হয়ে শহরের গলিতে সেজেগুজে দাঁড়ায় কোন সাহসে? যতক্ষণ পাপ, দুঃখ বা ঘৃণা অন্ধকারে পুষেছি—ততক্ষণ সে ভয়ানক। নিজের বা অন্যের কাছেও। আলোতে এনে দেখি তার রূপ গেছে বদলে। ধার গেছে ক্ষয় পেয়ে। তাকে দেখাচ্ছে সবচেয়ে করুণ আর অসহায়।

তাই ভয় কাটছিল।

তখন দেখা যাচ্ছিল—আসলে ওই বাঘটা দু'খণ্ড মাংস পেলেই তো কৃতজ্ঞ। চাপাটির সঙ্গে তার আর দুশমনি নেই। সাপটা গলায় ঝুলে থেকে আরাম পায়। সজারুও তার কাঁটার পালক গুটিয়ে নেয়।

এ-ভয় নয়ন, দুর্গামোহন বা তার পার্টির লোকজনেরই একান্ত নিজস্ব ভয়। মনের বনে যে জন্তুগুলি রয়েছে, এ-ভয় আসলে তাদের প্রতি ভয়ের প্রতিচ্ছবি—বাইরের দর্পণে প্রতিফলিত। এবং তা ক্রমে ক্রমে কেটে যাচ্ছিল।

চাপাটি বাঘটাকে খেতে দিয়ে তাই খিস্তি করতো—'এক কান কাটলে মানুষ চলে গাঁয়ের বাইরের পথে—দু-কান কাটার চলা সদর রাস্তায়। দড়ি জোটে না তোর গলায় রে বুড়োটা?'

রতন মিটিমিটি হাসতো—'গাল দিচ্ছিস কেন রে ইডিয়ট?'

'ও শালা এক পাক্কা জুয়াড়ি ছিল বাবুর মতো। তাই রামসহায়ের সেই বাঁধন পড়েছে গলায়।'

রতন ধমকাতো—'চুপ, চুপ! শুনলে তোর পিণ্ডি চটকে দেবে বুদ্ধুর বাচ্চা কাঁহাকা!'

চাপাটি তখন নয়নের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলতো—'দিদি, একটা মজার কথা শুনবে?'

'কী রে?'

'ওসমান খাঁর মুখখানা দেখেছো? একেবারে যেন...ইয়ে'...ঢোক গিলে চাপাটি বলতো—'মারবে না তো?'

'মারবো কেন রে ছোঁড়া? বল না!'

চাপাটি চারপাশটা দেখে নিয়ে চতুর চোখদুটি পিটপিট করে বলতো—'দুগ্‌গামোহন পাঞ্জাবি।'

নয়ন হেসে খুন। 'কিন্তু পাঞ্জাবি কেন রে?'

'ওম্মা, তাও জানো না বুঝি, লোকে বাবুকে ওই নামেই চেনে যে। সকালে বাজারে গিয়েছিলাম কেষ্টদার সঙ্গে। লোকে আমাদের মুখপানে সব হাঁ করে চাওয়া-চাওয়ি করছে ঃ তোমরা দুর্গামোহন পাঞ্জাবির লোক না? তা এবারে বাঘ ভাল্লুক এনেছো দেখেছি, গত বছর তো ছিল না—ব্যাপারটা কী?'

'তুই কী বললি?'

'বললাম—এবারে যে বড় সার্কাসের খেলোয়াড় সঙ্গে আছে—রতন মাস্টার। কোন রতন? সেই সিঙ্গিওলা রতন বোস? হ্যাঁ সে ছাড়া আর কে। এ দলে জুটলো কেন? চোখ পাকিয়ে বললাম—জুটবে না কেন? বেজাত নাকি আমরা? শুনে শালার মামদোরা... চাপাটি হঠাৎ চুপ।

'শুনে কী বলল?'

'রাগ করবে না তো?'

'না রে না, তুই আমার ছোট ভাই'—নয়ন গাল টিপে দিত।

'বলে—ছিঃ সে বড় অসভ্য কথা নয়নদি। তোমার কুচ্ছো।...'

কুচ্ছো সারা জীবন ধরে নয়ন কি কম শুনেছে? কিন্তু বিয়ের পর থেকে এমন কথা শুনলে তার হৃৎপিণ্ডটা খুবই নাড়া খেত। দুঃখে অভিমানে অনেকটা সময় স্তব্ধভাবে বসে থাকত সে। কান্না পেত তার। এক সময় আয়না তুলে সিঁথির সিঁদুরটা লক্ষ্য করত। আর কখন এক অপরূপ অনুভূতিতে মন পূর্ণ হয়ে উঠত—লোকে যাই ভাবুক, আমি যে এয়োতি— আকাশের তলে আমারও একটা সংসার রয়েছে—সংসারি ইচ্ছা-বাসনা রয়েছে।

চন্দনপুরের মেলায় পৌঁছতে তখন সবে ফাল্গুন মাস পড়েছে। রাতের দিকে অল্প অল্প শীতের আমেজ থাকে। দিনের রোদ বেশ মিঠে। থেকে থেকে দক্ষিণের বাতাস আসে। গা শিরশির করে ওঠে। পাতা ঝরে পড়ে অশ্বত্থের তলে। তাঁবুর সুমুখে খোলা আকাশের নিচে তাস পিটতে থাকে রঘু কেষ্টরা। ভাড়াটে ব্যান্ডপার্টির লোকজন নিজ নিজ রঙিন পোশাক মেলে দিয়েছে ঘাসের উপর রোদে। অশ্বত্থগাছের পাশে উনুন জ্বেলে ভূপতি বাটনা বাটছে। নয়ন একা তার তাঁবুতে বসে একটা নতুন গান ঠিক করে নিচ্ছিল।

দুর্গামোহন থানায় চলে গিয়েছিল। নতুন জায়গা। ভাগ্যের ঘর সামলানোর ঝুঁকি অনেক। গুণ্ডামি-বাটপাড়ির ভয়ও রয়েছে। সবদিক সামলাতে হয় তাকে।

সেই সময় রতন এলো টলতে টলতে। 'আরে ক্যা মজাকা বাত—এ মেলায় জোর কম্পিটিশন!'

নয়ন মুখ তুলে প্রশ্ন করল—'তার মানে?'

'তোমার পাল্লাদার—সরি, পাল্লাদারনিগণ। এই দ্যাখো, ছোট ছোট তাঁবু ক'খানা।'

'ও কাদের?'

'সময় হলে দেখতে পাবে। খোপে খোপে এখন পোষা পায়রার মতো বকবকম করছে।'

একটুখানি দেখে নিয়ে নয়নের ভুরু দু'টি কুঁচকে গেল। ঝুমুরের দল এসেছে একটা। এর আগেও এসেছে অনেক মেলায়। কিন্তু 'পাল্লাদারনি কথাটা কেউ বলে নি। কেউ তাদের সঙ্গে নয়নকে তুলনা করে নি। আশ্চর্য, রতন তাকে এ কথা বলতে পারল?'

ক্ষোভে দুঃখে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল সে। নিষ্পলক চোখে হারমোনিয়ামের রীডের ওপর খোলা খাতার পাতায় তাকিয়ে থাকল। অক্ষরগুলি অর্থহীন হিজিবিজির ন্যায় তার চোখে ভাসছিল।

রতন একবার ঝুঁকে দেখে বলল—'আরে বাঃ বাঃ, কেত্তন মনে হচ্ছে? তাহলে পাল্লাটা জমবে ভালো। ওরা তো কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়েই গায়। মাইরি, অমন কাঁচা রসের খিস্তি তো আর কোথাও মেলে না!'

হয়তো সহজভাবেই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল রতন। কিন্তু নয়নের কানে তা গরম সিসার মতো প্রবেশ করছিল। সে ক্রমশ বধির হয়ে পড়ছিল।

রতন অপটু কণ্ঠে গুনগুন করল ঃ সই কেমনে ধরিব হিয়া। আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া। তারপর বলল—'গানটা তো বেশ। কার রচনা? গুণী লোক ছাড়া এ কম্মো কার..প্রণাম।'

এই সকাল বেলায় কয়েকপাত্র গিলেছে। ঘৃণায় অভিমানে নয়ন বলে উঠল—'এখানে বসে বসে শোনাচ্ছ কাকে? ওখানে যাও না—শুনতেও পাবে অনেক!'

রতন হেসে উঠল হো হো করে—'ইয়েস, রাইট ইউ আর। আই মাস্ট গো—আমি যাব। কিন্তু বড় গা ঘিনঘিন করে মাইরি...কী নোংরা!'

'একখানা সাবান সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।'

'সাবান? ইয়েস। অ্যান্ড এ বটল অফ সেন্ট। কিন্তু তখন আবার হইচই বাধাবে না তো? আমি সব সইতে পারি বাবা, কেবল ইজ্জতের বদনাম শুনলে বুকে ছুরি মারতে ইচ্ছে করে!'

'ইজ্জত তোমার আছে?'

রতন কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল—'ইয়েস! আলবৎ আছে। গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের মাস্টার রতন বোসের ইজ্জত নিয়ে জুয়া খেলা যায় না—এর দাম অনেক।'

কান লাল হয়ে উঠেছিল নয়নের। সে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে থেকে বলেছিল—'দাম যদি আছে, তবে আমার মতো একটা বেশ্যার কাছে পড়ে আছো কেন?'

রতন লাফিয়ে উঠেছিল—নো, নেভার। 'তুমি আমার বিয়ে করা বউ। রীতিমতো মন্ত্র পড়ে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করেছি।'

'বিয়ে করা বউ! বিয়ে করা বউকে ঝুমুরওয়ালির সঙ্গে তুলনা করে না কেউ।' নয়ন মেয়েমানুষ। কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে তার পক্ষে যা সহজ, তাই সে বেছে নিয়েছিল সে মুহূর্তে। কেঁদে উঠেছিল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

কান্না দেখে রতনের জেদ হঠাৎ বেড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। হয়তো সে ভেবেছিল—নয়ন যখন ভেঙে পড়েছে—সেই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ তার আচ্ছন্ন মেয়ে-বিবেকে চাবুক মেরে চাঙ্গা করাই উচিত হবে। তাতে সে মদ খেয়েছিল খানিক। 'কেন তুলনা করব না ডার্লিং? কাল রাতে তুমি কী করছিলে? অন্য রাতের কথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। মানুষকে বাধ্য হয়ে ডিউটির খাতিরে অনেক কিছু করতে হয় আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। রাতের পর রাত তুমি আমার চোখের সুমুখে অন্যের সঙ্গে ঢলাঢলি করেছ, গায়ে গা মিশিয়েছো—তারা তোমায় জড়িয়ে ধরেছে...আই নেভার মাইন্ড ফর দ্যাট। বাট...বাট...লাস্ট নাইট, লাস্ট নাইটে তুমি ধরা পড়ে গেছ।'

নয়ন একবার তাকিয়ে মুখ নত করল।

'ভেবেছিলাম—হোয়াট ইউ ডু, ইউ ডু অর সেক অফ ইওর পার্টিস বিজনেস। বাট লাস্ট নাইট...আমি পর্দার ফাঁকে চুপি চুপি দেখি, ও মাই গড, সেভ মি...' রতন একহাতে তার চোখ ঢাকল। 'এ টেরিবল সীন অফ মাই মার্ডার—আমি...আমি বুক চাপড়ে কেঁদেছি। ইয়েস—আই নেভার ক্রায়েড সো ইন মাই লাইফ—আই অ্যাম অ্যান অরফ্যান ইন দিস ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ড...'

নয়ন শ্বাসক্লিষ্ট কণ্ঠস্বরে বলে উঠল—'কী, কী দেখেছিলে তুমি?,

'ইউ কিসড দ্যাট ইয়ংম্যান—এই মেলার মালিকের পুত্র—দ্যাট হামবাগ—অ্যান্ড দি ওল্ড টাইগার একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মাত্র—খুশি হ'ল—আর আমি কেঁদে ফেললাম —বিলিভ মি...'

নয়ন কিছুটা সামলে নিয়েছিল। সে আস্তে আস্তে বলল—'তুমি ভুল বুঝেছো।'

'অ্যাম আই ফুল? ওই শয়তানটা তোমায় হুকুম দেয় নি বুলু দত্তকে তোয়াজ করতে? চুমু খেতে?'

'ওটা আমার চাকরি।' নয়ন হাসবার চেষ্টা করছিল।

রতন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'ও চাকরি চলবে না। আই সে, ইউ স্টপ ইট, নইলে...'

'কী করবে? খুন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে রতন চাপা গলায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল—'চাকরি! চাকরির জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিতে হবে—এ সহ্য করা অসম্ভব। আই উইল সী দ্যাট ওল্ড টাইগার, আই প্রমিস।' টলতে টলতে চলে গেল সে। নয়ন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দেখল—কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ফাঁকা জমিটাতে দাঁড়িয়ে আছে বুলু দত্ত আর দুর্গামোহন। দুর্গামোহন ছড়ি দিয়ে জায়গাটা বারবার দেখাচ্ছে। হয়তো পার্টির জন্যে আরও খানিক জায়গার দরকার—তারই আলোচনা চলেছে দু'জনের।

নয়ন আরও দেখল—রতন পকেট থেকে বোতল বের করে ঢকঢক করে মদ গিলল। তারপর বোতলটা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। সে হনহন করে বাজারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পালিয়ে যাচ্ছে না তো? অজানা উৎকণ্ঠায় নয়নের বুক কাঁপছিল।

বুলু দত্ত এগিয়ে এলো। 'নমস্কার মিস নয়নতারা।'

হাত তুলে মৃদু হেসে নয়নও নমস্কার করল। তাঁবুর সুমুখের খাটিয়াতে একটা সতরঞ্চিও বিছিয়ে দিল সে। দুর্গামোহন এসে বলল—'একটু চা-টা দেবে নয়নমণি?'

সত্যি বলতে কি ততক্ষণে নয়ন রীতিমতো আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে তাঁবুর জগতে যে নীলাভ আলোয় ভরা ভাগ্যের ঘর রয়েছে—সেখানে বাস করে এক রঙ্গনটি। যেন অলৌকিক মায়ায় তার জন্ম—অলৌকিকে তার লয়। তার কাছে পুরুষের নাম শুধু পুরুষ—লীলামৃগয়ার সঙ্গী। সে বুলু দত্ত নয়, রতন নয়, রামসহায় নয়। সে নামহীন। তাই আত্মসমর্পণ করায় কোনো দুঃখ নেই, ঘৃণা নেই, দ্বন্দ্ব নেই তখন। বিবেক-অবিবেক, ধর্মাধর্ম পাপ-পুণ্যের সে বাইরে। সে যে শুধু দুর্গামোহনের মায়াকন্যা।

কিন্তু দ্বন্দ্ব আসে, ঘৃণা আসে, দুঃখ আসে—যখন সেই অলৌকিক সত্তার আবরণ ফেলে দিনের আলোকিত পৃথিবীতে বেরিয়ে আসে এক নারী—তার নাম নয়ন। কারণ স্মৃতিকে তো বিসর্জন দেওয়া যায় না। স্মৃতি যেন দুই জগতের মধ্যে এক বিলম্বিত সেতুর মতো বিস্তৃত।

এবং স্মৃতি ক্রান্তিদর্শী ঈশ্বরের ন্যায় পরাক্রমশালী। সে বলে—আমি আছি। সে থাকে জরামরণহীন, অনিবার্ণ, শাশ্বত।

দুর্গামোহন হাঁ হাঁ করে উঠল, 'আহা, দোকানের চা কেন? তুই নিজের হাতে কর।'

চাপাটি কেটলিটা নয়নের হাতে এক রকম ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল—বুলু দত্তের পেছনে বক দেখাতে দেখাতে। হাসি পাচ্ছিল না নয়নের। তার জানু ভারি বোধ হচ্ছিল—পা কাঁপছিল। হৃৎপিণ্ড ধকধক করছিল। যেন দিনের আলোর পৃথিবীতে—যখন সে নিজেই নিজের সম্রাজ্ঞী—দুর্গামোহন হঠাৎ প্রবেশ করে তাকে ক্রীতদাসী বলে তিরস্কার করছে।

একসময় কম্পিত হাতে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে সে একপাশে দাঁড়াল। বুলু দত্ত বলল—'আপনি খাচ্ছেন না?'

মাথা নাড়ল নয়ন। 'একটু আগে খেয়েছি।'

'মাস্টার বোস কোথায়? তাকে দেখছি না যে?'

নয়ন মৃদুস্বরে বলল—'বেরিয়েছে কোথায়।

দুর্গামোহন রঘুকে ডাকছিল, 'হারমোনিয়ামটা স্টেজে নিয়ে চল তো বাবা।'

নয়ন বিস্মিতভাবে বলল—'স্টেজে কী?'

'বাবুজি এলো—একটু গানটান শোনা...'

'খলিফা যে নেই। সে আসবে বিকেলে। বাজাবে কে?'

'কেন? আমার ঠেকা বুঝি পছন্দ হয় না?' দুর্গামোহন হেসে উঠল।

আড়ষ্ট গলায় কয়েকখানি গান শোনাতে হয়েছিল নয়নকে। শেষে মাথা ধরেছে বলে উঠে পড়েছিল। বুলু দত্ত যাবার সময় একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়েছিল তার হাতে। পরে দলাপাকানো নোটটা মুঠোয় নিয়ে দুর্গামোহনের দিকে তাকাতেই দুর্গামোহন বলেছিল—'তোর বখশিশ—রেখে দে।'

রতন ফিরল একেবারে বেলা গড়িয়ে। কোথায় ছিল কে জানে। কোনো প্রশ্ন করে নি নয়ন। রতনও তাকে কোনো কথা বলেনি। দু'জনে গুমোট মুখে বসে ছিল চুপচাপ। নয়ন ভাবছিল—পুরুষের মন এত অবুঝ, তা যদি সে আগে জানত! আশ্চর্য, এতদিনেও রতন তাকে স্পষ্ট করে চিনতে পারল না? সবচেয়ে খারাপ লাগছিল যে ওই রতন তা হলে রাতের পর রাত চুপিচুপি ভাগ্যের ঘরে উঁকি মেরে নয়নের কার্যকলাপ দ্যাখে। ছি ছি কী ঘেন্নার কথা? যে এত সুন্দর—তার মন অতটা কুৎসিৎ, সে ভাবতেও পারেনি।

দুর্গামোহন তাঁর তাঁবু থেকে ডেকে বলল—'সকাল সকাল শো আরম্ভ করব আজ—তোরা তৈরি হয়ে নে।'

মেলায় ঝুমুর এসেছে বলেই হয়তো সে রাতে অত ভিড় ছিল। হল্লা হই-চই উল্লাসে ফেটে পড়ছিল রাতের মেলাটা। উজ্জ্বল আলোয় একটা বিরাট পদ্মফুল অন্ধকারের সরোবরে ফুটে উঠেছিল যেন। না কি অগ্নিচাঁপা ফুল? উত্তাপে উত্তেজনায় উচ্ছ্বাসে থরথর কম্পিত। মত্তমাতাল জনতা থেকে থেকে চিৎকার করছিল বিকটভাবে। আর জীবনে যা কোনোদিন করেনি, তাই করেছিল নয়ন সে রাতে।

শো শেষ হয়ে গেলে যখন ভাগ্যের ঘরে নতুন উত্তেজনা শুরু হয়েছে সে বারবার চুপিচুপি পর্দা তুলে বেরিয়ে এসে রতনের খোঁজ করছিল।

না, শেষ শো'র পর থেকে রতনের পাত্তা নেই। তবে কি সত্যি-সত্যি ঝুমুরওয়ালিদের ওখানে গিয়ে জুটেছে? শেষ চাপাটিকে চুপিচুপি কথাটা বলে ফেলেছিল সে। একটু পরে চাপাটি ফিরে এসে বলল—'হীরের তাঁবুতে গড়াচ্ছে রতন দা।'

'হীরা? সে কে?'

'ওই যে বিড়ালচোখো ছুঁড়িটা...'

'তুই চিনলি কী করে?' নয়ন চেষ্টা করে হেসে উঠল অবশেষে।

'দুপুরে গিয়ে ভাব করে এসেছি—মাইরি নয়নদি!'

'ভাব করে এসেছিল তো—এখন গলা ধরে শো গে না হতভাগা!'

চাপাটি তার ছেলেমানুষি ভুলে-টুলে ঘোড়েল আর চতুর কণ্ঠে ফিস ফিস করে বলল— 'পাত্তা দিচ্ছে না। বলে, ছেলেমানুষ—গাল টিপলে দুধ বেরোয়—মাইরি কাপড়-জামা তুলে...'

চূড়ান্ত তুখোর হাবভাব দিয়ে নয়ন তার তীব্র অনুভূতিগুলি ঢেকে রাখতে চাচ্ছিল! তার দাঁতে দাঁত ঘষা খাচ্ছিল। সে চাপাটিকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল—'ইতর কোথাকার! আমি তোর দিদি না?'

চাপাটি যেন অতর্কিতে নয়নের একটা হঠকারী প্রশ্রয়ের রজ্জু অবলম্বন করে কোনো পরিণতির দিকে ওঠবার চেষ্টা করছিল। হয়তো আর খানিক অগ্রসর হ'ত সে—এইসব আকাশ থেকে খসে পড়া ছেলেগুলির ভাগ্যে যা ঘটে থাকে পৃথিবীতে কিন্তু চরম মুহূর্তে সামলে নিয়েছিল নয়ন। এই করে কি সে রতনের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে?

যখনই ধরা পড়ে গেল এ কারচুপি—সে দ্রুত লাক-রুমের পর্দা তুলে ঢুকে গেল। বুলু দত্তর পাশে বসে বোতল থেকে মদ ঢালল গেলাসে। বুলু দত্ত একটা সোডাওয়াটারের বোতল খুলে মিশিয়ে দিতে দিতে বলল—'মেয়েদের অত কড়া খেতে নেই। ভিরমি যাবেন!'

হয়তো অমনি একটা কিছু চেয়েছিল নয়ন। সে চুপি চুপি বারবার গেলাসটা পূর্ণ করে তক্তপোশের নীচের আঁধার অংশে মুখটা ঝুঁকিয়ে মদ খাচ্ছিল। একসময় খেলার খুব জমাটি মুহূর্তে যখন বুলু দত্ত মোটা দান ধরেছে, নয়ন মাথায় হাত দিয়ে বমি করে ফেলল।

এরপর স্বভাবত খেলা জমতে পারে না। বেহুঁশ নয়নকে নিয়ে রঘু কেষ্টরা তখন ব্যতিব্যস্ত। দুর্গামোহন সব সামলে বেরিয়ে এলো একসময়। গর্জন করেছিল সে—'হারামজাদি, শয়তানি...' তারপর লাথি তুলেছিল। কিন্তু বুলু দত্ত বাধা দিয়েছে এসে। 'আরে, ও কি করছেন? ছি ছি...'

'সরে যান মশাই, ও আমার ইজ্জত ডোবাল। ওকে আমি খুন করে ফেলব!'

বুলু দত্ত তাকে ঠেলতে ঠেলতে সরিয়ে নিয়ে গেল—'পুওর গার্ল—অভ্যাস নেই হয়তো। যেতে দিন!'

রতন ফিরেছিল একেবারে রাত পুইয়ে। নয়নকে তখনও শুয়ে থাকতে দেখে সে বলেছিল—'এখনও খোয়ারি ভাঙছো দেখছি। ওঠো দিকি, একসঙ্গে দু'জনে নাইতে যাবো। গতরের পাপগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে না?'

১১

বুলু দত্ত আর হীরা উপলক্ষ্য মাত্র।

নয়ন আর রতন বুঝি পরস্পরের কাছে পৌছতে চেয়েই অন্য দু'টি মানুষকে অবলম্বন করছিল। কেবল এইটে নিজেদের কাছে স্পষ্ট হতে তখনও দেরি ছিল কিছুটা—এই যা ঝঞ্ঝাট।

চন্দনপুরের পাসের মেয়াদ ছিল একমাসের। তাতে এত বড় জমজমাট মেলা অন্য কোথাও বসে না। দুর্গামোহন রাতের পর রাত বুলু দত্তদের তিলে তিলে হজম করে যাচ্ছিল। তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও কি ওরা বুঝতে চাইবে? নেশা

ব্রহ্মতালু ভেদ করে মগজে চড়ে গেছে একেবারে। আর এই তো হয় মানুষের পৃথিবীতে। ইষ্টদেবতাকে একসময় ভুলে-টুলে বিগ্রহকেই সর্বস্ব করে তোলে মানুষ। জুয়ার কবন্ধ শিলাদেবতার বেদিতে মাথা ঠুকে রক্তপাত করছিল বুলু দত্তরা। তারপর হঠাৎ একদিন হাবুল দত্ত হাজির। বুলু দত্তর বাবা।

চন্দনপুরে বুলু দত্তর কীর্তি-কলাপ কারও অজানা ছিল না ততদিনে। কিন্তু হাবুল দত্ত অন্য প্রকৃতির মানুষ। বাইরে মেশে কম। তার কানে কথাটা কে তুলেছিল কে জানে। সে এসেই সোজাসুজি বলে বসল—'তাঁবু গোটান মশাই, নইলে আমাকে হাত লাগাতে হবে।'

দুর্গামোহন অভিজ্ঞ লোক। সে ব্যাপারটা আঁচ করেছিল মুহূর্তেই। 'আরে, কী সৌভাগ্য, মালিক মশাই স্বয়ং যে।' সে হন্তদন্ত হয়ে চেঁচামেচি করছিল—'কই রে নয়নমণি, একবার এদিকে আয়, খোদ কর্তাবাবু পায়ের ধুলো দিয়েছেন...'

হাবুল দত্ত কঠোরস্বরে বলেছিল—'ও সব রাখুন। কালকের মধ্যেই জায়গা খালি করা চাই—খোলাখুলি বলে গেলুম।'

দুর্গামোহন হাত জোড় করে বলল—'তা কী হয় স্যার, এই তো সবে এসেছি। আসর পাততেই মোটা খরচ হয়ে গেছে। তাঁবু গোটালে খাবো কী? মাইনে দেব কোত্থেকে এতগুলো লোকের। তাতে ওইসব জন্তুজানোয়ার রয়েছে—ডেলিই তাদের জন্য পঞ্চাশটি টাকা খরচ। আব আপনারও তো স্যার কম হচ্ছে না—একগজ জায়গার দু'টি করে টাকা সেলামি!'

'থামুন।' গর্জে উঠেছিল হাবুল দত্ত। 'অমন টাকায় আমি ইয়ে করি। দরকার নেই মশাই...'

'কেন অপরাধটা কী, তা তো বলবেন?'

এবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে নয়নের দিকে আঙুল তুলে হাবুল দত্ত বলে উঠল—'ও-সব খানকিপনা এখানে চলবে না বুঝলেন? যত সব কচি কাঁচা ছেলেগুলোর মুণ্ডু খাবার জন্যে ফাঁদ পাতা! আমার অমন সচ্চরিত্র ছেলেটার সর্বনাশ করে ছাড়বেন, আর আমাকে তাই প্রশ্রয় দিতে হবে?

জবাব দিল নয়ন এগিয়ে এসে। 'খানকিদের ইজ্জত বেচা টাকা নিয়ে সিন্দুকে তুলছেন না দত্ত মশাই? ওই যে সার বেঁধে খানকিমহল বসিয়েছেন মেলা আলো করে—তখন ভাবেন নি আপনার সচ্চরিত্র ছেলের মুণ্ডু ঘুরে যাবে! আগে ওদের উঠিয়ে দিন!' নয়ন হাঁকছিল চোখ মুখ লাল করে।

হাবুল দত্ত আচমকা ঘা খেয়ে চুপ। সে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকল শুধু।

নয়ন বলতে লাগল—'মেলা কাকে বলে জানেন না বুঝি? চন্দনপুর বাজারেও তো মেলে এ সব—ওই মনোহারি তেলেভাজা পাঁপড়ভাজা পান বিড়ি-সিগারেট। খানকিরও কি অভাব আছে ঘরে-ঘরে? তবু এখানে আসে কেন মানুষ? কেন সাবান আলতা কেনে, কেনই বা ঠোঁট লাল করে পান খেয়ে যায় মেলায়? গেরস্থ খানকি ফেলে কুণ্ডি মাগিদের কোল ঘেঁসে বসে থাকে? আর—চন্দনপুরের কথা জানতে আমার বাকি নেই! জুয়ো মদ মেয়েমানুষের ক'টা আখড়া পাতা রয়েছে এখানে—তাও আমি জানি। ছেলের বিগড়ানো মুণ্ডু আর কতখানি বিগড়াতে পারি আমরা, নিজেই ভেবেচিন্তে বলুন দিকি?

নয়ন আরও কথা বলত—থামিয়ে দিল বুলু দত্ত স্বয়ং। এতক্ষণ সে নয়নের তাঁবুতে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। রতন ছিল যথারীতি হীরা ঝুমুরওয়ালির ওখানে। রতন আশেপাশে

থাকলেও বুলু দত্ত থাকে। তবে তাঁবুর ভেতরে নয়নের বিছানায় গড়ায় না তখন—একপাশে ছোট্ট মোড়াটায় বসে বসে সিগ্রেট টানে আর গল্পসল্প করে।

বুলু বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল—'বাড়ি যান দিকি, আর সীন ক্রিয়েট করবেন না।'

হাবুল দত্ত বিস্ময়ে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল—বুলু. তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করবো!'

বুলু হেসে বলল—'ডোর্ন্ট কেয়ার। ত্যাজ্যপুত্র তো হয়েই আছি—নতুন কী করবেন! এখনও ভালোমানুষের মতো চলে যান এখান থেকে।'

'এ আমার জায়গা, আমি এদের না তাড়িয়ে যাবো না।,

বুলু ইতিমধ্যে কয়েক পাত্র গিলেছে। তাতে চারপাশে লোকও জমে গেছে মজা দেখতে। সে হাঁকরে উঠল—'না গেলে আপনাকে বাধ্য করবো যেতে।'

ক্রমশ পিতাপুত্রের কথা কাটাকাটির মাত্রা চরমের দিকে পৌঁছচ্ছিল! কেউ কম যায় না তো! পরস্পর দত্ত পরিবারের নানান খিস্তির ঝাঁপিও উদম করে দিচ্ছিল। জানা গেল—হাবুল দত্ত সৎভাইকে ঠকিয়ে কীভাবে এ জায়গাটার মালিক হয়েছে। এবং এতক্ষণ দুর্গামোহন চুপচাপ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। নয়ন তার তাঁবুর দিকে সরে গিয়েছিল! লোকজনও জমেছিল চারপাশে। কিন্তু তারা সকলেই বিদেশি—মেলার দোকানদার বা খেলওয়ালা। ছাড়িয়ে দেবার চেয়ে মজা দেখতেই অভ্যস্ত তারা। একসময় রতন এসে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে। আর দেখা গেল হাবুল দত্তকে সে বিলক্ষণ চেনে। হাবুল দত্ত তাকে কম চেনে না। তাব কথায় তখনই শাসাতে শাসাতে চলে গেল সে বাড়ির দিকে।

তবে কি হাবুল দত্তের কান ভারি করেছিল রতনই? বুলু পরে বলেছিল দুর্গামোহনকে—নয়নের সুমুখে। ওই মাস্টার লোকটি সুবিধে নয়—'ও আপনার সর্বনাশ করবে পাঞ্জাবিদা।'

দুর্গামোহন ঘাড় নেড়েছিল মাত্র। তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

সত্যি-সত্যি হাবুল দত্তের লোক এসে লিখিত নোটিশ দিয়ে গেল পরদিন। একদিনের মধ্যেই জায়গা ছেড়ে দিতে হবে—নতুবা অন্য ব্যবস্থা করবে সে।

গুম হয়ে থাকল দুর্গামোহন।

নয়ন বলল—'মরুক গে, ঝামেলা করে লাভ নেই। চলো, অন্য খোঁজ নিয়ে সেখানে চলে যাই।'

দুর্গামোহন কথার জবাব দিল না।

নয়ন মুখ নিচু করে থেকে ফের বলল—'তাছাড়া আমারও শরীর ভাল যাচ্ছে না। জ্বরভাব হচ্ছে কিছুদিন থেকে—গা-বমি লাগে।'

দুর্গামোহন মুখ ফিরিয়ে একটু চমকে উঠল যেন। 'ওষুধ খাস নে কেন? রতনকে বললেই পাবিস।'

অনেকদিন ধরে গোপনে যে নিরুদ্ধ যন্ত্রণা জমেছিল নয়নের মনের কোণে, ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছিল সেই জায়গাটা। বাস্তবিক, এ তো মিথ্যা নয়—সংসারে দুর্গামোহন ছাড়া আর কোন মাটিতে তার অস্তিত্বের মূল আটকে রয়েছে? সে আর সংবরণ করতে পারেনি সে-যন্ত্রণাকে। যুক্ত করে দিয়েছিল মুহূর্তেই। ভেঙ্গে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

'কোন সর্বনেশে মানুষের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিলে তুমি? কেন দিয়েছিলে? আমি তো বেশ ছিলাম। বাবু, দোহাই তোমার—পায়ে ধরে বলছি, ওর হাত থেকে বাঁচাও—আর পারি নে। আমি মরে যাবো বাবু গো!'

দুর্গামোহন বলেছিল—'কে জানে কার ভুল—তোর না আমার। কিন্তু আমার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে রে নয়ন। কী করবো, বল তো মা?'

রতন ঝুমুরের মেয়ে নিয়ে মেতে উঠেছে, দুর্গামোহন তা জানত। ইচ্ছে করলে সে হয়তো রতনকে নিবৃত্ত করতে পারত মুখের একটি হুকুমে। কিন্তু সব দেখেও না দেখার ভান করে কাটাচ্ছিল। নয়ন মুখ তুলে বলল—'তুমি যদি এখনই দল থেকে ওকে না তাড়াও, আমাকে বিষ খেতে হবে!'

'বিষ!' হেসে উঠল দুর্গামোহন। 'বিষ কেন খাবি রে পাগলী? ওকে যদি ঘেন্নাই করিস, ও যা খুশি করুক, তোর কী?'

নয়ন ঝাঁঝালো স্বরে বলল—'কেন ও যা খুশি করবে? ও তোমার পার্টির লোক না?'

'পার্টির লোক তো আরও রয়েছে। তারাও কি ওখানে মেতে ওঠে না? এটা এ লাইনে হবেই। আটকে কী লাভ!'

'তাদের কারুর বউ নেই—তাদের সাজে। ওর সাজে না।' উঠে যেতে যেতে নয়ন আরও বলেছিল মুখ ফিরিয়ে...'বাবু, ওই ছন্নছাড়া মাতালটাকে বলে দিও—ও ছেলের বাপ হতে চলেছে, ওর লজ্জা পাওয়া উচিত।'

দুর্গামোহন আগে সেটা অনুমান করেছিল। এবার সে হন্তদন্ত হয়ে উঠল—'বলিস কী রে নয়নমণি? অ্যাঁ?' বলতে বলতে সে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। 'ওরে রঘু, ওরে কেষ্টা, চাপাটি...' শিশুর মতো সরল আনন্দে ছোটাছুটি করেছিল দুর্গামোহন।

নয়ন তার তাঁবুতে এসে শুয়ে পড়েছিল। বালিশে মুখ গুঁজে নীরবে কাঁদছিল সে। সারা রাতের যত হাসির মূল্য এমনি করে কতবার না কান্না দিয়ে মিটিয়ে দিতে হয় তাকে! ভাগ্যিস, তার হাসি নিয়ে যেমন জুয়োর বাজি ধরে দুর্গামোহন, তার কান্না নিয়ে আজও ধরেনি। তাহলে কী থাকত নয়নের?

শো বন্ধ রাখার ইচ্ছে ছিল।

কিন্তু বুলু দত্ত এসে বলল—'নো, নেভার, শো চলবে। কোন শালার ক্ষমতা আছে, তুলিয়ে দেয় দেখি। থানার বড়বাবুকে আমি ম্যানেজ করে এসেছি। একটু পরেই লালপাগড়ির ফুল ফুটবে মেলায়। বাবা তো তুচ্ছ—স্বয়ং যমকে আমি আজ খাতির করবো না।'

দুর্গামোহন বলল—'কিন্তু নয়নের শরীর যে ভালো নেই।'

বুলু বলল—'সে কী! আজ যে আমার ক'জন বন্ধু আসবে লাক রুমে। সব এক একজন লাখোপতির বাচ্চা!' বড্ড মুশকিল হয়ে গেল তা হলে—দুর্গামোহন মাথার পেছন চুলকোচ্ছিল হতাশভাবে।

'মিস নয়নতারা কোথায়—দেখি আমি চেষ্টা করে।'

বুলু দত্ত ব্যস্তভাবে নয়নের তাঁবুতে এসেছিল। নয়ন চুপচাপ শুয়েছিল বিছানায়। তাকে দেখে হুড়মুড় করে উঠে বসল। ঈষৎ বিরক্তও হয়েছিল সে। সময় অসময় নেই, যখন

তখন এসে এই লোকটা তাকে জ্বালাতন করে বড্ড। প্রশ্রয় পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে গেছে। কড়া কথা বলবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। নয়ন।

বুলু দত্ত বলল—'কী ব্যাপার? আপনার নাকি শরীর খারাপ?'

নয়ন অস্ফুটকণ্ঠে 'হুঁ' বলল শুধু।

বুলু দত্তর কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল। ব্যাগে হাত ভরে সে বলল—'ওষুধ এনেছি ক'বোতল। একেবারে খাস বিলিতি। একটুখানি পেটে পড়লেই—ব্যাস! বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখুন না স্বচক্ষে—দেশি নয় মাইরি—পড়ে দেখুন না, ইংরেজিতে লেখা রয়েছে...'

নয়ন কড়া কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলল ফিক করে। 'বেশ তো। আপনি একাই মৌজ করুন। কালই আমরা চলে যাচ্ছি—মিছিমিছি যাবার সময় মায়া বাড়িয়ে আর কী লাভ?

মৌজ যথারীতি করাই থাকে বুলু দত্তর। সে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল—'না মিস নয়নতারা, আমি প্রাণ গেলেও আপনাদের যেতে দেব না। উঁ-হু-হু, ভাবতেও বুক কাঁপে—মেলা থাকবে, আপনি থাকবেন না'—বলতে বলতে ফোঁস ফোঁস করে দু'বার নাক ঝাড়ল সে। 'শ্মশানে আমি বুক চাপড়াবো, আর আপনি কোথায়...উঃ তার চেয়ে এই নিন বুক পেতে দিচ্ছি—ছুরি মারুন!'

নয়ন বলল—'কী করি, আপনার বাবা নোটিশ দিয়েছেন।'

'বাবা!' বুলু দত্ত গর্জে উঠল। 'ড্যাম, ইডিয়ট, রাস্কেল একটা। একটা শয়তান। আপনি থেকে দেখে যান, কীভাবে ওকে শায়েস্তা করি আমি!'

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমেছে। 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো'র তাঁবুর চারপাশে জনতা মশার মতো ভনভন করছে। কী ব্যাপার, শো বন্ধ কেন? ব্যাপারটা জানাজানি হচ্ছিল ক্রমশ। হাবুল দত্ত তাড়িয়ে দিচ্ছে এদের। ক্রমশ রাত যত বাড়ছিল, জনতা ক্ষিপ্তভাবে হল্লা করছিল। দুর্গামোহন তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কথা খুলে বললে ওরা ফুঁসে উঠল—'হাবুল দত্তর বাপের সাধ্যি নেই, শো ভেঙে দেয়। আপনি আরম্ভ করুন পাঞ্জাবিদা, আমরা রইলাম!'

ওদিকে পুলিশও জুটে গেছে বুলু দত্তর ব্যবস্থামতো। শেষটা লোকে বাপ-ব্যাটার প্রতিযোগিতা টের পেয়ে আরও মেতে উঠল। ঢিল ছুঁড়ছিল তাঁবুতে। খিস্তি করছিল। আগুন জ্বালিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছিল।

দুর্গামোহন সব দেখে শুনে নয়নের কাছে এলো। 'উপায় নেই রে! নে, তাড়াতাড়ি সেজে ফ্যাল।'

নয়ন বিরসমুখে সাজতে বসেছিল।

কিন্তু রতন কোথায়?

খোঁজাখুঁজি করেও তার পাত্তা নেই। চাপাটি হীরাদের ওখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসে বলল—'বাজারের দিকে গেছে বিকেলে—আর ফেরেনি শুনলাম।'

'হীরা আছে?'

তা আছে। স্টেজে ওঠবার সময় কান পাতল নয়ন। মেলার ঠিক মধ্যিখানে আসর বসিয়ে ঝুমুরওয়ালি কোনো খানকি মেয়ে গান গাইছে—আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায়, আমারই আঙিনা দিয়া...।

হয়তো হীরা। রতন তাকে শিখিয়েছে গানটা? হয়তো তাই।

ঘৃণায় থু থু ফেলতে ফেলতে হারমোনিয়ামের কাছে হাঁটু দুমড়ে বসল নয়ন। খাতা থেকে খুঁজে খুঁজে সেই পাতাটি বের করল। ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিল। তারপর বলল—'বাবু, তোমার সেই গানের পর কলিটা মনে আছে—জামানা বদল গেয়া...?'

আছে। দুর্গামোহন গুনগুন করে উঠল। সময় বদলে যায়, হৃদয় কি বদলায়? হয়তো তাই। নইলে যে তুমি ছিলে সচদিল, তুমি এমন হলে কেন? ঈশ্বর, তোমার দুনিয়ায় ইনসান বদলে শয়তান হয়ে যায়; লেকিন—শয়তানকে কি তুমি ইনসান বানাতে পারো?

লখনৌয়ের কোনো ওস্তাদ তার মাকে এই গান শিখিয়ে দিয়েছিল। নয়নকে তার মা শিখিয়েছিল এই গান।

রতন নেই। বাঘের খেলা কে দেখাবে? দর্শকরা চিৎকার করছিল। অন্তত একবারের জন্যেও বাঘটাকে স্টেজে আনা হোক। দেখলেই তারা খুশি। বাঘ কি তারা দ্যাখে নি? অনেক দেখেছে। কিন্তু রতন যখন বাঘটার গলার শিকল ধরে স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকে—নয়ন তার সুমুখে নাচে। সে বেশ রক্ত-চনমন-করা নাচ। বনের জন্তু আবেগে হাঁকরে ওঠে তখন। রতন এইসব ব্যাখ্যা করলে দর্শকেরা উপভোগ না করে পারে না।

দুর্গামোহন আড়ষ্টভাবে ঘামছিল। সে জানে, জনতা বড় একগুঁয়ে। যেদিকে জেদ ধরবে, পূরণ করা চাই-ই। নইলে হুলুস্থুল বাধতে দেরি হবে না। অগত্যা চাপাটিকে তলব করছিল সে।

চাপাটিই খেতে দেয় বাঘটাকে। অবশ্য রতন কাছে-পাশে না থাকলে তার সে-সাধ্যি নেই। চাপাটি যখন শেকল ধরে টানছিল—ওসমান খাঁ বিরক্তভাবে গর্জন করছিল।

আসলে বাঘ দেখবার চেয়ে বাঘের গর্জনটাই উপভোগ্য বেশি।

টানতে-টানতে স্টেজে তাকে দাঁড় করিয়েছিল চাপাটি। রতনের মতো ইংরাজিতে বুকনি ঝাড়ার চেষ্টাও করছিল সে। মাস্টারি ঢঙ আনছিল তার চালচলনে। কিন্তু ওসমান খাঁ বড্ড বিরক্ত। যন্ত্রী ছাড়া যন্ত্রে হাত দিলে সুর তো বাজে না। যা বাজে, তা উৎকৃষ্ট শব্দ— বে-সুর। ঘনঘন গর্জন করছিল ওসমান খাঁ। চাপাটি তাকে ঠিকসে দাঁড়ানোর জন্যে তখন মরিয়াভাবে খোঁচা-খুঁচি শুরু করেছে।

তার মানে চাপাটির সাহস বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। সে ওসমান খাঁ'র জারিজুরি টের পাচ্ছিল যেন। হুঁঃ, ভারি তো একটা বুড়ো জন্তু—তার আবার জাঁক।

দুর্গামোহন কী বলতে যাচ্ছিল ইশারায়। হয়তো বারণ করতে চেয়েছিল সে চাপাটিকে। কিন্তু নয়নও প্রায় মরিয়া হয়ে নাচ শুরু করেছে। যেন রতনকে ছাড়া তার—এটুকু দেখিয়ে দিতে জেদ বেড়েছে সে মুহূর্তে। সে গান গেয়ে উঠেছিল বাঘটার প্রতি বিলোল কটাক্ষ হেনে।

পরে চাপাটি বলেছিল সব খুলে। কিছুদিন থেকে রতন ওসমান খাঁকে নিয়মিত খেতে দিচ্ছিল না। চাপাটি প্রশ্ন করলে বলত—'অসুখে ভুগছে, এখন কিছুদিন এমনি চলবে।' রোগা হয়ে যাচ্ছিল ওসমান। চাপাটি কাকেও বলেনি কথাটা। বলে কী হবে? জন্তুগুলি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছিল না আর। দুর্গামোহন তো কড়ি গুণেই খালাস—চোখেও দেখত না ওদের। রতন আছে, তারই জিম্মায় রয়েছে ওরা। দুর্গামোহন তার জুয়ো নিয়েই ব্যস্ত।

পরের কলিটা ফের জেনে নেবার জন্যে উইংসে দুর্গামোহনের কাছে ঝুঁকে এসেছিল নয়ন, আর তৎক্ষণাৎ ওসমান খাঁ প্রচণ্ড গর্জন করে লাফ দিয়েছিল। চাপাটির হাত থেকে

শিকল খসে গিয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিল ওসমানের—নয়ন উইংসের আড়ালে ঝুঁকে থাকার ফলে সে উইংসের ওপরই এসে পড়েছিল। মুহূর্তে একটা হট্টগোল হই-চই চারপাশে। দুর্গামোহন নয়নকে ক্ষিপ্রহাতে সরিয়ে নিয়েছিল। তারপর পালিয়ে এসেছিল স্টেজ থেকে। সত্যি, জন্তুগুলিকে সে বড় ভয় করত।

আবার যখন ওসমান খাঁ লাফ দিতে যাচ্ছে স্টেজের সুমুখে—কোথা থেকে রতন হাজির। হয়তো আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল এতক্ষণ। সে চিৎকার করে ডেকেছিল—'ওসমান, ওসমান, ইউ ওল্ড ফুল!'

শিকল ধরতে গিয়েছিল সে—'স্টপ ইট, স্টপ ইট, আই সে...' এবং মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত ওসমান খাঁ। এতদিনের সব ক্রোধ যেন সঙ্গে-সঙ্গে ফেটে পড়ছিল তার। দারুণ গর্জন করে সে লাফিয়ে পড়েছিল রতনের ওপর। রতন সঙ্গে-সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠেছিল।

ওদিকে বুলু দত্তের ভীত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে বাইরে—'বন্দুক, বন্দুক!'

দুর্গামোহন বলে—'জন্তুর সঙ্গে ঘর করার ওই এক মজা। রগগুলো বুঝে চলতে হয়। কখন কোনটায় কাঁপন লাগে।'

মেলা শূন্য বললেই চলে ততক্ষণে। দোকানে-দোকানে ঝাঁপ পড়ে গেছে। এদিকে বন্দুক নিয়ে পুলিশেরা তাঁবুর ভেতর উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কে জানে এখন কোথায় লুকিয়ে আছে জন্তুটা—আচমকা লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। বুলু দত্ত পালায় নি। তাদের পেছনে-পেছনে এসে উঁকি মারছিল তাঁবুর একটা ফুটো দিয়ে। সে ফিস-ফিস করে বলছিল—'আগুন ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

দুর্গামোহন ভাগ্যের ঘরে ঢুকে পাশার ছকের বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে আসছিল। নয়নকে ছুটে যেতে দেখে সে চমকে উঠে বলল—'ওরে নয়ন কোথায় চললি!'

নয়ন রতনের আর্তনাদ শুনেছিল।

সে ছুটে গিয়ে দেখল—রতন পড়ে আছে আর ওসমান খাঁ থাবাটা চাটছে। মুহূর্তে সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। তারপর আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সাহস নিয়ে বাঘটার শিকল ধরেছিল সে। বনের বাঘ যদি আজীবন মানুষের খাঁচায় পোষ মেনে থাকে, হিংস্রতা অনেকখানি ক্ষয় পায় বইকি। না পেলে মানুষ তাকে নিয়ে খেলা দেখাত কেমন করে? বনের বাঘ আর ওসমান খাঁ ঠিক এক নয়। সে শুধু ক্ষুধার্ত ছিল। রতনের মাথার খানিক রক্ত চেটে খিদে শান্ত করছিল সে। আর নয়ন যখন তাকে টেনে খাঁচায় নিয়ে গেল সে ভেবে থাকবে, এবার খাবার দেওয়া হবে পেট পুরে। রক্তাক্ত থাবা চাটতে-চাটতে ওসমান খাঁ খাঁচায় ঢুকল। যে-মানুষটা সে মেরেছে, তার মাংসের জন্য তখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

অন্তত নয়নের আজ তাই মনে হয়। নাকি নটীরূপিণী নয়নকে বহুদিন ধরে দেখে-দেখে ওই জানোয়ারটাও তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল? ভাবতে বেশ লাগে।

কিন্তু পরে আরেক খেলোয়াড় একদিন নয়নকে বলেছিল—'বাঘটা আসলে রাগের বশেই থাবা মেরেছিল। বুড়ো বাঘের রকমই এমন। এই রাগ, এই শান্তসুস্থ।'

কারণ যা-ই থাক—নয়ন আর ব্যাখ্যা করতে চায় নি কোনোদিন। ও তো একটা সুন্দর স্বপ্নের শেষটুকু—যা দুঃস্বপ্নেই দাঁড় করানো গোটাটা। শুধু একটা কথা বুঝতে পারে না

সে। রতন বেছে-বেছে ওই তিনটি জানোয়ারকেই কেন এনেছিল দলে? একটা বুড়ো বাঘ, একটা সাপিনী, একটা ক্লাউনের মতো সজারু?

রতনের শিয়রে বসে সে বলেছিল—'তুমি তো জেনে গেলে না কিছু—কী তুমি রেখে গেলে আমার মধ্যে। জানলে কত খুশি হতে। ভাবতে, আমাকে শাস্তি দিয়ে যেতে পেরেছ। একটা রক্তের গিঁট বেঁধে আমাকে চিরজীবনের মতো তোমার বন্দিনী করে গেছ।'

নয়ন সিঁথিব সিঁদুর মুছতে চায় নি। 'আমি এয়োতি। কে বলে আমার স্বামী নেই! স্বামী যদি নেই, আমার জঠরে এ কার নড়াচড়া—এ যে ঘুমিয়ে আছে? একদিন সে বাইরে আসবে—বলবে আমি মিথ্যা না। তোমার মেয়ে জন্ম পূর্ণ করতে আমি পৃথিবীতে এলাম।'

কাহিনী শেষ হ'ল! নয়নতারা উত্তেজিত হয়েছিল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। চোখ ছলছল করেছিল। একটা সুদীর্ঘ গুপ্ত কাহিনী ফাঁস কবে দিয়ে তারপবই গুম হয়ে গেল সে। অনেক সময় ধরে কথা বলল না। কিন্তু আমি শিউরে উঠেছিলাম। রতন মাস্টারের মৃত্যুর ঘটনা আমাকে দারুণ নাড়া দিয়েছিল। কী এই দুর্গামোহন? তার কোন আকৃতি বা প্রকৃতিটা সত্য? কিংবা তারও বিবেকবুদ্ধি রয়েছে একটা---যে গভীর পাপবোধে আচ্ছন্ন বলেই রতন মাস্টারের ছেলেকে বাঘের খাঁচার কাছে যেতে দেয় না।

আমার মনে প্রশ্ন জাগছিল বারবার। আমাকে দিয়ে আবার কী খেলার ষড়যন্ত্র রয়েছে তার—আমি একটুও জানি না।

দিঘির ঘাটে গুটিকয় স্নানার্থী নর-নারী ও শিশু ছিল। আমাদের দেখে ফিসফিস করে উঠল। নয়নতারা নিঃসঙ্কোচে জলে নামলে এক বৃদ্ধা ফিস করে হেসে উঠল। 'সেই বাজি ঘরের মেয়েটি না? কাল তুমি বুঝি নাচছিলে?' নয়নতারা সূর্যের দিকে জল কুলকুচো করে ছুঁড়ে মারছিল। কথা শুনে একটু মাথা দোলাল মাত্র।

'ওম্মা, তুমি যে আবার এয়োতি দেখছি।'

নয়নতারা হাস্যকর ভাবে তার শাঁখাটা নাডা দিল।

'স্বামীও বুঝি দলের নোক?'

আমি নেমে গিয়ে নয়নতারার কাছাকাছি পৌঁছতেই সেই বৃদ্ধা হাসিমুখে দু'জনের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'বাঃ! বেশ মানিয়েছে।'

নয়নতারা কপট ভ্রূভঙ্গী করে বলে উঠল, ছাই মানিয়েছে। ঠাকুমার যেন মাথা খারাপ হয়েছে। ছানি পড়া চোখ কিনা! এত কময়বসী বর নিয়ে ঘর করার জ্বালা তো জানে না!'

হাসির ঝড় উঠল সঙ্গে-সঙ্গে। বৃদ্ধা চলে যেতে-যেতে মন্তব্য করল, 'বাবা, শহুরে মেয়ে, বাজার ফেরা। কথায় পারে কে!'

সেদিন সুযোগটুকু পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেছিলাম আমরা দু'জনে। একটা নাট্যামি আমাদের পেয়ে বসেছিল। জানতাম এর কোনোকিছু হয়তো সত্য না। যেন মেকি। মঞ্চের নাটিকার মতোই। তবু নিষ্ঠুর সঙ্গে ভূমিকা দু'টির দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

তারপর সন্ধ্যার আগে দুর্গামোহন ফিরে এলো শহর থেকে। পাশের মেয়াদ আরও সপ্তাহটাক বাড়তে সক্ষম হয়েছে। তুষ্টুরামকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ডিব্বু মায়ের কাছে শহরের গল্প শোনাচ্ছিল। আমি তাঁবুর সর্বত্র দেখাশুনা করছিলাম—যাতে সন্ধ্যার পর শো

দেওয়া যায়। কিছু-কিছু নতুন প্ল্যানও আমার মাথায় এসেছিল। নাটিকা মনে-মনে রচনা করেছিলাম।

দুর্গামোহন সব দেখেশুনে আমার তারিফ করল পিঠ চাপড়ে। 'আরে ব্যাস, ব্যস! হঠাৎ যদি মরে টরে যাই, 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো' ঠিকই চলবে।' কানের কাছে চাপাস্বরে বলল, কিন্তু ছোটবাবু ভাগ্যের ঘরের জিম্মাদারি দিই কাকে? তুমি তো সেই দশটাকা হেরে পিঠটান দিলে, এমুখো হচ্ছো না।'

সোৎসাহে বললাম, ডাকেন না তো একবারও?'

দুর্গামোহন বললে, 'লেখাপড়া জানা লোক, এ-বিদ্যা শিখলে তাকে ঠকায় সাধ্যি কার! তোমাকে আমি হাতখড়ি দিতে চাই নন্দ। আজই।'

সে এক অদ্ভুত রাত্রি।

মেলা থেকে শেষ লোকটিও চলে গেছে, দোকানগুলিতে ঝাঁপ বন্ধ করা হয়েছে। ঘন অন্ধকারে কোথাও ঈষৎ আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। একটা কঠোর স্তব্ধতা ব্যাপক হয়ে আছে দূর মাঠের ওপর আমবাগানে মেলার প্রাঙ্গণে। আকাশে নক্ষত্রের শান্ত আলো। ক্বচিৎ কোনো কুকুরের ডাক ভেসে আসে। শ্যামচাঁদের নাটমন্দিরের চত্বরে কীর্তনীয়ারা খোল বুকে নিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দুর্গামোহন আমার পকেটে একগোছা নোট গুঁজে দিয়ে বলল, 'যাও, আমি আসছি।'

ভাগ্যের ঘরে চারজন লোক অপেক্ষা করছিল। নয়নতারা একটা টুলে বসে মদ ঢালছিল গ্লাসে। এগিয়ে ধরছিল। আমি যেতেই সে গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, 'শুভযাত্রা।'

লোকগুলি হেসে উঠল একসঙ্গে।

নয়নতারা বলল, 'পার্টির ছোটবাবু।'

আমি নমস্কার করলাম। কিন্তু কেউ হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করল না। এবং তখনই আমার মনে পড়ে গেল, আমি কোথায়, কী আমার ভূমিকা। নিঃসংকোচে নয়নতারার হাত থেকে পূর্ণ পাত্রটা নিলাম। আশ্চর্য জ্বালা ও তিক্ততা সঞ্চারিত হ'ল কণ্ঠে, বুকে, স্নায়ুদেশে।

ছকের প্রান্তে আসন করে বসে বাদামি চামড়ার কেসটা আমি নাড়া দিতে থাকলাম। গুটিগুলি শব্দ করছিল। তারপর ছড়িয়ে পড়ল ছকের ওপর। ড্রাগন দুই...বাকি সব শূন্য। কম্পিত হাতে ছকের ওপর থেকে বাজির টাকাগুলি পায়ের দিকে টেনে নিলাম।

কাঁধে হাতের স্পর্শ। দুর্গামোহন নিঃশব্দে হাসছে।

আর সাহস হয় না কোনোমতে। আসন ছেড়ে সরে গেছি সঙ্গে-সঙ্গে। দুর্গামোহন তার বিরাট শরীর নিয়ে ছকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। নয়নতারা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'আরও একটু খাবে?'

আত্মসমর্পণ করেছিলাম ভাগ্যের ঘরে। নীলাভ পটভূমিতে পরপর কয়েক পাত্র গিলে আমি হা-হা করে হেসে উঠলাম। জুয়াড়িরাও সে-হাসিতে যোগ দিল।

কতক্ষণ ছিলাম জানি না। দুর্গামোহনের পাশার চাল দেখার প্রতি চোখ একটুও ছিল না। আমার বমি আসছিল। টলতে-টলতে বাইরে গেলাম। আমবাগানের ভেতরে ঢুকে ভীষণভাবে বমি করতে থাকলাম।

শুকনো পাতার ওপর নগ্ন মাটিতে শুয়ে দু'হাতে বুক চেপে ধরে হাঁসফাঁস করছিলাম। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। স্মরণ নেই, কে আমাকে তাঁবুতে তুলে নিয়ে এসেছিল। রোদ গায়ে পড়লে যখন উঠে বসলাম, মনে হ'ল সারা রাত ধরে শব্দহীন অগ্নিগর্ভ অন্ধকারে আমি কেবল বাবাকেই ডেকে ফিরেছি।

চোখ মুছে দেখলাম উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে চাপাটি দাঁত বের করে আমাকে দেখছে। তার দেখায় একটা করুণা ছিল। সে যেন সারারাত্রি সুখশয্যায় গভীর ঘুমের আরামে কাটিয়ে প্রত্যুষে পথপ্রান্তে শায়িত সর্বস্বান্ত ভিখারিকে দেখছে।

আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে দুর্গামোহন। এই তার অভ্যাস। হাড়ে-হাড়ে এই স্বভাব তার বেঁচে আছে। প্রতি প্রত্যুষকালে সর্বস্ব-খোয়ানো মানুষ দেখে সে সুখী হয়। মানুষকে পরিপূর্ণভাবে সর্বহারা ও নগ্ন করার জন্যই তার অস্তিত্ব।

ধরা পড়ে গেল দুর্গামোহন জুয়াড়ি। তার স্নেহ-মমতা-প্রীতি-করুণা সবই মেকি। সে সব সু-তে কু-এর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাকে জীর্ণ করতে চায়। এতে তার পৈশাচিক আনন্দ।

আমাকে সে এই উদ্দেশ্যেই লালন করছিল। দলে টেনেছিল।

তুষ্টুরাম এলো। 'শরীর কেমন গো নন্দবাবু?'

গা জ্বলে গেল আমার। জবাব দিলাম না।

'আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন স্যার?'

'কেন?'

'কথা বলছেন না যে!'

'ভালো লাগে না।'

'অভ্যেস নেই। একদিনে হঠাৎ অতটা টানলে সহ্য হবে কেন?'

যেন স্বগতোক্তি করছিল সে। 'ছিঃ, মাগিটার একটুও জ্ঞানগম্যি হ'ল না। শিক্ষিত ভদ্দর মানুষকে নরকস্থ করে ছাড়লে।'

'বাজে বোকো না তুষ্টু! খেয়েছি, সে আমার ইচ্ছে। কারুর কথায় খাই নি।'

'না না। খাবেন বইকি। লাইনে যখন এসেছেন...' হাসছিল তুষ্টুরাম। 'আম্মো খুব খেতাম। আর সইতে পারি নে।'

চাপাটিকে ডাকলাম, 'এক বালতি জল দে রে।'

চাপাটি জল এনে রাখল। মুখ ধুচ্ছিলাম। তুষ্টুরাম বসে পড়ল পাশে। নিজের কুশ্রী কালো দাঁতগুলি দেখিয়ে বলল, 'দেখছেন মজাটা? ভেতর-ভেতর ক্ষয় হয়ে গেছে কতখানি। নিত্যি খেলে অকালে সব দাঁত ঝরে যায়। ভালো করে কুলকুচো করে নেবেন, ব্যস!'

যতক্ষণ চা খেলাম, তুষ্টুরাম একইভাবে বসে থাকল। অনর্গল কথা বলছিল সে। মদ, জুয়া, সার্কাস ও জীবজন্তু সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল। মাঝে-মাঝে শুনছিলাম তার কথা। কখনো আমি স্মৃতির দিকে ছুটে চলেছিলাম। ধূসর দুর্গম—বড় তুষার সে-পথে, শীতকালীন মেরুপ্রদেশ। এক সময় হঠাৎ টের পেলাম, আমার পুরোনো জীবনে আর একটুও সুখকর কিছু নেই। কোনোমতেই খাপ খাওয়াতে পারবো না নিজেকে। আর এই বর্তমান—এও বড় সংশয়ময়, যন্ত্রণাদগ্ধ। কোন পথে যাই? আমি যে ভাগ্যের ঘরে

সেই প্রথমদিনেই সব খুইয়ে বসেছি। আর জেতার আশা বৃথা। আমি বদলে গেছি। দেহ-মাংস-রক্ত-আত্মা কোনোকিছু আর আগের মতো নয়। এ এক নতুন আমি। 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো'-র ছোটবাবু।

'বেশি খেয়ে ফেললে সটান এসে নিজের বিছানায় শোবেন।' তুষ্টু বলছিল, 'ভাগ্যিস কাল আমি ওদিকে গেলাম। শুয়ে-শুয়ে গোঙাচ্ছিলেন।'

'আমি?'

'না তো কে?' তুষ্টুরাম হেসে ফেলল।

বিস্মিতভাবে তার হ্রস্ব শরীরের অগ্রসর হওয়া দেখছি। এ লোকটি আমার যথার্থ শত্রু নয়। শত্রু অন্য কেউ—যে আমার চরম হননের জন্যে ছুরি শানাচ্ছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এই তুষ্টুরামই একদিন আমার হাত ধরে নয়নতারার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আমার হাতে সে অশ্লীল চাপ দিয়ে মন্দার ফুলের ওপর সাপিনীর মতো সংলগ্ন নয়নতারা নটীকে দেখিয়ে ছিল। প্রকৃত ঘোড়েল দালালের ভূমিকায় সে আজও অভিনয় করে চলেছে। ...দেখুন...দেখুন, দেখে যান, আপনার আঁখো কা তারা...

সে কি এমনি করে মানুষী নয়নতারাকে তিরস্কার করে? কিংবা নিজের ক্লাউন সত্তাটাকে—যে ওই বারাঙ্গনা নটীর প্রতি ঘোরতর আসক্ত?

এই প্রশ্নের জবাব সেদিন রাতেই দিয়েছিল তুষ্টুরাম ক্লাউন।

সন্ধ্যার আগে থেকে সে বারবার মদ খাচ্ছিল। দুর্গামোহন টিকিটঘরে। আমার আপত্তি তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। নয়নতারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। পকেটে সর্বদা একটি বোতল পূর্ণ করে ফিরছিল সে। দ্বিতীয় শো'র শেষদিকে সে রীতিমতো টলছে। চলতে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে। দুর্গামোহন মঞ্চের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, এবার শেষ খেলা।

নয়নতারাকে সুমুখে রেখে আগুনের চাকতিটা নিমেষে গলে গেল তুষ্টুরাম। তারপর গুরুভার দীর্ঘ ত্রিশূলটা হাতে তুলে নিল। দর্শকদের দিকে চেয়ে প্রথামতো বক্তৃতাটাও দিল স্খলিত কণ্ঠস্বরে। তারপর শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী দু'জন ছুটে ত্রিশূলটা তোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারপরই তারা চিৎকার করে উঠেছিল। দুর্গামোহন লাফিয়ে পড়েছিল স্টেজ থেকে। 'তুষ্টু ওরে তুষ্টু...এ তুই কী করলি!" আমার পা দুটো আটকে গেছে। ভিড়ের ভেতর একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। সমস্ত সত্তা বধির হয়ে গেছে। ত্রিশূলের দু'টি ফলা বাম ফুসফুসে ও লিভারে আমূল প্রোথিত হয়ে আছে। রক্তের ক্ষীণ রেখা গড়িয়ে পড়ছে ক্লাউন পোশাকের ওপর। মুখটা একপাশে হেলিয়ে রেখেছে সে। টুপিটা খসে গেছে ধুলোয়। পায়ের চাপে পিষ্ট হচ্ছে ক্রমান্বয়ে।

তারপর একটা তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার সকল কোলাহলকে চিরে তাঁবুর আকাশে নিক্ষিপ্ত হ'ল। নয়নতারা মূর্ছা গেছে স্টেজের ওপর। সংবিৎ ফিরে পেয়েছিলাম সঙ্গে-সঙ্গে। তাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে ডেকেছিলাম, 'চাপাটি চাপাটি, ডিব্বু!'

১২

তুম্বুরাম ক্লাউন তার জুয়াড়ি রাজার কাছে বিচার চেয়েছিল। পায় নি। তখন সে জনতার কাছে বিচার প্রার্থনা করল। পেল না। সে জানত না, জনতাও তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

হয়তো সে দেখেছিল, কোনো উদ্ধারই সম্ভব নয় পৃথিবীতে। নিতান্ত মানুষ হিসেবে কোনো মূল্য দাবি করা তার বৃথা। দুর্গামোহনের কাছে সে ওই খাঁচায়-পোরা ওসমান খাঁ—যে এক টুকরো মাংসখণ্ডের বিনিময়ে মালিকের উদ্দেশ্য সার্থক করে—আর জনতার কাছে সে ভাঁড় ছাড়া কিছু নয়।

নয়নতারা তাকে অনেক কিছু দেবার দাবি করেছিল। তা তো শুধু ওই মাংসখণ্ডটা। তুম্বুরাম যে-নটীকে চেয়েছিল, সে কি এই মর্তের মেয়েমানুষ? সে তো একটা মায়া। দুর্গামোহনের জাদুদণ্ডসঞ্চালনে তার জন্ম ও লয়।

এবং একই আলেয়ার প্রতি আমার ক্ষুধার্ত হৃদয় ধাবিত। শিউরে উঠেছিলাম। নিয়তি যেন আঙুল তুলে নিঃশব্দে চিৎকার করে বলছিল—তুমি, নন্দ, এবার তুমি!

তুম্বুরামের মৃতদেহের সম্মানে মাত্র একটি দিন শো বন্ধ রেখেছিল দুর্গামোহন। আমরা এই দিনটিকে শোকদিবস রূপে পালনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমরা মৌন থাকলাম। দুর্গামোহন তার ভাগ্যের ঘরে শুয়ে রইল সারাটি দিন। জানোয়ারগুলিকে খাবার দিয়ে এলো নয়নতারা নিজে। তার নির্বিকার মুখে কোনো শোকের চিহ্ন নেই। সিঁথির সিঁদুর সে মোছে নি। বাঁ-হাতের একটি মাত্র শাঁখা ও নোয়াটি শুধু মৃতের আত্মাকে সুখি করার জন্য খুলে রেখেছিল।

অথচ আমি চেয়েছিলাম, সে যথার্থ বিধবার ন্যায় শোকবাস পরুক। বিলাপ করুক। তুম্বুরামের মৃতশরীরের সংলগ্ন হয়ে বারবার মূর্ছা যাক। এবং আমার এ ইচ্ছা খাঁটি সংসারী পুরুষের ইচ্ছা ছাড়া কিছু নয়।

তার নির্লিপ্ততা তবু আমাকেই সাহসী করতে পারল। তীব্র বিবেকদংশন থেকে ক্রমে মুক্তি পেলাম। তুম্বুরাম স্বেচ্ছায় আমার ভোগের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে—এ ধরনের সেকেলে মহত্ত্ব অবশেষে তার চরম পর্যায়ের এক ক্লাউনপনা হয়ে দাঁড়াল।

অতিশয় গুণী খেলোয়াড় ও সংগীতপ্রেমিক তুম্বুরাম এক নটীনারীর প্রেমের জন্যে নিজ মৃত্যুকেও ভাঁড়ামিরূপে ব্যবহার করে হাসির খোরাক জোগাল মাত্র।

ভাগ্যের ঘরে গিয়ে দুর্গামোহনকে ডেকেছিলাম, 'দাদা, বেলা নেই আর, উঠুন। আজ শো দেবেন বলছিলেন?'

দুর্গামোহন উঠে বসেছিল হুড়মুড় করে 'আরে তাই তো নন্দ!'

'সব রেডি করে ফেলেছি। শুধু আপনার অপেক্ষা।'

'এই তো চাই!' দুর্গামোহন আমার হাত ধরে নাড়া দিয়েছিল। 'নন্দ, এ লাইনে এমন অনেক হয়।' অনেক দেখেছি। ওতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

'নাঃ। ঘাবড়াই নি মোটে।'

'কোনোদিন যদি দ্যাখো আমিও অমনি একটা কিছু করে ফেলেছি অবাক হয়ো না।' হাসছিল সে।

'কী যে বলেন!'

'হ্যাঁ রে ভাই। মরণ এই তাঁবুতে পুষে রেখেছি। কখন কার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক নেই। হঠাৎ হয়তো দেখলে, ওই নয়নও দাঁত ছর কুটে পড়েছে...

'চলুন, সময় নেই আর।'

'কিংবা তুমিও, নন্দ, তুমিও।' নিঃশব্দ হাসিতে কাঁপতে থাকল দুর্গামোহন। ঠিক নিয়তির মতো।

সত্যই আমি ত্রাসে উদ্বেগে থরথর করে কাঁপছিলাম। আমার চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল।

'আহা ডরো মাৎ বাচ্চা।' আমার হাত ধরে বেরোল দুর্গামোহন। 'যতক্ষণ আছি, ততক্ষণের থাকাটা তো মিছে নয়।'

নয়নতারাকে সাজতে বলতে পারিনি মুখোমুখি। তবু দেখলাম সে যন্ত্রের নিয়মে হ্যাসাগের আলোয় গালে তুলি ঘষছে। ভ্রূ আঁকছে নিপুণ হাতে। কপালের চিহ্নটা ঘিরে চন্দ্রকলা রচনা করতেও দ্বিধা নেই তার। তারপর সে মুখ তুলে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নটীর হাসি হাসল। মুহূর্তে সবকিছু বদলে গেছে। আলোকময় শব্দোচ্ছল মেলা গভীর অর্থে আকীর্ণ হয়েছে। আমবাগানের অন্ধকার, বাঘের চিৎকার, পাশাক্রীড়া, মঞ্চ, সমবেত দর্শক নৃত্যগীতময় হয়ে পড়ছে ক্রমান্বয়ে। নটীত্বের সর্বগ্রাসে সবকিছু নিক্ষিপ্ত। নয়নতারাময় সন্ধ্যার পৃথিবীতে ঠিক তখনই অনভ্যস্তকণ্ঠে চাপাটিকে চিৎকার করতে শুনলাম তাঁবুর দরজার ওপর। ...আসুন, আসুন, দেখে যান, দেখে যান আপনার আঁখো কা তারা...'

তুষ্টুরামকে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করার চেষ্টা তার। হাসি পেল? ওই চ্যাপটা-শরীর চাপাটিটাও গোপনে দীর্ঘকাল একটা সাধনায় মগ্ন ছিল তা হলে!

মেলার সমবেত মানুষ এবং আমরা এইবার নিজেদের ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট জগতে পরম সুখে বিচরণ করতে পারি।

খাঁচা খুলে নিজের হাতে শেকল টেনে জন্তুদের বের করল নয়নতারা। সাপিনীর গায়ে চুমু খেয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'কী রে ছুঁড়ি, আজ আবার দুষ্টুমি করবি নে তো? সতিন যেন!

দুর্গামোহন অনেকগুলি ম্যাজিক দেখাল। শেষে দুঃখের সঙ্গে তুষ্টুরামের মৃত্যুসংবাদ ও শেষ খেলাদুটি প্রদর্শনের অক্ষমতা ঘোষণা করল। জনতা শান্তভাবে শুনছিল।

শেষের দিকে কে চিৎকার করে উঠল ভিড় থেকে। 'তবে শুধু নাচগান চলুক।'

আরও কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'টপ্পা, টপ্পা!'

হট্টগোল বাড়ছিল ক্রমাগত। নানাকণ্ঠে নানা দাবি! 'না, না, কীর্তন! 'ঝুমুর!' 'ফিল্মি গানা' ও 'আধুনিক' শব্দদুটিও একাংশ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। সেদিকে কিছু ভদ্র যুবক। অন্যান্য দিনের প্রদর্শনীতে এদের একটু চুপচাপ থাকতে দেখেছি।

তুষ্টুরামের মৃত্যু যেন হঠাৎ একটা পর্দা সরিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর থেকে। 'অগ্নিবলয়' 'ত্রিশুল', আর ক্লাউনপনা ইত্যাদি আইটেম বাদ পড়ে আমরা নিছক একটি নাচগানের দল হয়ে গেছি। বাঘ সজারু সাপ দারুণভাবে উদ্ভট ও অর্থহীন হয়ে গেছে। তুষ্টুরামের অভাবে দুর্গামোহনের সেই নাটিকাটি অভিনয়ের কিছু ঝুঁকি আছে। নয়নতারা কি একাই মঞ্চে পর-পর দু'বার জন্তুগুলিকে টেনে আনার সাহস রাখে?

চুপিচুপি প্রশ্ন করলাম। সত্যই সে ইতস্তত করছিল। বললাম, 'থাক তা হলে।'

গণ্ডগোল খুবই বেড়ে গেল।

হঠাৎ নয়নতারা উঠে দাঁড়াল। মঞ্চে প্রবেশ করল। ফিল্মের গান শুনতে পেলাম তার কণ্ঠে। দুর্গামোহন বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। মঞ্চে ঘুঙুরের ধ্বনি উঠেছে...ঝুম-ঝুম...ঝুম-ঝুম...

ঝুঁকে এসে নয়নতারা চাপা গলায় বলে গেল, 'কার্ফা'। কোমর ভাঁজ করে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। হাত দুটি তুলল। মাথা পেছনে হেলিয়ে দিলে। বুকের দিকে চাইতে গিয়ে মুখ নামালাম। যেন এক যথার্থ বেশ্যাকে দেখছি। দেহ ছাড়া যার বেঁচে থাকার মতো কোনো পুঁজি নেই।

অস্ফুট কণ্ঠে দুর্গামোহন বলে উঠল, 'এইবার মেয়েটা সব খুইয়ে বসল নন্দ।' তারপর ক্ষিপ্র আঙুলে কার্ফার হোল তুলতে থাকল সে। ধেগে না কে না কে ধিন...ধেগে না কে না কে ধিন...

'বোম্বে ঠেকা!' নয়নতারা ইঙ্গিত করছে আবার।

দুর্গামোহন কি জানে? জানতো তুষ্টুরাম।

ভাগ্যের ঘরের খেলা শেষ হতে চৈত্রের রাত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। নগ্ন পরিব্যাপ্ত দিনের বুকে যেন একটা জ্যোৎস্নাময় অন্ধকারময় বিচিত্র সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়ে আমাদের জাদুর তাঁবু গড়ে ওঠে। একসময় শেষ হয়ে যায় সব খেলা। উজ্জ্বল রোদের প্রান্তরে আবার প্রতীক্ষার পালা।

দুর্গামোহন সে-রাতে অনেক জিতেছিল। বলছিল, 'এমন আসর কোনোদিন দেখি নি।'

অথচ তাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। অল্প একটু নেশা করে আমিও কিছু ক্লান্তি বোধ করছিলাম। তারপর সে শান্তভাবে তার প্ল্যানগুলি আমাকে শোনাল। জন্তুদের বিক্রি করে ফেলবে শিগগির। লোকজনও কিছু ছাঁটাই করবে। শুধু নাচগানের একটা দল রাখবে। আরও কিছু মেয়ে সংগ্রহ করবে। গ্রীষ্মের শেষদিকে নিজের ডেরা মল্লারপুরে ফিরে গেলে ঝুমুরদলের মেয়েগুলিকে সে বলবে। সেখানে মেয়েগুলি দিনের বেলা চালকলে মজুরির কাজ করে। রাতের দিকে দেহ-বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত হয়। এবং মরশুমে মেলায়-মেলায় ঝুমুর দল গড়ে ঘুরে বেড়ায়।

বিস্ময়ের কারণ থাকলেও আমি বিস্মিত হই নি।

'মোটামুটি মন্দ হবে না এটা। কী বলো?' আমার মত জানতে চেয়েছিল সে। 'নাকি তোমার এখনো কিছু শুচিবাই রয়েছে নন্দ?

'নাঃ।'

আমি দেখেছিলাম কী ভীষণভাবে 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো' স্খলিত হচ্ছে নীচের দিকে। পতনশীল দুর্গামোহনের মুখ দেখে দুঃখ হচ্ছিল। ওসমান খাঁ, আমিনা আর বুদ্বুয়াকে এনে রতন মাস্টার তার কুৎসিত দ্যূতক্রীড়াকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুষ্টুরাম দিয়েছিল আরও সূক্ষ্ম বর্ণপ্রলেপ। তখন দুর্গামোহন একজন প্রকৃত রাজার ভূমিকা অর্জন করে। নয়নতারা বাঈজি হয়ে ওঠে রাজসভার উর্বশী নটী।

কিন্তু আমি কী 'নতুন খেলা' দিলাম? কী সেই উল্লেখযোগ্য সংযোজন?

আজ দেখছি এক অতি চতুর অথচ সাধারণ এক জুয়াড়িকে, তার তাঁবুর জগতের দিকে বাইরের জগতের কোনো বিস্ময় অগ্রসর হচ্ছে না। যা আসছে সর্বগ্রাসী কুয়াশার মতো ঘিরে ধরতে, তা লালসার বিস্তৃত রসনা।

তারপর দুর্গামোহন আমার হাত ধরে টানল। নয়নতারার তাঁবুতে নিয়ে এলো সে। ডাকল, 'নয়ন, ও নয়নমণি!'

নয়নতারা ঘুমোয় নি। উঠে বসল।

'নন্দ মাস্টার আজ থেকে তোর এখানে শোবে।' আমাকে ঠেলে দিয়ে দ্রুত চলে গেল দুর্গামোহন। নয়নতারা কিছুসময় চুপ করে ছিল। নিবু-নিবু হ্যাসাগটা দপ করে নিবে গেল একেবারে। একটা ঘোর লাল বর্তুল মুহূর্তেই শ্বাস ছেড়ে ধূসর হয়ে গেল।

'কই, এসো ছোটবাবু।' নয়নতারা আমাকে ডাকছিল। তার সরে গিয়ে জায়গা দেবার শব্দ শুনছিলাম। এবং সেই সময় অত্যন্ত হঠাৎ ওসমান খাঁ তীব্র গর্জন করে উঠল। সজারুর ডানার শব্দ শুনলাম। সাপের খাঁচাটা ভীষণ নড়ে-চড়ে উঠল। ভাগ্যের ঘরে নীলাভ আলোয় একা-একা দুর্গামোহন শূন্য ছকের ওপর পাশার গুটিগুলি ছড়িয়ে দিল। 'কী হ'ল ওদের?' আমি অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

'কিছু না। শেয়াল-টেয়াল এসেছে বোধহয়।' নয়নতারা ফের ডাকল। 'তুমি এসো। ঘুম পাচ্ছে।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

'পেটে খিদে, মুখে লজ্জার কোনো মানে হয় না নন্দ।'

নয়নতারা আমাকে একটার পর একটা চাবুক মারছিল। আস্তে-আস্তে আমি সরে গেলাম। নিজের তাঁবুতে গিয়ে গড়িয়ে পড়লাম।

কী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম যেন। বাবার হাত ধরে বিস্তৃত বিরাট তাঁবুর দরজায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। তুষ্টুরাম ক্লাউন চিৎকার করছে। আসুন...আসুন, দেখে যান, দেখে যান... আপনার আঁখো কা তারা...

বুকের ওপর স্পর্শ। লাফিয়ে উঠে বসলাম। 'কে, কে তুমি?'

নয়নতারা আমার মুখে হাত রাখল। তারপর সে আমার পায়ের দিকে সরে এসে পা-দুটো ধরে ঝুঁকে পড়ল।

'নন্দ, দোহাই নন্দ, তুমি অমন করো না।'

'কেন নয়ন?'

'বাবু আমাকে মেরে ফেলবে। সে ভাববে, তোমাকে আমি ঘৃণা করছি।'

'আমি বুঝিয়ে বলবো তাকে।'

'না, না। সে তোমার মতো শিক্ষিত লোক নয়। সে জানে সব মানুষই এক ছাঁচে তৈরি। সকলেই জন্তু-জানোয়ার।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে এভাবে চাই নে।'

'অবুঝ হয়ো না লক্ষ্মীটি। পার্টিতে থাকতে গেলে আমাদের স্বামী-স্ত্রী সাজতেই হবে। বাবুর হুকুম মানতে হবে নন্দ।'

'আমি পার্টি ছেড়ে দেব।'

'তা হলেও আমার রেহাই নেই।' নয়নতারা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। 'বাবু ভাববে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'তুমি মরতে পারবে না নয়ন?'

'পারতাম। কিন্তু—'নয়নতারা হাঁফাচ্ছিল। 'কিন্তু আমার ছেলে—'

'আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?' তাকে সোজা বসিয়ে মুখোমুখি বললাম। 'যাবে তুমি? এখনই?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার ভালোবাসায় তুমি সুখী হবে না। নন্দ, আমার আর কোনো ভালোবাসা বেঁচে নেই!'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি নয়ন।'

'না। তুমিই বলেছিলে নন্দ, সে অন্য মেয়ে। সে ওই স্টেজের নাচওয়ালি। দুর্গাবাবুর দল ছেড়ে গেলে তাকেও তো আর দেখতে পাবে না তুমি।'

আবার অনেক সময় আমরা চুপ করে ছিলাম। বড় তাঁবুর শীর্ষে একটা নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়েছিল। ভাগ্যের ঘরে নীল আলোটা অনির্বাণ জ্বলছিল।

'নয়ন, তোমার বাবা কে জানো?'

অন্ধকারে তার মুখ দেখি না। নয়নতারা কাঁপছে একটু একটু। নিঃশব্দে কাঁদছে হয় তো।

'বলবে না?' ফের বললাম।

'কী হবে শুনে? আর সে কথা এখন জানতে চাচ্ছো কেন?'

'আমার খুবই সন্দেহ...'

'কী?'

'দুর্গামোহন তোমার বাবা।'

নয়নতারা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। 'বাসর সাজিয়ে তোমায় ডাকতে এসেছি। তুমি খুব ছেলেমানুষ বর নন্দ। এসো...' হাত ধরে টানল সে। 'আঃ এসো না!'

ভাগ্যের ঘর থেকে দুর্গামোহনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'কী রে এখনো তোরা শুলি নে?'

'এই যে, যাচ্ছি বাবু।'

'বরং ওখানেই থাক তোরা। আমি ডিব্বুটার পাশে যাচ্ছি।'

ভাগ্যঘরের আলো নিবে গেল দপ করে। হ্যাসাগটার দীর্ঘশ্বাস কানে এলো।

এ একটা অদ্ভুত রাত। এ আমার চারপাশ থেকে রক্ত শোষণ করছিল—অথচ প্রতিটি শোষণে যে শিহরণ অনুভব করছিলাম—তা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিল : এই তোমার প্রাপ্য ছিল—যে পথে তুমি যাত্রা করেছিলে, তার শেষে এই ছিল নির্ধারিত। তোমার ভালোমন্দ বোধের বাইরে নিয়তির এটা উপহার। এর আনন্দ তোমার গ্রহণ করা উচিত।

ওসমান খাঁ বাঘটার মতো আমি কি ক্ষুধাত থেকেছি? এবং ঠিক তারই মতো আমবাগানের নির্জন নিঃশব্দ অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ আমার গর্জন করে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল। শোষণকারী রাতের কবল থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছায় হিংস্র হতে চাচ্ছিলাম। তখন আস্তে আস্তে কনুই ভর করে উঠে নয়নতারার মুখ দেখছি।

খুবই নিশ্চিতভাবে সে ঘুমিয়ে গেছে। জীবজগতের আদিম নিরাপত্তার চিহ্ন তার শ্বাসপ্রশ্বাসে, স্তব্ধ শরীরে, নিদ্রায়। আত্মাবর্জিত তার নারীশরীর সাপের খোলসের মতো পথের ওপর পড়ে রয়েছে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল তার সর্পিণী আত্মা কোথায় কোন প্রাকৃতিক ফাটলের খাঁজ পেরিয়ে কোনো গুহাহিত অন্ধকারে এখন ভ্রমণ করছে—হয়তো প্রতিচ্ছবিরা এখনও তার অনুসরণকারী—যে প্রতিচ্ছবি এই পরিত্যক্ত খোলসের

জগতের—যে প্রতিচ্ছবি এখন আমার কাছে খাঁটি ছবি মাত্র। আমার সাধ হচ্ছিল ওই সর্পিণী যদি আমায় সঙ্গে নিতো! আমি যদি তার সাক্ষাৎ পেতাম—ওই অলৌকিক ভ্রমণের সঙ্গী হতাম! হয় তো তার ভ্রমণের জগতে আমি এখন আছি—কিন্তু সে তো ঠিক আমি নই—সে আমার প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো বীভৎস ক্লান্ত অথচ কাপুরুষ—সে অজানা কারণেই বশ মেনে খাঁচায় বসে থাকে, খাঁচা খোলা পেলেও পালাতে পারে না।

ছেলেবেলায় দেখেছিলাম রঘু ঠাকুরমশাই প্রতিমার একখানি হাত ভেঙে গেলে কী কান্না না কেঁদেছিলেন হাউমাউ করে। আমি মনে মনে বলেছিলাম—'রঘুজ্যাঠা, তুমি কাঁদছো কেন বাপু? হাত ভেঙেছে তো কী? জগা মেকদারকে ডাকলে ফের সে বানিয়ে দেবে...'

রঘু ঠাকুর শুধু কেঁদেছিলেন—একটানা কেঁদেছিলেন।

'ঈশ্বরের হাত কি ভাঙে? মানুষ কি অবুঝ।' বাবা বলেছিলেন। 'তুই ঠিকই বলেছিস খোকা—প্রতিমার হাত ভাঙলে জগা মেকদার ফের বানিয়ে দিতে পারে। রঘু একেবারে পাগলা।'

ইষ্টদেবী তো মানুষের মনে। প্রতিমা বানায় তার কাঠ খড় মাটি এইসব তুচ্ছ উপাদানে—এ সবই তো বিসর্জনের। তবু মানুষের মন রঘু ঠাকুরের মতো এই তুচ্ছকেই সার ভেবে বসে। এই তুচ্ছকে সে ভালোবেসে ফেলে। এর মোহে সে বিভ্রান্ত হয়। তখন ইষ্টদেবীর চেয়ে প্রিয়তম এই সব নশ্বর বস্তুখণ্ডগুলি।

নটী নয়নতারার প্রতিমার ন্যায় যে আকৃতি—যে তুচ্ছ নশ্বর বস্তুখণ্ডগুলি আমি বানিয়েছি, তারা বিসর্জিত হবে—তবু রঘুজ্যাঠার মতো আমার কান্না পাচ্ছিল। আমি আমার সৃষ্টির প্রতি বিহ্বল হচ্ছিলাম ক্রমে-ক্রমে। নিজের মনের মাধুরী দিয়ে বানানো উজ্জ্বল একটা প্রতিমার রূপ আমাকে ক্রমান্বয়ে মুগ্ধ করছিল। এবং পুরোপুরি তাকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার ক্ষুধা আমার চোখদুটি অন্ধ করে দিচ্ছিল। নটীমেয়েকে পেতে চেয়ে আমি আমার সৃষ্ট প্রতিমাকে আঁকড়ে ধরছিলাম। তারপর দেখলাম—যা আমার আয়ত্তে—সে তার শরীর—নারী শরীর। যুগপৎ দুঃখ শোক আনন্দ আবেগে উদভ্রান্ত হয়ে হাতের কাছে তার শরীরটাকেই আঁকড়ে ধরলাম অবশেষে। তার শরীরের পাহাড়ে মাথা ঠুকে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল—নয়ন, ও নয়ন, তুমি কোথায়?

তার দেহের পাথুরে পাহাড়ের পথ বেয়ে ক্লান্ত হতে হতে যাত্রা শুরু হ'ল আমার। তাকে খুঁজছি তার রক্তমাংসে ফুসফুসে ঠোটে বুকে—উষ্ণ রক্তস্রোতের মধ্যখানে ভেসে। প্রতিমার উজ্জ্বলতায় রূপে বর্ণসম্ভারে যাকে পাচ্ছি নে—সে যদি মেলে আভ্যন্তরীণ কাঠ খড় বাঁশের তুচ্ছতার মধ্যে!

ঠিক এরূপ একটা অসহায় বিশ্বাস আমাকে পেয়ে বসেছিল ততক্ষণ। আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম উষ্ণ প্রবহমান রক্তের নদীতে। জীবজগতের উদ্দামতা আমাকে সব বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছিল। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল নয়নতারাকে আমি পেয়েছি, পেয়েছি তাকে দারুণ ঘর্মাক্ত শারীরিক শ্রমের মুখোমুখি জৈব আনন্দের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে—অতি কাছে অতি সহজ সে, অনায়াসে তাকে পাওয়া যায়—এই তো সে, এই তো!

শেষমুহূর্তে হঠাৎ নয়নতারা ঘুম থেকে জেগে উঠল। তারপরই অস্ফুট একটা আর্ত চিৎকার করল সে—কিছু বিস্ময় কিছু বেদনা তার চিৎকারে মিশছিল—'নন্দ, নন্দ তুমি...'

আমি দানবের ন্যায় হাসছিলাম। তাকে ধরে ফেলার জয়োল্লাস আমার আচরণে প্রকট হচ্ছিল। 'কী হ'ল নয়ন, কী হ'ল তোমার?'

'নন্দ, আমি ভাবতে পারি নি।' নয়নতারা ধড়মড় করে উঠে বসল। সে হাঁফাচ্ছিল। মাথা নিচু করে পা ঝুলিয়ে বসে সে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। 'তুমি শিক্ষিত মানুষ হয়েও শেষে...'

'কী, ভাবতে পারো নি তুমি?'

নয়ন চুপ করে থাকল।

'কোনো দোষ করি নি...' সিগ্রেট জ্বেলে বাইরে এলাম বলতে বলতে। ঘাসের ওপরে বসে থাকলাম। একটা উদ্ধত ব্যঙ্গ আমার জিভে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। নয়নতারার সতীপনা! যতবার ভাবছিলাম, ঘোরতর ঘৃণা ওই ব্যঙ্গের সঙ্গে মিশে আমাকে ক্রুদ্ধ করছিল। যেন—হয়তো বা—দারুণ কায়িক ও মানসিক শ্রমের যা মূল্য পেয়েছি—তা অতি অকিঞ্চিৎকর—ঠিক এরূপ কোনো দরকষাকষি চলছিল ক্লান্ত মনের ভেতর।

১৩

'মোহিনী ভ্যরাইটি শো' দারুণ বেগে স্খলিত হচ্ছে অন্ধকারের অন্য এক প্রান্তে—কী আছে সেখানে অপেক্ষা করে, হয়তো জুয়াড়ি দুর্গামোহনও জানে না।

তাই প্রতি রাতের আসরে তার মুখ হঠাৎ-হঠাৎ অমনি গম্ভীর হয়ে ওঠে। তবলার তাল কেটে যায়। নোটের মালা গলায় পরে নয়ন নাচতে নাচতে ভুরু কুঁচকে তাকায়।

নয়ন নির্বিকার। এবং তার এই নির্বিকারপনা আমাকে সাহস জোগাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ক'দিনের মধ্যেই তার মুখোমুখি যথার্থ স্বামীর মর্যাদা নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম। সেও তার আচরণে স্ত্রী-সুলভ চরিত্র বজায় রাখছিল। সে সকালে সুমুখে চায়ের কাপ হাতে ডাক দেয়—'কই গো ওঠো!'

অবিকল স্বামীর মতো আড়মড়ো ভেঙে হাই তুলে বলি—'ক'টা বাজল?'

'আটটা।'

'ডিঙ্কু পড়তে বসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে পাঠিয়ে দাও।' সে চলে যেতে থাকলে ফের ডেকে বলি—'গেঞ্জিটা ময়লা হয়েছে' যা গন্ধ ছুটছে...'

'কেচে দেবো'খন।'

'এখুনি দাও। খানিক পরে বেরোব।'

নয়নতারা ঝাঁঝালো স্বরে বলে—'কী আমার কাজের লোক হয়েছ! একদিনও তো বেরোতে দেখলাম না। বসে থেকে হাতে-পায়ে জং ধরে যায় না তোমার?'

'আজ ঠিকই বেরোব। সকাল সকাল রান্না করে রাখো।'

'কোথায় যাবে শুনি?'

'থানায়। দুর্গাদা রাতে বলছিলেন যেতে।'

নয়ন ফিরে আসে কাছে। 'দেখো বাপু ওঁদের সঙ্গে কোনো কথা-কাটাকাটি করো না কিন্তু। যা বলবে মেনে নিয়ো।' তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলে—'আর বাজার থেকে একটা লিপস্টিক এনো দিকি—পুরোনোটা ফেলে দিয়েছি।'

হেসে ফেলি। 'এমনভাবে বলছ, যেন নতুন বউ—শাশুড়ি কানাচি পেতে শুনছে।'

নয়নও হাসে। জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে—স্বর্গ থেকে শুনছেন বইকি।'

সে চলে গেলে অকারণে আমার চোখ ছাপিয়ে জল আসে। মা তুমি যেখানেই থাকো, আমাকে ক্ষমা করো। এবং তখনই হঠাৎ ধরা পড়ে যায় নিজ ভূমিকার আড়ালে এক বিদ্রোহীর সতর্ক পায়ের শব্দ। নন্দকে খুঁজি—সেই পুরোনো নন্দকে—অথচ ততক্ষণে দুর্গামোহন মোড়ায় বসে দাঁত ঘষতে ঘষতে ডেকেছে—'কই রে নন্দ, উঠেছিস? আজ একবার ওদিকে যাস ভাই—তুই শিক্ষিত মানুষ, সামলে নিতে পারবি...'

থানার সঙ্গে একটু বিসংবাদ শুরু হয়েছিল।

এ মেলায় আসবার আগে যথারীতি একটা চুক্তি হয়েছিল পরস্পর। রাত-পিছু পঞ্চাশ টাকা করে সেলামি। এভাবেই দেওয়া হচ্ছিল বরাবর। তুষ্টুরামের মৃত্যুর পর আস্তে আস্তে নাকি আমাদের আয় বেড়ে যাচ্ছে—থানাওয়ালাদের এই ধারণা। তার ফলে হঠাৎ বড়বাবু বলে গিয়েছিলেন—'রেটটা ডবল করতে হবে।'

আয় বাড়ছিল নিঃসন্দেহ। দর্শকরা নয়নতারাকে টাকার মালা পরিয়ে দিচ্ছিল প্রতি রাতে। ভাগ্যের ঘরে বড় বড় দান ধরা হচ্ছিল। এলাকার তুখোড় লোকগুলি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল যেন। সারা রাত তারা ভাগ্যের ঘরে হা-হা করে হাসে, জড়ানো কণ্ঠে অশ্লীল গান গায়, নয়নকে জড়িয়ে ধরতে যায়—নয়ন খিলখিল করে হেসে পালিয়ে আসে। তাই ভাগ্যের ঘরে কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় রঘুবীর আর কেষ্টকে। আমি এতদিন ধরে টের পাই নি দুর্গামোহন তার দলে এই দুটি মারাত্মক লোক পুষছে। ভাবতাম অন্য লোকগুলির মতো এরাও বুঝি সাধারণ কুলিকামিন। হঠাৎ যেদিন টের পেলাম—এরা দুটি খুনে স্বভাবের গুণ্ডা, চমক খেয়েছিলাম খুব।

নিরীহ আকৃতি-প্রকৃতির আড়াল তুলে রঘু আর কেষ্টা কোমরে ভোজালি ঝুলিয়ে দুটি লাঠি হাতে ভাগ্যের ঘরে দু'পাশে দাঁড়ালে দুর্গামোহনের ওপর আতঙ্ক বেড়ে গিয়েছিল আরো। কিন্তু তাতে কী? ওরা তো আমারও অনুগত—আমি ওদের ছোটবাবু। দুর্গামোহন বলেছে—সে মরে গেলে নন্দ এই সবকিছুর মালিক হবে। একটা অদ্ভুত ভবিষ্যৎ আমার জন্য দুর্গামোহন তৈরি করে রেখেছে—ঠিক একথাই আমার মনে হয়। সুতরাং একটা গর্ববোধও পাশাপাশি বেড়ে উঠছিল। মাথা উঁচু করে চলাফেরা করছিলাম।

শেষ অব্দি মেনে নিলাম থানাওয়ালাদের জেদটা। দুর্গামোহন শুধু বলল—'ঠিক আছে।'

নয়ন বলল—'পারবে তো জোগাতে শেষ অব্দি? এতগুলো লোক, জন্তুজানোয়ার, মেলাওয়ালাদের ভাড়া রয়েছে ওদিকে...'

'তুমি পারলে সবই পারা যায় নয়ন!'

'বৃষ্টি-বাদলা হলে? সে-রাতে সেলামি দিতে হবে না তো?'

'তা ছাড়বে না বলেছে। যতদিন এ-মেলায় আমরা আছি, ততদিন ওটা দিতেই হবে।'

নয়নের মুখ ঈষৎ রুগ্ন দেখাল। একটু পরে সে বলল—'তুমি খুব বোকা হয়ে গেছ গো!'

'কেন?' বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম।

'বড়োবাবুর এ জেদের কারণ বুঝতে পারোনি?'

'না তো!'

'তার মতলব ভালো না।'

আরও বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করে বললাম—'কী চায় সে? তোমাকে?'

নয়ন খিলখিল করে হেসে উঠল।—'শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়। সে রাতে আমি ঠিকই টের পেয়েছিলাম।'

'দুর্গাদা জানেন এ কথা?'

'জানেন বইকি।' নয়ন অপরূপ ভ্রূ-ভঙ্গি করল। 'আমাকে বলেছিলেন...'

বাধা দিয়ে বললাম—'কী বলেছিলেন?'

'বলবো না।'

ফের অস্ফুট চিৎকার করলাম—'বলতে হবে তোমাকে।'

'যদি না বলি?'

ক্রোধে চুপ করে বসে থাকলাম। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

'ইস, স্বামীগিরি ফলানো হচ্ছে!' নয়ন আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। 'বউকে বাঁচাও না এবার। দেখি কেমন বীরপুরুষ!'

একসময় চাপাস্বরে বললাম—'নয়ন, এর আগে কোনোদিন কি এমন ঘটেছিল?'

নয়ন চোখ নাচিয়ে বলল—'ও, বুঝেছি। স্ত্রীর সতীত্ব যাচাই হচ্ছে!'

'যদি বলি, আর ও-পথে তোমাকে পা বাড়াতে দেব না?'

একটুখানি চুপ করে থেকে নয়ন বলল—'কোনোদিন এমন ঘটে নি। বাবু ওদিকে খুব কড়া। কিন্তু কিছুদিন থেকে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন—তুমি বিশ্বাস করো, আমি ভাবতে পারিনি—উনি এমন বললেন।'

'তুমি নিশ্চয়ই মানবে না ও-হুকুম?'

'আমি মানা না-মানার কে? বাবুকে বলো ও-কথা।' নয়ন হঠাৎ উঠে চলে গেল।

পেছনে পেছনে গিয়ে তার কাঁধ ধরে বললাম—'বাবুকে যা বলার আমি বলছি। কিন্তু আমি জানতে চাই—তুমি কেন এর প্রতিবাদ করবে না? তুমি কি জানোয়ারের মতো বশ মেনে থাকবে নয়ন?'

নয়ন পিছন ফিরে মুখ তুলে সোজাসুজি তাকাল আমার চোখের দিকে। বলল—'এ-কথা তোমার মুখে সাজে না।'

আস্তে আস্তে আমি সরে এলাম। নয়নতারা মিথ্যে বলেনি। আমিও তার মতো জানোয়ার—প্রতি রাতে তার শরীরের ওপর জানোয়ারের নিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকি। তার নারীত্ব তার মর্যাদা আমিও কি দিতে পারছি? পতনের স্রোতে আমি ও নয়ন গা ভাসিয়ে দিয়েছি। তাকে ফিরতে বলার কী অধিকার আছে আমার?

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল—নয়নতারা আমাকে ভালোবাসে না। আমি শুধু রাহুর মতো তাকে গ্রাস করে আছি।

এলোমেলো ভাবে সারা দুপুর আমবাগানে একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। নারী, নটী ও ভালোবাসা—এই তিনটি শব্দ সেতারের তারে তিনটি স্তরের ধ্বনি হয়ে বাজছিল। আমি নারী চাই, নটীকেও চাই—তাদের ভালোবাসাও আকাঙ্ক্ষা করি। পৃথিবীতে আমার মতো উন্মাদ ভিখারি কেউ আছে কি? আমবাগানের ছায়ায় পাখি ডাকছিল। মাঠে প্রজাপতি ও ঘাসফড়িঙেরা উড়ে বেড়াচ্ছিল। দূরের গ্রাম, নদী, তালবন, নগ্ন মাঠ, নির্জন ভ্রাম্যমান মানুষ—সবকিছুর জগতে আমি কেবল একটা অর্থ খুঁজছিলাম। ভালোবাসার অর্থ। কী এই ভালোবাসা? বিড়বিড় করে উঠেছিলাম—ভালোবাসা কী? কেন তার আক্রমণ আমাকে এক চোরাবালিতে নিক্ষিপ্ত করল? আমি কি তাকে চেয়েছিলাম কোনোদিন? ত্রিলোচনের ঘরে, আমার ঘরে, আমার অতীত জীবনের কোথাও কোনো নারীর দিকে ভালোবাসা প্রার্থনা করেছিলাম কি?

কোনো নজির নেই। অথচ আজ আমি আক্রান্ত।

রাতের আসরে নয়নতারার দিকে তাকালাম। গান গাইতে গাইতে দেখলাম তাকে। আমার গানের সৃষ্টির মতো—আমারই কণ্ঠস্বরের প্রতিমূর্তির ন্যায়, ইতস্তত সঞ্চালিতা নটী নয়ন পলকে-পলকে ভালোবাসাকেই প্রকাশ করতে ব্যগ্র। ওই তো সে—যা আমি চাই।

প্রতিটি দিনের মোহভঙ্গ, প্রতিটি রাতে সে মোহের পুনর্জন্মলাভ—এই কঠিন অসহায় যন্ত্রণা আমাকে কাতর করে তুলছিল ক্রমে ক্রমে।

সে-রাতে নয়নতারার উদ্দেশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল দুর্গামোহন—'মেয়েটা বুঝি সব খুইয়ে বসলো, নন্দ!' সব খোয়ানোটা কী তা হলে? এইটে আমাকে অবাক করে। বাকি কিছু ছিল নয়নের? দুর্গামোহনই কি তাকে বারবার খোয়ানোর পথে ঠেলে দিচ্ছে না?

দুর্গামোহনের ওপর অব্যক্ত যে ক্রোধ আমার মধ্যে দানা বেঁধেছিল—হঠাৎ সুযোগ পেয়ে তা আত্মপ্রকাশ করল এতদিনে।

কাল-বোশেখির দিন এখন। বিকেলে দারুণ ঝড়বৃষ্টি শিলাপা শুরু হয়েছিল। তাঁবুর ভেতর ভয়ে কাঠ হয়ে বসেছিলাম আমরা। ভাগ্যের ঘর উড়ে যাবার আবেগ নিয়ে থরথর করে কাঁপছিল। দুর্গামোহন সেই ঝড়ের মধ্যে ভাগ্যের ঘরে বসে মদ খাচ্ছিল অভ্যাসমতো। ত্রিপলের পুরু ছাদ সরে যাচ্ছিল বারবার। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম সব। নয়ন বলছিল—'এমন অনেক ঝড় গেছে অনেক মেলায়। কোনোদিন উড়ে যায় নি তাঁবু। উড়ে গেলে কিন্তু বেশ হয়, না?'

মুখ টিপে হাসছিল সে। বলেছিলাম—'মরে যাবে সব—বাঁচতে তো পারবে না!'

'সেও ভালো। তুমি আমি একসঙ্গে জড়াজড়ি করে মরে থাকবো!'

পরিহাস ভালো লাগার মতো পরিবেশ নয়। বলেছিলাম,—'আজ শো বন্ধ নির্ঘাৎ।'

রাত একপ্রহর অবধি বৃষ্টি থামল না। সত্যি সত্যি শো বন্ধ রইল। দুর্গামোহন ভাগ্যের ঘর থেকে বেরোয় নি। যতবারই গেলাম, দেখলাম সে মদের গেলাস হাতে ছক পেতে বসে রয়েছে। মুখ তুলে শুধু বলেছে—'আয় রে নন্দ, দু-হাত খেলি।' কিন্তু খেলবার কোনো লক্ষণ তারপর তার দেখিনি। চলে এসেছি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর। ঘাসে জল ছপছপ করছে রাত্রির অন্ধকারে। আমবাগানের পোকামাকড়ের একটানা ডাক। মেলাটা নিঃঝুম হয়ে গেছে একবারে। কোথাও পর্দার ফাঁকে ক্ষীণ আলোর রেখা মুহূর্তে হাওয়ার দোলায় ঝিলিক দিচ্ছে। জনমানবহীন মেলাটা পোড়ো দালানবাড়ির মতো ভৌতিক ও রহস্যময় মনে হচ্ছিল। আমার তাঁবুর দরজায় ফিরে ডেকেছিলাম—'নয়ন, ও নয়ন!'

কোনো সাড়া না পেয়ে দুর্গামোহনের তাঁবুতে—আগে যেখানে নয়নতারা থাকত—সেখানে গিয়ে সরাসরি পর্দা তুলে ঢুকলাম। পরমুহূর্তে আমার চোখের ওপর উজ্জ্বল টর্চের আলো—একটা চাপা গর্জন : 'এই উল্লুক, ভাগ য়িঁহাসে, ভাগ...'

হতচকিতভাবে বেরিয়ে আসতেই রঘুর কণ্ঠস্বর। 'কে ওখানে? ছোটবাবু?'

এগিয়ে গিয়ে বললাম 'ও-ঘরে কে রে রঘু?'

রঘু চাপাস্বরে বলল—'থানার বড়বাবু। অনেকক্ষণ এসে বসে আছেন ও-ঘরে।'

উত্তেজিতভাবে বললাম—'নয়ন, নয়ন কোথায়?'

রঘু বলল—তাকেই তো খুঁজছি। গেল কোথায়? মালিকবাবুর কাছে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ দেখি আপনি বেরিয়েছেন...'

বড় তাঁবুর ভেতর গিয়ে ডাকলাম—'নয়ন, নয়ন!' আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। এক লাফে স্টেজে উঠে ফের ডাকলুম—'নয়ন!' কোনো সাড়া পেলাম না। ভাগ্যের ঘর থেকে দুর্গামোহন বলল--'কী হয়েছে নন্দ?' জবাব না দিয়ে দ্রুত আমার তাঁবুতে ঢুকলাম। দেখলাম ডিব্বু একা বসে আছে। বললাম—'তোর মা কোথা রে?'

ডিব্বু বলল—'বেরিয়ে গেছে।'

'কোথায়?

'তা জানি নে।'

সে তার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ক্ষিপ্রহাতে টর্চটা বের করে আমবাগানে গেলাম। কাদায় পিছল হয়ে আছে মাটি। বারবার টর্চ জ্বালছিলাম। ডাকছিলাম—'নয়ন, নয়ন!'

বাগানের ও-প্রান্তে সেই দিঘি। ভাঙাঘাটের ওপর আলো পড়তেই চমকে উঠলাম। দেখলাম ভেজা শ্যাওলা-ধরা চত্বরে নয়ন বসে আছে একা। চুল খোঁপা খুলে উপচে পড়ছে পিঠে। ঈষৎ ঝুঁকে বসে আছে সে। কী করছে নয়নতারা?

টর্চের আলো পড়তেই মুখ ফেরাল একবার। ছুটে তার হাত ধরে টানলাম—'কী করছো এখানে?'

নয়ন হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিঃশব্দে সে কাঁদছিল ফুলে-ফুলে।

বললাম—'কেঁদো না। তোমার কোনো ভয় নেই নয়ন, আমি যতক্ষণ আছি...'

'আমি বেশ্যা নই নন্দ!'

'জানি।'

'কোনোদিন বাবু আমাকে এমনি করে ঠেলে দেননি। আজ কেন এমন হলেন নন্দ?'

ঠিক এই কথাটা আমিও ভাবছিলাম।

ফিরে এসে সোজা ভাগ্যের ঘরে ঢুকলাম। দুর্গামোহন মুখ তুলে বলল—'এসো নন্দ।'

'আমি একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে।'

'কী কথা বলো তো?' দুর্গামোহন পা ছড়িয়ে দিল ছকের ওপর। নীলাভ আলোয় তার চোখ জ্বলছিল।

'নয়নকে দারোগাবাবুর কাছে যেতে বলেছেন কেন?'

'কৈফিয়ৎ চাচ্ছো নন্দ?'

'যদি বলি তা-ই?'

'কী অধিকার তোমার?' দুর্গামোহন অভ্যাসমতো দুলে-দুলে নিঃশব্দে হাসছিল।

'আপনি দিয়েছেন সে অধিকার।'

'জানি, তুমি লেখাপড়া-জানা মানুষ—জানতাম, তুমি এটা মানতে চাইবে না।'

'তবে কেন এ হুকুম দিয়েছেন?'

'কেন?' দুর্গামোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ফের বলল—'যদি না বুঝে থাকো, বোঝাতেও আমি চাই নে। তবে হুকুম যা দিয়েছি—রদ হবে না।'

'বাবা হয়ে মেয়ের দেহ নিয়ে ব্যবসা করতে পারেন আপনি...'

বাধা দিয়ে দুর্গামোহন বলল—'আমি নেশা করেছি নন্দ, বেশি উত্ত্যক্ত করো না! এখন যাও।'

'যেতে হলে একেবারেই চলে যাব।'

'তাতে আমার কিছু যায়-আসে না নন্দ। তুমি রতন মাস্টার নও, তুষ্টুরামও নও—আমার কোনো ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া—লোকের অভাব আমার কোনোদিনই হবে না। একটা যাবে—আর একটা আসবে...'

'বেশ তাই যাচ্ছি।'

বেরিয়ে নিজের তাঁবুতে এলাম। নয়ন বসেছিল মুখ নিচু করে। কিছু না বলে কাপড়চোপড় গোছাতে থাকলাম ব্যাগে। নয়ন মুখ তুলে দেখল মাত্র। কিছু বলল না।

আমবাগানের ভেতর দিয়ে পথটা চলে গেছে স্টেশনের দিকে। বাগানের অন্ধকারে পা বাড়ানোর মুহূর্তে পেছন ফিরে তাঁবুটা দেখবার সাধ হ'ল মুহূর্তের জন্য। এবং সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। আমার শরীরের কোষে কোষে আর্তনাদ বেজে উঠল। স্নায়ুতে মজ্জায় রক্তে মাংসে কান্না গলে গলে ঝরতে থাকল অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার ন্যায়। স্মৃতি আমার হাত ধরল ছায়ার আড়াল থেকে ঃ সব ফেলে গেলে নন্দ, ভালোবাসা, সংগীত, কোলাহল, জনতার মুখ, আনন্দ—ফেলে চললে তোমার নটীকে—যার স্পর্শে তোমার জীবন অলৌকিককে অনুভব করেছে দিনের পর দিন!

এত নিঃস্ব, এত অসহায় নিজেকে কোনোদিন ভাবিনি! এরপর কী রইল আমার? ধু-ধু শূন্যতার সীমানা মুখব্যাদান করে আছে সুমুখে—যেখানে সবই অর্থহীন। নয়ন যেখানে নেই, সেখানে কিছু নেই—কোনো অর্থ নেই!

সুমুখে সর্বগ্রাসী শূন্যতা—পেছনে আমার ভালোবাসা—দুর্যোগে পঙ্কিলতার ক্লেদে জীর্ণ—তবু ভালোবাসা—তবু জীবনের একটা প্রবল পূর্ণতার আলোড়ন—জনতার চিৎকারে, সংগীতে, তাঁবুর জগতে দিন-রাত্রিযাপনের দয়াহীন অবসরে।

নয়নতারা এসে আমাকে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাক। কিংবা অন্য কেউ—আমাকে একবার বলুক, 'ফিরে এসো!' আমার সারা জীবন দাসখত লিখে দিতে পারতাম তার পায়ে।

ছেলেমানুষের হৃদয়ের মতো আমার যুবকহৃদয় ভেঙে পড়ছিল। কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়েছিলাম কাদার ওপর। এ কী দুর্মর দুশ্ছেদ্য কঠিন মায়া কী দারুণ অভিশাপ... এ বাঁধন যে রক্তে ওতপ্রোত হয়ে গেছে, কেমন করে ছিঁড়ে ফেলি! দু'হাতে মুখ ঢেকে সত্য আমি কাঁদছিলাম—উদ্ধার প্রার্থনা করছিলাম ঈশ্বরের কাছে। মাথার চুল ছিঁড়ে বিড়বিড় করছিলাম—এ আমি কী করেছি, কী করেছি? কেন এই তাঁবুর জগতে চলে এসেছিলাম নিষ্ফল মোহের বিভ্রমণে!

ভালোবাসা এত ভয়ংকর এত সর্বগ্রাসী আমি জানতাম না। উন্মত্তের মতো সে আমাকে চাবুক মারছিল।

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম জানি না, যখন উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম আমার তাঁবুর দরজায় একটা হ্যাসাগ হাতে দুর্গামোহন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ওই দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা আশ্চর্য স্বাভাবিকতা রয়েছে। আমি চলে যাবার পরও ওই তাঁবুর জগৎটা এই স্বাভাবিকতাকে নিটোল রাখবে। দুর্গামোহন নিজেই তো ওই তাঁবুর জগৎ। সে স্থির থাকলে তার সৃষ্টিও স্থির থাকবে। আমার না-থাকায় কোনো পরিবর্তন জাগবে না।

নয়নতারা একই নিষ্ঠায় অভ্যাসে আয়নার সুমুখে সাজতে বসবে। কপালের কাটা দাগ ঘিরে আলপনা আঁকবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি। ডিব্বুও সকালে উঠে বলবে না—'নন্দমামা, চলো একটু বেড়িয়ে আসি।' হয়তো সে চাপাটিকেই বেছে নেবে। এমনকি একদিন দুর্গামোহন ওই চাপাটিকেই নয়নতারার শয্যায় ঠেলে দেবে! স্বামী-স্ত্রীর খেলা শুরু হবে নতুন করে।

'মোহিনী ভ্যারাইটি শো'র জগৎ আমি ছাড়াও বেঁচে থাকবে—অব্যাহত গতিতে দিনযাপন করবে।

মেলা থেকে মেলায়, জনতা থেকে জনতায়—কোলাহলে—ধারা বাহিক তার যাত্রা।

অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। নিতান্ত মূল্যহীন আমি—হেলায় কুড়িয়ে নিয়ে হেলায় ফের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে 'মোহিনী ভ্যারাইটি শো' পার্টি।

হঠাৎ দেখলাম—রঘু নয়নকে টেনে বের করছে তাঁবু থেকে। নয়নের কাতরোক্তি ও প্রতিবাদ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। কেষ্টও তার হাত ধরল এসে।

আমার মাথার ভেতর দিকে চাবুক পড়ল একবার। পলকে দ্রুত ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সুমুখে।

'ছেড়ে দাও বলছি!'

'দুর্গামোহন গর্জন করে উঠল, 'সরে যাও নন্দ!'

রঘু ও কেষ্ট অবাক হয়েছিল আমার আচরণে। শুধু রঘু বলল--'আপনি সরে যান ছোটবাবু!'

সেই মুহূর্তে পেছনে ওসমান খাঁ'র গর্জন। তার গলার শেকলটা ধরে চাপাটির আবির্ভাব। দুর্গামোহন আঁতকে উঠে বলল 'সর্বনাশ, ছোঁড়াটা মরবে দেখছি! যা, রেখে আয় ওটাকে...'

চাপাটিকে দেখে বিস্মিত হলাম। রাগে তার সারা শরীর ফুলছিল সাপের মতো। মরিয়া হয়ে সে বাঘটা বের করে এনেছে বুঝতে পারলাম। নয়নতারাকে সেও ভালোবাসে। হা ঈশ্বর। ওসমান সুমুখে এসে আড়মোড়া দিয়ে ফের গর্জন করল। রঘু ও কেষ্ট ভয়ে-ভয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে। দুর্গামোহন চাপাটির দিকে নিঃশব্দ ক্রোধে তাকিয়ে আছে। নয়ন চাপাটির হাত থেকে শেকলটা নিয়ে বলল—'ঘরে চল ওসমান!'

দুর্গামোহনের তাঁবু থেকে বড়বাবু এতক্ষণে বেরিয়ে এলো, 'কী ব্যাপার? এত গোলমাল কেন সব?'

রাগে ক্ষোভে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ওদিকে নয়ন অদ্ভুত হেসে বলে উঠল—'জানোয়ার নিয়ে ঘর করি বড়বাবু। দেখছেন না, কেমন পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। আপনার পিস্তল দিয়ে আগে মেরে ফেলুন দিকি একে...' মুখে আঁচল চেপে খিলখিল করে হাসল সে।

তার হাসিতে গভীর কারুণ্য ছিল।

বড়বাবু বেল্ট টাইট দিয়ে একটু হাসল মাত্র। তারপর হঠাৎ পেছন ফিরে মার্চের ভঙ্গিতে চলে গেল অন্ধকারের দিকে।

দুর্গামোহন এতক্ষণে মুখ খুলল—'তা হলে নন্দ, গেলে না?'

'না।'

অভ্যাসমতো সে হাসল না। একটু একটু টলছিল—অথচ উত্তেজিত দেখাল না আর। শান্তকণ্ঠে বলল—'একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে অনেক বেশি হইচই করা হ'ল শুধু। পার্টি তো তুলে দিতেই হবে—না-হয় আজই দিলাম তুলে, কী বলো নন্দ?'

ফের দৃঢ়স্বরে বললাম—'না'।

'না!' দুর্গামোহন এক পা এগিয়ে এলো। 'তুমি, না আমি পার্টির মালিক?'

'যেই মালিক হোক, আমি বলছি পার্টি থাকবে। আমি চালাবো পার্টি।'

'তাই নাকি! কিন্তু নন্দ, বেশ্যাগিরি যার চোখে পাপ, জুয়াখেলা তার চোখে পাপ নয় কেন বলো তো?'

এ জবাব দেবার মতো কিছু ছিল না। বললাম—'আপনি আমার গুরুজনের মতো। যদি অন্যায় বলে থাকি মাফ করবেন। কিন্তু দোহাই আপনার,—অন্তত নয়নকে আর ছকের গুটির মতো ব্যবহার করবেন না।'

'নন্দ, ইচ্ছে করলে তোমাকে আর চাপাটিকে আমি হজম করতে পারতাম—কিন্তু...

'কিন্তু কী?'

আর এমন করে দেশে দেশে যখন ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে নেই, তখন মিছিমিছি হাতে পাঁক মেখে লাভ কী? কে তুমি? কে ওই চাপাটি? পথের চেনা, পথেই চলে যাবে যে-যার দিকে।'

'খুন করার ভয় দেখাচ্ছেন?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে দুর্গামোহন রঘুকে বলল—'এখুনি তাঁবু গোটা—ভোরের ট্রেন ধরতে হবে।'

রঘু বলল—'তাবু যে ভিজে ভারি হয়ে গেছে!'

'তা হোক। আমি ট্রাকের খোঁজে যাচ্ছি। তোকে সব ভার দিয়ে গেলাম।' দুর্গামোহন টলতে টলতে চলে গেল।

একটু পরেই কয়েকটি হ্যাসাগ জ্বলে উঠল। লোকজন জেগে উঠল ঘুম থেকে। ব্যস্ততা শুরু হ'ল মধ্যরাতের অন্ধকারে। আমি কী করবো? চাপাটি?

এবং নয়ন?

১৪

ভোর হয়ে এসেছে। আকাশ পাখির ডিমের মতো চিত্রিত নীলে লালে। পূর্বের দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্রটা ক্রমে অপসৃত হচ্ছে গভীর দুর্গমতায়। আমবাগানের ভেতর তখনো কিছু আঁধার জমে রয়েছে।

তিনটি ট্রাক তৈরি রয়েছে শূন্য মাঠের ওপর। ইতস্তত টুকরো কিছু আবর্জনা পড়ে থাকল শুধু। তাদের মধ্যে কোনো চিহ্ন খুঁজে মিলবে না এই তাঁবুর জগতের—খুঁজে

পাওয়া যাবে না আমাদের অদ্ভুত ধরনের নীতিজ্ঞানটুকুও—যা নয়নতারা নামক একটি বাঈজি যুবতীকে অন্য এক পতন থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

তারপর কী হবে? আমি কী করবো এবার?

খুঁজছিলাম চাপাটিকে। নয়নের জন্যে আর ভাবছিলাম না। আজ রাতে কিছুক্ষণের জন্যে সে বিদ্রোহ করেছিল—পরের কোনো রাতে এ-বিদ্রোহ হয়তো তার নিজের কাছেও অর্থহীন মনে হবে।

একসময় দেখলাম গুটিয়ে রাখা তাঁবুর বান্ডিলের এককোণে—ট্রাকের ওপর সে হেলান দিয়ে বসে আছে। কতকটা গর্তে লুকিয়ে থাকা খরগোশের বাচ্চার মতো দেখাচ্ছে তাকে। এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম—'চাপাটি!'

চাপাটি ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল। বুঝলাম সে দল ছাড়তে রাজি নয়। লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁবুর জগতের সঙ্গে সে শেষ অব্দি পৌঁছতে চায়। সে যেন ওটার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। দুর্গামোহন তাকে লাথি মারবে—সে ক্ষমা চাইবে—কাঁদবে—পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

রাগে দুঃখে গা জ্বালা করছিল। সরে এলাম নিঃশব্দে।

ট্রাকগুলি স্টার্ট দিল। সুমুখের ট্রাকে ড্রাইভারের সিটের পাশে নয়নকে দেখলাম বসে থাকতে—তার পাশে ডিব্বু। সেই ট্রাকটার চাকা গড়াতে থাকল। আমার বুকের উপর দিয়ে তার যাত্রা—বুক ভেঙে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়।

পরের দুটি ট্রাকও তাকে অনুসরণ করল। দুর্গামোহনকে দেখতে পেলাম না কোনোটাতে। অথচ খানিক আগেও তাকে দেখেছি।

বিস্ময় ছিল না—সে-মুহূর্তে নয়নের নির্বিকার প্রস্থান আমাকে অসহায় ক্রোধে আড়ষ্ট করে রেখেছে। ঘৃণা ও অভিমান আমাকে চূর্ণ করে দিচ্ছে।

আস্তে-আস্তে কখন আমি এক বিচিত্র অনুভূতির জগতে পৌঁছে গেলাম তারপর।

কিংবা কোনো অনুভূতি নয়—এ এক বোধশূন্যতা। শূন্য পোড়ো মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দূরেব পথে একটা অলৌকিকের নিষ্ক্রমণ দেখতে দেখতে প্রচণ্ড বিস্মৃতি আমাকে ঘিরে ধরছিল। স্বপ্ন নয়—জাগরণ নয়—স্থির নিশ্চল পুতুল হয়ে গেছি। আমার চারপাশে সুগভীর শূন্যতায় স্পষ্টতম হয়ে আছে তা। স্বচ্ছ হয়ে ওঠা অন্ধকারে তাকে প্রত্যক্ষ করছি।

তারপর কখন হাঁটতে শুরু করেছি। আমবাগান বাঁ পাশে রেখে পথের ওপব পা ফেলেছি। চড়াইয়ের পথ। দু-পাশে বৈঁচি আর শেয়াকুলের জঙ্গল। একটা বাঁক পেরিয়ে যেতেই পেছনে ডাক শুনলাম—'নন্দ!' ফিরে দেখে পলকে সারা শরীর ঝনঝন করে বেজে উঠল। সমস্ত ইন্দ্রিয় জেগে উঠে ওই ডাককে গ্রহণ করছিল। গভীর ঘুমের পর—কেননা পূর্বের সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম—পরিচিত প্রিয়জনের মুখ দেখার সুখ আমাকে নাড়া দিল।

দুর্গামোহন এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল—'নন্দ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম ভাই।' দেবতার মতো রাজার মতো দুর্গামোহন আমাকে আকর্ষণ করল। জুয়াড়ি, পাপী, সমাজের ঘৃণ্যতম জীবস্বরূপ ওই নীচমনা মাতাল দুর্গামোহন হঠাৎ অনন্ত সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে যেন ঈশ্বরের মতো বলল—'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম নন্দ।'

মল্লারপুরে দুর্গামোহনের দালানবাড়ির একটি ঘরে ফের রাত নামল। সেঘরে সারাদিনের পর এতক্ষণে নয়নতারা এসে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি।—'কী গো, রাগ পড়ল?'

বিস্ময়ের কিছু বাকি নেই? ব্যঙ্গ আমার দাঁতে শিরশির করে কাঁপছিল। লোভী কুকুরের মতো তার পেছন পেছন চলে এসেছি—হয়তো এমনি করেই সে ব্যাপারটা ভাবছে—তাই জবাব দিলাম না কথার।

ঘরটা বেশ প্রশস্ত। কোণের দিকে একটা মস্ত খাট। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। একটা আলনা আর সিন্দুক একপাশে—অন্য পাশে দেয়ালে বিরাট ড্রেসিং টেবিল। বেঞ্চের ওপর ঝালর দেওয়া কাপড়ে ঢাকা গুটিকয় বাক্স। তবলা বাঁয়া-তানপুরা- হারমোনিয়ামও দেখতে পাচ্ছিলাম মেঝেয় পড়ে থাকতে। এই বুঝি নয়নের ঘর। কখন সে কিছুটা গোছগাছ করে ফেলেছে।

পৌঁছনোর পরই ঘুরে ফিরে দুর্গামোহনের দালানবাড়িটা দেখে ফেলেছি। বেশ কয়েক বিঘে জমির ওপর নতুন বাড়ি করেছে সে। পুবদিকে খোলা পাঁচিল ঘেরা জমিতে অনাদরে লাগানো কিছু ফুলগাছ—সারিবদ্ধ খোঁয়ার সদৃশ্য কয়েকটি টিনের ঘর পাঁচিলের গা ঘেঁষে? শুনলাম জন্তুগুলির জন্য ওই ব্যবস্থা। মরশুমে মেলায় বেরিয়ে গেলে শূন্য বাড়িতে বাস করে এক দূর সম্পর্কের পিসি। বয়সে বৃদ্ধা। সে পেছনের একটা ঘরে থাকে। আর থাকে একজন পাহারাদার। লম্বা-চওড়া দানবের মতো দেহ—অনন্ত। অনন্ত আমাকে ছোটবাবু বলে সেলাম করলে গর্বিতভাবে একটু হেসেছিলাম মাত্র।

দুর্গামোহন ওপরের ঘরে বিশ্রাম করছিল। সন্ধ্যার পরও বেরোয়নি আর। পার্টির অন্যান্য লোকজন তাদের নির্দিষ্ট ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল নয়নতারাকে দেখেছিলাম ছোটাছুটি করে বেড়াতে। ডিব্বু দুর্গামোহনের কাছে রয়েছে—সেখানেই সে থাকে মল্লারপুরে ফিরে এলে।

আমাকে কথা বলতে না দেখে নয়নতারা খাটে ধুপ করে বসল! ফের বলল—'রাগ বাকি থাকলে তাও পড়ে যাবে—একটু দেরি আছে। রান্না এখনো নামেনি তো!' সে মৃদু-মৃদু হাসছিল।

তবু আমি কথা বললাম না। কিছু বলার ছিল না তাকে।

'আমি জানতাম, তুমি আসবে।' নয়ন ফের বলে উঠল।

জবাব না দিয়ে পারলাম না এবার।—'আসতাম না। দুর্গাদা নিয়ে এলেন।'

'তুমি কি আমার ওপর রাগ করে আছ, নন্দ?'

'কেন?'

নয়ন সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল—'যদি রাগ করে থাকো, ভুল করেছ। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি নি সত্যি—কিন্তু সবসময় তোমার জন্যে ভেবেছি।'

'কী ভেবেছ?'

'বিশ্বাস করো—তুমি সত্যি-সত্যি চলে গেলে আমি ওসমান খাঁ'র মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিতাম!'

'বাজে বলো না!'

'বিশ্বাস করো, নন্দ! বাবু আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই..'

'তার মানে—তোমার জন্যেই আমাকে ফিরিয়ে আনল দুর্গাদা?'

'আমার বিশ্বাস তাই। তুমি না থাকলে উনি সত্যি হয়তো আমাকে বেশ্যাগিরির পথে ঠেলে দিতেন।'

এরপর আরও অনেক কথা পরস্পর দু'জনে বলেছিলাম সে রাতে। অনেক হাস্যকর প্রলাপোক্তি—তার মধ্যে হয়তো সত্য ছিল—পরস্পরকে বোঝবার একটা করুণ প্রয়াস।

ক'দিন পরে।

দুর্গামোহন সেই যে তার ঘরে ঢুকে রইল—আর বেরোয়নি। দেখা করতে চেয়েছি – অনন্ত বলেছে, 'বাবুর বারণ আছে।' নয়নও অবাক হয়েছিল কিছুটা। ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত আড়ষ্টতা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আটপৌরে নয়ন—তার সারাদিনের ও রাতের সাধারণ জীবনযাপনে আমাকে খুশি করতে পারছিল না। কই, কোথায় সে নটী, —যার জন্যে আমার সব সাধ সব সাহস গর্ব ত্যাগ করে এ পথে পা বাড়িয়েছি? তুষ্টুরামের মতো জনতার মদ চুমুকে-চুমুকে পান করার ইচ্ছায় আমি অধীর ছিলাম। এই একটি সাধারণ মেয়ের সংসর্গ অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

এবং নটী নয়নকে ফিরে পেতে চেয়ে সেদিন সন্ধ্যার পর আমার ঘরে গান বাজনার আসর বসিয়েছিলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নয়ন নাচছিল। অনন্ত তবলা বাজায় বেশ। জমে উঠেছিল আসর। হঠাৎ সেখানে দুর্গামোহন এলো টলতে-টলতে। সে কিছুক্ষণ নিষ্পলক লাল চোখে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করল। আমরা তার আকস্মিক আবির্ভাবে থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরের সব কিছু স্তব্ধ হয়ে উঠেছিল।

দুর্গামোহন জড়ানো গলায় ডাকল—'নন্দ'।

'বলুন।' আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'আমি চাই না এসব, বুঝেছ?'

চুপ করে থাকলাম।

'আমার এসব ভালো লাগে না আর, নন্দ। নরকের দরজায় আমি পৌঁছে গেছি। এপথে থাকলে তুমিও আমাকে আটকাতে পারবে না—হয়তো কখন তোমারই টুঁটি টিপে ধরব। এ বড় লোভের পথ...'

আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

দুর্গামোহন বলল—'অনন্ত, এই যন্ত্রগুলো সব সিন্দুকে পুরে তালা এঁটে দে। কেউ যেন আর না খোলে।'

অনন্ত উঠে একে-একে সব যন্ত্র সিন্দুকে পুরতে থাকল। আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখলাম এই অদ্ভুত দৃশ্য। শেষে অনন্ত নয়নের পায়ের ঘুঙুর খুলে নিতে হাত বাড়ালে নয়ন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দুর্গামোহন গর্জে উঠল—'হারামজাদির চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারব!'

আতঙ্কে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকল নয়নতারা! দুর্গামোহন আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'নন্দ, আমি পার্টি ভেঙে দিলাম। জন্তুগুলোর খদ্দের আসবে কাল কলকাতা থেকে। আর আমার কিছু ভালো লাগে না। এতে কোনো সুখ নেই নন্দ, কোনো সুখ নেই...' বলতে-বলতে সে হঠাৎ বেরিয়ে গেল তেমনি নাটকীয় ভাবে।

কী সুখ খুঁজেছিল জুয়াড়ি দুর্গামোহন? কী সে পেল না?

আর আমি?

রাতের শয্যায় নয়নতারা একপাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকল। কোনো কথা বলল না। সব খেলা শেষ হয়ে গেছে—আমরা এখন প্রকৃতভাবে ক্লান্ত। আমার পাশে খেলার পুতুল স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। দুর্গামোহনের জাদুদণ্ডের সৃষ্টি সেই নটী ফের শূন্যে মিলিয়ে গেছে চিরকালের মতো।

ঠিক মধ্যরাতে আমি ফিস-ফিস করে ডাকলাম—'নয়ন!' সে ঘুমোয় নি। পাশ ফিরে শুয়ে থেকেই বলল—'বলো।'

'কিছু না।' কী বলব তাকে?

'নন্দ, তুমি এবার সত্যি-সত্যি চলে যাবে, তাই না?'

'কেন নয়ন?'

'তোমার ভালোবাসার মেয়েকে তো আর দেখতে পাবে না কোনোদিন।' বলতে বলতে একটু হাসল সে—'নাকি ঝুমুর দল গড়ে আমাকে সঙ্গে নেবে?'

জবাব দিলাম না।

'তবে কী করবে?'

'জানি না।'

নয়ন হঠাৎ উঠে বসল। আমার পা জড়িয়ে ধরল সে। 'নন্দ, দোহাই নন্দ, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না। আমিও আর কী নিয়ে থাকব নন্দ?'

ক'দিন পরে।

সে রাতে নয়নকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সকালের রোদ ফোটবার পরই তা যেন মাথার খুব ভিতর দিকে কোথাও একখণ্ড পাথরের মতন আটকে থাকা অস্পষ্ট যন্ত্রণায় স্পষ্ট হতে থাকল ক্রমান্বয়ে। সারাটি দিন বিহ্বল চিত্তে সেই বাগানবাড়ির ভিতর ঘুরে বেড়ালাম একা। ওদিকে নয়ন কী গরবে গরবিনী—ঘর্মাক্ত মুখে ঘর গোছাচ্ছে, ঝাড়পোঁছ করছে, বারবার অনন্তকে ডাকাডাকিতে ব্যস্ত করে তুলছে। আমি যখন উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে ওসমান খাঁ'র ক্লান্ত লুণ্ঠিত শরীরের দিকে তাকিয়ে আছি, আমিনার ঘননীল চোখদুটিকে অবোধ মেয়েহৃদয়ের নিঃশব্দ যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত হতে দেখছি, কিংবা বুড়ুয়া সজারুর মুখ ফিরিয়ে থাকা স্তব্ধ কাঁটার পালকে নিষ্ফল বিষের অট্টহাসি শোনবার জন্যে কান পাতছি—তখনই অনন্ত এসে বলে যাচ্ছিল, 'ও ছোটবাবু শিগগির এসো, জলদি!'

'কী অনন্ত?'

'ঘরে পট খুলে বসে আছে ছোটগিন্নি...'

ছোটগিন্নি! অনন্তও এতদিনে নয়নের মতো সুখি হবার নির্বোধ ইচ্ছায় আপ্লুত। তাকে ধমক দিয়ে চলে যেতে বলেছিলাম। সে না বললেও আমি জানতাম, নয়ন কী করছে। কিন্তু দুর্গামোহন? ঘাড় ফিরিয়ে দোতলার জানালায় তাকে একবার মাত্র দেখতে পেলাম। চোখের ভুল কিনা কে জানে, সে যেন আমার অগোচরে এতক্ষণ আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

মুহূর্তে গা-ছমছম করে উঠেছিল আমার। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ওসমান খাঁ'র প্রতিচ্ছবি যেন তার প্রকাণ্ড মুখমণ্ডলে। মনে হচ্ছিল—শেষ ভয়ংকর গর্জন, শেষ রক্তপাতের অবিচল

প্রতীক্ষায় সে চুপিচুপি আমাকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করছে। নয়নের কাছে সমর্পিত আমার প্রতিশ্রুতি আক্রমণভীত শশকের মতো ক্রমশ মাথার আরও গভীরে লুকিয়ে যেতে চাইল।

দুর্গামোহন কি চায়, আমি এখানে নয়নের সঙ্গে অবশিষ্ট জীবনের জন্যে ঘর বাঁধি। সত্যি তো! এ-সম্মতি তো তার কাছ হতে নেবার প্রয়োজন ছিল।

তখনই নয়নের কাছে কথাটা তোলার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ক'পা এগোতেই আচম্বিতে পিছনে ওসমান খাঁ'র প্রচণ্ড গর্জন--ফিরে দেখি, সে খাঁচার শিকের উপর মুখ ঘষছে। বড় বড় হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। প্রকাণ্ড জিভ থেকে লালা ঝরছে।

পরক্ষণেই হাসি পেল। আমার প্রতিশ্রুতি, দুর্গামোহনের সম্মতি: এক উচ্ছিষ্ট বাঈজিমেয়ের শবদেহের পাশে শুয়ে জীবনকাল অতিবাহিত করবার জন্যে ওই দুটি বিচিত্র ঘটনাকে নির্ভর করে থাকা। এ ছাড়া কি আর কিছু থাকতে নেই—যা পৃথিবীর সকল সাধারণ মানুষ ও মানুষীর জন্য সহজ হয়ে আছে?

সত্যি বলতে কী, ত্রিলোচনের জন্যে—একমাত্র ত্রিলোচনের জন্যেই এ বিপুল ক্ষুধা আমাকে তখনই কাতর করে ফেলল। এ মুহূর্তে যদি তার কাছে ফিরে যেতে পারি—সেই পরিত্যক্ত তক্তপোশে, অবাস্তব নারীমূর্তিদের জগতে, পাশে অতি কাছে ন্যাশনাল হাইওয়ে, পরিচিত পৃথিবীর কোলাহলে।

নয়নের নূতন করে সাজানো ঘরে মমতার আশ্বাস, ভালোবাসার স্পর্শ, সকলই খুব হাস্যকর মনে হচ্ছিল। ঘরে সত্যি পট খুলে বসে ছিল 'ছোটগিন্নি' নয়নতারা। নিতান্ত পট। এক পটের খেলা গুটিয়ে গেছে। দুর্গামোহনের ঝাঁপিতে তা লুকিয়ে পড়েছে। এবার আরেক নতুন পট, নতুন ছবি। সে-ছবিতে নয়নতারার মুখে অন্য রঙ, ভিন্ন উজ্জ্বলতা।

ভালো লাগছিল। অথচ শুধু মনে হয়, এর কোথাও একটা কারচুপি আছে। গুরুতর ভ্রান্তি রয়েছে। সব উজ্জ্বলতা ও আশ্বাসে ভরা নতুন পৃথিবীটা ঠিক শূন্যে ভাসমান এই পৃথিবীর মতো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে নয়। তার অবস্থানটা যেন স্বাভাবিক নয়। নীচের কেন্দ্রে একটা সূক্ষ্ম সূচিমুখ শলাকা তাকে ধারণ করে আছে। সে অন্যনির্ভর। এবং সে শলাকার নাম, আমার প্রতিশ্রুতি। অতি সহজেই যা ভেঙে পড়তে পারে।

ওই 'প্রতিশ্রুতি' কাল হয়ে পথ আটকাচ্ছিল বারবার। আর, আমি রীতিমতো অভিনেতার আচরণে নয়নকে তুষ্ট রাখতে চাচ্ছিলাম।

বাগানের ওদিকে থেকে তারপর প্রায়ই ঘনঘন ওসমান খাঁ'র চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। ক্ষুব্ধভাবে বলেছিলাম—'ওকে থামিয়ে দেবার কি কেউ নেই?'

নয়ন বলেছিল--'কলকাতা থেকে শিগ্রি খদ্দের আসবে শুনেছি। বেচে ফেলবেন বাবু।' একটু চুপ করে থেকে সে ফের বলেছিল—'সত্যি, আমাকেও বড় অসহ্য লাগে। সব কথা মনে পড়ে যায়। সেই আমবাগান, তাঁবু, পাশাখেলা...উঃ মাগো!'

পরের রাত থেকে বাঘটার গর্জন আরও তীব্র হয়ে উঠল। ঘুমোতে পারছিলাম না। নয়নও ঘুমের ঘোরে বারবার চমকে উঠছিল। আমাকে আঁকড়ে ধরছিল। বিরক্তভাব উঠতেই সে জেগে গিয়েছিল।—'ও কী? কোথায় যাচ্ছ?'

'বাইরে।'

'কেন?' নয়ন ধুড়মুড় করে উঠে বসল। তারপর আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। তার এই আবরণে কেমন একটা অশালীনতা ছিল যেন।

'এমনি। ঘুম আসে না।'

নয়ন কিছুক্ষণ তেমনি দৃষ্টিতে আমাকে দেখে তারপর বলল—'তোমার কি এসব আর ভালো লাগছে না নন্দ?'

'এ কথা কেন?'

বাইরে বিষণ্ণ জ্যোৎস্না। ঠিক মধ্যরাত। বাতাসের বিহ্বলতা রাত আর জ্যোৎস্নাকে অনর্গল কী বিষাদব্যঞ্জক কাহিনি শোনাচ্ছে মনে হচ্ছিল। নয়ন মুখ নিচু করে বলল—'আমি জানি, তুমি সুখি নও। আমার কাছে পাবার মতো আর কিছু নেই...'

তারপর যখন সে মুখ তুলল, দেখি চোখে জল।—'কিন্তু নন্দ, তুমি...তুমি তো আমার কাছে ফুরিয়ে যাও নি। দোহাই তোমাকে আর অমন করো না...লক্ষ্মীটি।'

এ কণ্ঠস্বর খুবই অপরিচিত। এতে অনুনয় নেই কাতরতা নেই; আছে দাবি। এক প্রবল আহ্বানের বন্যা ধীরসঞ্চারিণী—পায়ের কাছে তার স্পর্শ। ওই বন্যায় ডুবে গেলে হয়তো বা আর কোনো দ্বিধা থাকবে না, দ্বন্দ্ব থাকবে না—'প্রতিশ্রুতি'র দায় মুহূর্তে কোথায় তলিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

আবেগের বশে কী করে ফেলতাম জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে ফের বাগানের ওদিকে ওসমান খাঁ গর্জন করে উঠল। এবারের গর্জনে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। দীর্ঘকাল সংসর্গে থাকার ফলে কিছুটা বুঝতে পারতাম তার গর্জনের অর্থ। নয়ন তো বেশি বুঝত। কেউ না বললেও আমরা অনুমান করেছিলাম, তাকে ক্রমশ অভুক্ত রাখা হচ্ছে। আশঙ্কা হ'ত—দুর্গামোহন কি তাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করেছে? আমরা শিউরে উঠতাম। যেন দুর্গামোহন একটা দারুণ প্রায়শ্চিত্তে ব্যাপৃত। নিজের জীবনের খাঁচায় পোরা বাঘটাকে বুঝি এবার শায়েস্তা করার পালা তার।

গর্জন শুনেই বেরিয়ে এসেছিলাম দু'জনে।

বাইরে খোলা বারান্দায় কেষ্টা রঘু চাপাটিরাও এসে দাঁড়িয়েছিল। কেবল অনন্তকে দেখলাম পলকে বাগানের দিকে ছুটে গেল লাঠি হাতে নিয়ে।

ওসমান খাঁ'র গর্জন ক্রমশ থেমে আসছিল। একসময় সে নিশ্চুপ হয়ে গেলে ম্লান জ্যোৎস্নায় বাড়ির প্রাঙ্গণটা কেমন ভৌতিক আচ্ছন্নতায় থমথম করতে থাকল। বাতাস মন্দ হয়ে এলো। চারপাশে শ্বাসরোধকারী একটা প্রচণ্ড চাপ—কী ঘটেছে কে জানে! নয়ন আমার একখানি হাত আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

অনন্ত এতক্ষণে ওদিক থেকে চিৎকার করে উঠল—'ছোটবাবু, ছোটবাবু! রঘু, কেষ্টা!'

সংবিৎ ফিরে পেলাম সকলে। ছুটে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। তারপর যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। নয়ন আর্তনাদ করে উঠল—'বাবু, বাবু, এ তুমি কী করলে?'

ওসমান খাঁ খাঁচার বাইরে এসে পিছনের হাঁটুদুটি ভর করে একটা মানুষের উপর ঝুঁকে রয়েছে। মানুষটা একটুও নড়ছে না। চুপ করে শুয়ে আছে। কেবল ওসমান খাঁ'র বিরাট মাথাটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে বার বার।

নয়ন না বলে উঠলে, ওই মানুষটা কে—আমি বুঝতে পারতাম না। এবং বোঝাবার সঙ্গে সঙ্গে নয়নকে দু'হাতে টেনে সরিয়ে এনেছিলাম—নতুবা সে ঝাঁপিয়ে পড়ত শিকারী বাঘটার ওপর।

চাপাটি বুক চাপড়ে চিৎকার করে উঠল—'বন্দুক, বন্দুক!'

জুয়াড়িদের রাজা ওস্তাদের ওস্তাদ দুর্গামোহন নিজেকে নিজের কাছে সমর্পণ করেছিল এমনি করে। এ মহিমা পুণ্যের নয়। পুণ্যের যদি মহিমা থাকে, তাকে বড়াই করে দেখানোর মতো সম্পদ, পাপের নিশ্চিত আছে।

কিন্তু আজ এতদিন পরে মনে হয়, সেই পাপেরই সৃষ্টি ওই নয়ন— সে ভুল করে পুণ্যের দরজা চুপি-চুপি স্পর্শ করতে চেয়েছিল, আর তাই সে বিশ্বাসঘাতিনী। পাপও কোনো মহিমার জয়তিলক তার ললাটে এঁকে দেয়নি, পুণ্যও তাকে কোলে টেনে নিতে পারেনি। তার ও-কূল এ-কূল দু'কূল অবহেলায় গিয়েছিল।

অবশেষে একদিন জানোয়ারগুলিকে কলকাতা থেকে খদ্দের এসে নিয়ে গেল। শোকার্ত নয়ন দুর্গামোহনের দোতালা ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিল সেদিন। আমি শূন্যমনে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আশ্চর্য, সে দুর্গামোহনের অস্তিত্ব আমার বা নয়নেরও সমুখে অদৃশ্য বাধার মতো অবস্থান করছিল, সে চিরকালের জন্যে মুছে গেলে দেখছিলাম, আমরা সত্যি সত্যি যেন অনাথ হয়ে পড়েছি বিরাট পৃথিবীতে। মাথার ওপর পত্র পল্লব-ছায়া বিস্তার করে একটা মহীরুহ ছিল, তা উন্মূল হয়ে গেলে অসীম নীল আকাশের শূন্যতা শুধু। শুধু মনে হয় এক ব্যাপক সর্বগ্রাস অন্তহীন ক্ষুধা নিয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

একসময় স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেন তা জানি না। বুঝি দূরে যাবার ব্যাকুলতা আমাকে টানছিল। তারপর ট্রেন এলো। যাত্রীদের ভিড়েও কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল প্ল্যাটফর্মটা!

অন্যমনস্কভাবে একটুখানি এগোতেই পিছনে কণ্ঠস্বর ঃ 'নন্দ।'

চমকে উঠেছিলাম। যেন দুর্গামোহন এসে ডাকছে পরিচিত কণ্ঠে। প্রেতলোক থেকে ফিরে আবার কী তার আদেশ কে জানে!

না। বাবা। এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর? যষ্টির ভাবে ঝুঁকে পড়েছেন। কোটরগত চোখ থেকে চশমাটা ঝুলে পড়েছে। অস্থিসার শীর্ণ ক্লান্ত দেহ—জরা এসে ঘিরে ধরেছে। 'নন্দ, আমি আর অপেক্ষা করে থাকতে পারলাম না বাবা?'

জানতাম। এ সবই আমি জানতাম। এর জন্যই যেন প্রতীক্ষা ছিল দিনের পর দিন। স্খলিতকণ্ঠে ডাকলাম—'বাবা।' নিজেকে সংবরণ করা দুঃসাধ্য ছিল।

ত্রিলোচনও সঙ্গে এসেছে। সামনে এসে বলল—'উঃ, কম খোঁজাটা না খুঁজেছি! এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলো দিকি বাপু। বুড়ো বাপের যে-হালখানা করেছ, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। ..যতসব মাগি নাচানো নেশায় জীবনটার একেবারে দিলে বারোটা বাজিয়ে।...'

চলতে চলতে বাবা মৃদুকণ্ঠে বললেন—'ওরা কেউ কিছু বলবে না তো?'

'কারা?'

'তোমার পার্টির সেই...'

ত্রিলোচন বলে উঠল—'নিকুচি করেছে। ওখানে আর যেতে দিচ্ছে কে? এখান থেকেই টিকিট কেটে সোজা চকবাজার একেবারে। মরুক না মাগি বুক চাপড়ে।' বিকট উল্লাসে সে হাসতে থাকল।

শুধু বললাম—'ছিঃ ত্রিলোচন!'

একবারের জন্যও নয়নকে কথাটা বলে আসতে পারতাম—এ সাহস তখন ছিল আমার মধ্যে। বাবাকে দেখে পুরোনো জীবনের সব শক্তি ফিরে এসেছিল মনে। কিন্তু ততক্ষণে বাবা এসে আমার হাত ধরেছেন! আমার হাত বাবার হাতে। ছেলেবেলায় সেই যে মেলায় একদিন তাঁবুর ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম. তারপর বাবা খুঁজে পেয়ে বলেছিলেন—'শক্ত করে হাত ধরে থাকবি, যে ভিড়'...ঘরের পথে ফিরে আসছিলাম দু'জনে, তেমনি এই প্রত্যাবর্তন। তেমনি আশ্বস্ত, ঠিক তেমনি আনন্দিত ফেরা। তাঁবুর ভিতরে যা সব দেখেছিলাম, বাঘের গর্জন, সাপিনীর দেহের দোলা, সজারুর ক্রুদ্ধ কাঁটাপালকের ধ্বনি আর নটীমেয়ের তনুহিল্লোলে ভ্রূ-ভঙ্গিতে নৃত্যে গীতে নূপুরের ঝংকারে জীবনের যে অপরূপ আনন্দ-ছন্দ,—তাঁবুর বাইরে এসে যেমন তা মুছে যায়, মনে হয়, একটা অলৌকিক মায়াজগতে ছিলাম এতক্ষণ, এবং স্বপ্নভঙ্গের পর পর হতাশাময় মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট পৃথিবীর উজ্জ্বলতায় ভিন্ন আলোর স্বাদ, তেমনি অনুভূতি আমার মনে।

তবু আজ দশ বছর পরে কোনো রাতে—স্তব্ধ নির্জন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। চমকে উঠি। কোথায় যেন আলোকিত শব্দ-মুখর মেলার প্রান্তে অন্ধকার আমবাগানে ওসমান খাঁ গর্জন করে উঠল এইমাত্র। এখনই যেন শুনতে পেলাম পাশার গুটির শব্দের সঙ্গে মিশে নীলঘরের সেই নটীর পায়ে নূপুরের বিহ্বল ধ্বনিপুঞ্জ! বিষাদ আমাকে চুপিচুপি স্পর্শ করে।